আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয় ও রূপ-রীতি

সুনীল চন্দ্র রায়

এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৌমিত্র শেখর
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ।
মুঠোফোন : ০১৭৩২ ১০২১০৩

.....

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সুনীল চন্দ্র রায়, আমার তত্ত্বাবধানে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভ করার জন্য ***আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয় ও রূপ-রীতি*** শীর্ষক বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছে। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভের কোনো পরিচ্ছেদ এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি অথবা এর অংশ-বিশেষ অন্য কোথাও ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশ করার জন্য জমা দেয়া হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর)

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারপত্র

এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ***আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয় ও রূপ-রীতি*** শীর্ষক এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজের রচনা। এটি কোনো যৌথ রচনাকর্ম নয়। আমার জানা মতে, উল্লিখিত শিরোনামে এর পূর্বে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পন্ন হয়নি বা কোনো গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয়নি। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য এর আগে উপস্থাপিত হয়নি।

(সুনীল চন্দ্র রায়)
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
এম. ফিল. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ।

তারিখ :

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয় ও রূপ-রীতি আমার এম. ফিল. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের আমার শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে এম. ফিল. কোর্সে নিবন্ধন লাভ করি। পরবর্তী সময় একই বিভাগের আমার শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন ও ড. মো. আবদুস সোবহান তালুকদার-এর নিকট এম. ফিল. প্রথম পর্বের কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর বর্তমান অভিসন্দর্ভের কাঠামো পরিকল্পনা ও অভ্যন্তর বিন্যাস পদ্ধতি সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ দিয়ে গবেষণাকর্মটি দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এছাড়া নাটক বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন তত্ত্বভিত্তিক আলোচনা, প্রাজ্ঞ নির্দেশনা, সুচিন্তিত পরামর্শ ও আন্তরিকতা আমার গবেষণাকর্মকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও তত্ত্ব দিয়ে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন– তাঁদের মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের আমার শিক্ষক প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান, অধ্যাপক ড. চঞ্চল কুমার বোস, অধ্যাপক ড. হোসনে আরা জলী; খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক ড. রুবেল আনছার, নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার, অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার প্রমুখের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুলের গ্রন্থাগার এবং নাট্যজন রামেন্দু মজুমদারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের বাংলা নাটক ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবদুল্লাহ আল-মামুনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও নাট্য-পরিচিতি ২৯

তৃতীয় অধ্যায়

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয়বৈচিত্র্য ৫০

চতুর্থ অধ্যায়

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : রূপ-রীতি ১১১

উপসংহার ১৯৮

জীবনপঞ্জি ২০১

গ্রন্থপঞ্জি ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন (১৯৪২-২০০৮) বাংলাদেশের স্বাধীনতার উন্মেষ-অর্জন ও বিকাশপর্বের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁর প্রথম রচিত *নিয়তির পরিহাস* (১৯৫৭) নাটকে এদেশের সমাজবাস্তবতার অবক্ষয় চিত্রণে স্বীয় মানস প্রকাশিত। অন্যদিকে পরবর্তী সময়ে রচিত নাটকগুলোতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা, ব্যক্তিমানস উজ্জ্বল হয়ে চিত্রিত হয়েছে। আবদুল্লাহ আল-মামুন রূপান্তর-অনূদিতসহ ৩২টি নাটক রচনা করেন। এসব নাটকে তিনি সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্তরালে মানুষের অন্তরাত্মা বা ব্যক্তিমানসকে রূপায়িত করেছেন। তাঁর চিত্রিত পাত্র-পাত্রী সাধারণের অন্তরাত্মা হয়ে, মঞ্চের আলোক বিন্দুর মতোই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। একারণে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে সমকালীন সমাজবাস্তবতায় সাধারণের যাপিত জীবন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নাগরিক সচেতনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়িত সমাজবাস্তবতা, মধ্যবিত্তের জীবনসঙ্কট, নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক সঙ্কট, ব্যক্তি-মানুষের মনোজাগতিক টানাপড়েন, নারীর অবমূল্যায়ন, নবোত্থিত ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উত্থানজনিত কারণে সাংস্কৃতিক সঙ্কট প্রভৃতি বিষয় কালের দর্পণে চিত্রিত হয়েছে। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর রচিত নাটকগুলোতে সমকালীন সমাজ ও জীবনকে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে প্রচলিত ধারার বাইরে আধুনিক নাট্য রূপ-রীতিতে মঞ্চের আলোয় আলোকিত করেছেন। একারণে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও রূপ-রীতি পর্যবেক্ষণ–অনুসন্ধান এবং আলোচনা সাপেক্ষ।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির স্বাদ এদেশের জনমনে যে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে, তা নব্য পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন-শোষণে জর্জরিত রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে হতাশায় পর্যবসিত হলে আবদুল্লাহ আল-মামুনের শিল্পীসত্তাকে আন্দোলিত করে। ইতোমধ্যে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ জাতীয় জীবনে নতুন প্রত্যয় জাগিয়ে তোলে। বাঙালির জাতীয় জীবনের মুক্তিযুদ্ধের এই নবচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবেশে তাঁর নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তিনি পুরনো ধারার ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে যাপিত জীবনের সামাজিক,

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক নানা সঙ্কট এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নভঙ্গের হতাশাজনিত বেদনার চালচিত্রকে রূপায়িত করেছেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন বাংলাদেশের বাংলা নাটকের রূপ-রীতির বিনির্মাণেও প্রাচীন ধারার প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য রূপ-রীতি পরিহার করে আধুনিকতার প্রবর্তন করেছেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার একজন দক্ষ রূপকার। এ সময় কালে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের সুযোগে একশ্রেণির সুবিধাবাদী মানুষ সমাজে আধিপত্য বিস্তার, ঘুষ-দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, মজুতদারি-কালোবাজারি প্রভৃতি অপকর্ম করে জাতীয় জীবনকে স্থবির করে তোলেন। ফলে সমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাপিত জীবনে অভাব-অনটন, কর্মহীন-বেকারত্ব, অপ্রাপ্তিজনিত হাহাকার, চিরাচরিত সত্যগুলোর প্রতি অনাস্থা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারীর প্রতি লৈঙ্গিক-বৈষম্য প্রভৃতি সঙ্কট দেখা দেয়। তখন সমাজজীবনে চারদিকে বিরাজ করে অস্থিরতা। মানুষ আপাত সত্যকে একমাত্র সত্য বলে ধারণ করে জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করে তোলে। একদিকে সমাজের একশ্রেণির মানুষ ঘুষ-দুর্নীতির মধ্য দিয়ে নিজেদের 'বস' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, অন্যদিকে আরেক শ্রেণির মানুষ চিরন্তন মূল্যবোধগুলোকে ধারণ করে বসদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন সমাজজীবনের এই বাস্তবতাকে তাঁর সামাজিক নাটকগুলোতে চিত্রিত করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় লাভ বাঙালির জাতীয় জীবনে মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর সুখ-স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অল্পকাল পরে জাতীয় রাজনীতির দ্বিধা-বিভক্ত নেতৃত্ব ও মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের বিরোধিতা স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসনের পথ সুগম করে দেয়। ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয় জীবন থেকে আপাত মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা তিরোহিত হয়। খন্দকার মোশতাক আহমদের হাত ধরে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করলে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা সেই ক্ষমতার অংশীদার হয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপে মুক্তিযুদ্ধের মূলে প্রোথিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, গণতন্ত্র, মানবতাবাদ ও দেশের সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ভেঙে পড়ার অবস্থা হলে সাধারণ মানুষের জীবন দিশেহারা হয়ে পড়ে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদশে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে মুক্তিযুদ্ধের প্রোথিত আকাঙ্ক্ষা ও চেতনার এমন করুণ বিপর্যয় নীলিমা ইব্রাহিম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল-মামুন, আনিস চৌধুরী, কল্যাণ মিত্র, রশীদ হায়দার, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন, আল মনসুর, সাযযাদ কাদির, সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকি, এসএম সোলায়মান, রণেশ দাশগুপ্ত, মান্নান হীরা, আবদুল্লাহেল মাহমুদ প্রমুখ নাট্যকারদের গভীরভাবে ব্যথিত করে। এ সময় নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকগুলোতে চিত্রিত করেছেন। তবে তাঁর কোনো নাটকে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার চিত্র কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ বা আক্রমণের কোনো চিত্র নেই। কেবল মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে বিপর্যস্ত জীবনবাস্তবতা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির করুণ বেদনাবহ জীবনযাপন, নবোত্থিত স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্যাতিত-নিপীড়িত জীবন, উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির আস্ফালন, মুক্তিযুদ্ধের মূলচেতনার অবক্ষয় প্রভৃতি বিষয়কে আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকে উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশের নাট্যধারার ক্রমবিকাশে বিশেষত পঁচাত্তর উত্তরকালে এদেশের রাজনীতিতে সামরিক শাসকদের উত্থান– এদের সঙ্গে স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মীয় ও মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং দিকভ্রান্ত ক্ষমতালোভী স্বাধীনতার পক্ষের রাজনীতিবিদদের একাংশের যোগসাজশে গণতন্ত্র দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্বাসনে চলে যায়। পক্ষান্তরে সামরিক স্বৈরশাসকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দীর্ঘ সময়ের জন্য অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ফলে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন সামরিক শাসকদের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। বঙ্গবন্ধু উত্তরকালে বাংলাদেশের এমন রাজনৈতিক বাস্তবতায় যে কয়েকজন নাট্যকার রাজনৈতিক অপশক্তির বিরুদ্ধে গণ-মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বাস্তবায়নে এগিয়ে এলেন– আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁদের অগ্রগণ্য। তাঁর রাজনৈতিক নাটকে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক উজ্জীবনের প্রবল দাবি উত্থাপিত হয়েছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের নাট্যকারদের মধ্যে সমকাল সংলগ্নতা প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়। আবদুল্লাহ আল-মামুনও তাঁর সমকালকে অতিক্রম করতে পারেননি। একারণে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিকাশমান নানা প্রসঙ্গ তাঁর নাটকের প্রিয় অনুষঙ্গ হয়েছে। বিশেষত আশির দশকে নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করলে

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের নাট্যদলগুলো এবং নাট্যকাররা পাশ্চাত্য নাট্যকারদের মতো ঘোষণা দিয়েই শ্রেণিসচেতনতাকে তাঁদের নাটকে প্রতিপাদ্য করে তোলেন। ফলে আশির দশকের অধিকাংশ নাটকে শ্রেণিসচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনও তাঁর দরদী হৃদয় সংবেদে পুঁজিবাদী অর্থনীতির যাতাকলে পিষ্ট শ্রমজীবী মানুষের শোষণ-বঞ্চনা ও তজ্জনিত কারণে অধিকার সচেতনতা অতিক্রম করে যেতে পারেননি। একারণে আবদুল্লাহ আল-মামুনের শ্রেণি-সংগ্রামের নাটকগুলোতে এদেশের খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ, দ্রোহ-বিদ্রোহ, অধিকার-সচেতনতা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বলিষ্ঠ স্বরে উচ্চারিত হয়েছে।

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাট্যচেতনার মূল উৎস আবহমান বাংলার আজন্মলালিত অসাম্প্রদায়িক চেতনা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে বিশেষত আশি-নব্বইয়ের দশকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সঙ্কটের সুযোগে পাকিস্তানপন্থি সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তির নবোত্থানে এবং অপসংস্কৃতির জোয়ারে জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে এদেশে ধর্মীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী ফতোয়ার নামে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করলে ধর্মপ্রাণ মানুষদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ফলে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষদের সঙ্গে মৌলবাদী-গোষ্ঠীর সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ সময় মৌলবাদীদের ধর্মের অপব্যাখ্যা দানের মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ অত্যাচার-শোষণ-বঞ্চনা। আবদুল্লাহ আল-মামুন সমকালে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানজনিত কারণে সমাজজীবনে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানবিকতা, নারীর অধিকার সচেতনতা এবং ধর্মের প্রকৃত সত্যের মর্মবাণী তাঁর নাটকগুলোতে উপজীব্য করে তুলেছেন।

বাংলাদেশের নাটকের ক্রমবিকাশের ধারায় '৪৭ উত্তরকাল থেকে বিষয়বৈচিত্র্যের মতো রূপ-রীতিতেও ক্রমবিবর্তন ও নিরীক্ষা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ সময়ে নাট্যকাররা প্রচলিত ধারার চিন্তা-চেতনা ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য গতানুগতিকতা বর্জন করে, স্বল্পায়তনের আধুনিক জীবনবাদী নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ ধারার নাট্যকারদের মধ্যে জিয়া হায়দার, মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন, আল মনসুর প্রমুখের মতো আবদুল্লাহ আল-মামুনের অবদান অগ্রগণ্য। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন প্রচলিত নাট্যরীতির বাহিরে কোনো প্রকার অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন ছাড়াই কখনো আলোকসম্পাতের মধ্য দিয়ে, কখনো বা চলচ্চিত্রের 'পো মোশানে' নাট্যঘটনাকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তিনি নুরুল মোমেনের পর বাংলাদেশের নাটকে একক চরিত্রনির্ভর নিরীক্ষাপ্রবণ নাট্যরচনায়

সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রেও আবদুল্লাহ আল-মামুন ইংরেজি, আরবি, ফারসি, হিন্দি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার ও ভাষার চলিত বা আঞ্চলিক রূপের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি নাটক নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে সমকালীন সমাজবাস্তবতা ও জীবনের চালচিত্র যে পটভূমিতে চিত্রিত হয়েছে তা গভীর মনোযোগসহ পর্যবেক্ষণ করেছি। এছাড়া বাংলা নাটকের ধারায় আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলোর বিষয়বৈচিত্র্য ও রূপ-রীতি বিশ্লেষণে তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারের রচিত বা প্রকাশিত নাটক অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও বাংলাদেশের মানুষের জীবন-সমাজ-মুক্তিযুদ্ধ কতটুকু ও কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ এবং উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছি। বর্তমান গবেষণার পরিধি অনুসারে ১৯৫৭ থেকে ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকসমূহের মধ্যে *সুবচন নির্বাসনে*, *এখন দুঃসময়*, *এবার ধরা দাও*, *সেনাপতি*, *এখনও ক্রীতদাস*, *তোমরাই*, *তৃতীয় পুরুষ*, *কোকিলারা*, *কুরসী*, *মেরাজ ফকিরের মা*, *মাইক মাস্টার* এবং *মেহেরজান আরেকবার* প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বাংলা নাটক শিরোনাম অংশে গবেষণার প্রয়োজনে রয়েছে বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পূর্ব ইতিহাসের নিবিড় আলোচনা। এ প্রসঙ্গে বাংলা নাটকের উৎস থেকে ক্রমবিকাশ ও কলকাতা-বাংলাদেশের থিয়েটারের বিবর্তন সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও নাট্য-পরিচিতি, নাটকগুলোর রচনাকাল, মঞ্চায়নের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নাটকগুলোতে প্রতিফলিত বিষয়বৈচিত্র্য ও রূপ-রীতি আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্বাচিত বারোটি নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য এ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকের প্রেরণার উৎস, সমকাল সংলগ্ন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনচিত্র, শোষণ-বঞ্চনাজনিত কারণে মানুষের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন। সঙ্গত কারণে এ অধ্যায়ে সমকালের অর্থনৈতিক প্রতিবেশে

মানুষের জীবনের চালচিত্র, সামাজিক অবক্ষয়, অভাব-অনটন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মনোজাগতিক টানাপড়েন, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষদের অবহেলিত জীবনযাপন, নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব, জাতির জনকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক সঙ্কট, সামরিক শক্তির ক্ষমতারোহণ, উগ্র-মৌলবাদী শক্তির রাজনীতিতে পুনর্বাসন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদীদের উত্থানে বিপর্যস্ত সংস্কৃতির চিত্র আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলোর বহুমাত্রিক রূপ-রীতি উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটকীয়তা, নাট্যবৃত্ত ও নাট্য উপাদান এই তিনটি রীতির ওপর ভিত্তি করলেও মূলত আধুনিক রীতিতে তাঁর নাটকগুলো বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি।

বর্তমান গবেষণাকর্ম প্রধানত ঐতিহাসিক পদ্ধতি, পাঠ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি এবং তুলনামূলক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। সর্বোপরি উপসংহারের মধ্য দিয়ে এই অভিসন্দর্ভের আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের বাংলা নাটক

প্রচলিত ভাষ্য হলো, বাংলা নাটকের আনুষ্ঠানিক উদ্ভব ঘটে ১৭৯৫ সালে গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭)-এর *The Disguise* বা *কাল্পনিক সংবদল* নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বাংলা নাটকের সাংবিধানিক জন্ম হলেও তখন থেকে এদেশের নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের অব্যবহিত পরে বাংলা ভাষার প্রশ্নে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) মানুষের জাতীয় জীবনে উত্থিত বাঙালি জাতীয়তাবোধের মধ্যে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা নাটকের উৎপত্তির বীজ নিহিত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের বাংলা নাটকের উদ্ভব স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ-এর ইংরেজি নাটকের অনুকরণ থেকে বা ১৯৪৭ সালে জাগরিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিংবা বাংলাদেশের স্বাধীনতালগ্ন থেকে নয়; বাংলাদেশের বাংলা নাটকের উদ্ভব হয়েছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উৎস থেকে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগের পর *রামায়ণ* ও *মহাভারতে* নাটকের নির্দশন পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাট্যকার ভাস রচিত *স্বপ্নবাসদত্ত*, *প্রতিজ্ঞা যৌগন্দ্রায়ণ*, *বালচরিত*, *প্রতিমা* ইত্যাদি নাটক *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* নাটকীয় ধারার ফসল। তবে 'প্রাচীন বাংলা কখনো আর্য সংস্কৃত নাট্যকলার মূলধারা অনুসরণ করে চলেনি।'[১] প্রাচীন বাংলায় লোকজ জীবনবোধকে কেন্দ্র করে বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়েছে। 'ভরতকৃত আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওড্রমাগধী এই চারটি নাট্যপ্রবৃত্তির– ওড্রমাগধী প্রবৃত্তিতে প্রাচীন বাংলা নাটকের উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ওড্রমাগধী প্রবৃত্তির দুটি বৃত্তির– একটি কৈশিকীতে ব্রহ্মা স্বতন্ত্ররূপে ত্রয়োবিংশ অপ্সরা সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ নারী ব্যতিরেকে কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ অসম্ভব। এ বৃত্তি শিবের শৃঙ্গার নৃত্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে।'[২] অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রাচীন বাংলায় শিবের শৃঙ্গার নৃত্য থেকে বাংলা নাটকের উৎপত্তি হয়েছে।

প্রাচীন বাংলায় দ্রাবিড় ও অনার্যদের মধ্যে নাথ সম্প্রদায়, ধর্মপূজক সম্প্রদায়, কৃষিজীবী কোচ উপজাতি প্রভৃতির নিকট শিব পূজনীয় দেবতা হিসেবে বন্দিত হতেন। পরবর্তী সময় শিব ছাড়াও ধর্ম, চণ্ডী, মনসা প্রমুখ দেবদেবীর রূপকল্পে ব্রত-আচার পালন ও আরাধনায় নানা উৎসব-পার্বণের আয়োজন করা হত। এসব উৎসব-পার্বণে অনুষ্ঠিত শিবের গাজন ও নানারকম পালাগানে প্রাচীন বাংলা নাটকের রূপ পরিদৃষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের মন্তব্য, 'আমাদের জনপদে নাটক এসেছে কৃত্যের ছদ্মবেশে। শিব, ধর্ম, চণ্ডী, মনসা, গাজী, মানিকপীরের কৃত্যের অবলম্বন যখন আখ্যান তখন তার উপস্থাপনা, আসর ও দর্শক অবলম্বন করেই বিস্তারিত হয়। [...] আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো ন্যারেটিভ ও রিচুয়্যাল থেকে পৃথকীকৃত সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা গান, পাঁচালী, লীলা, গীত, গীতনাট, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর, মঙ্গলনাট, গাজীর গান ইত্যাদি বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।'[৩]

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসেবে যেহেতু *চর্যাপদ* স্বীকৃত, সেহেতু প্রাচীন বাংলা নাটকের বীজ *চর্যাপদ* থেকেই উপ্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সেলিম আল দীন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, *চর্যাপদ* বৌদ্ধ সাধনতত্ত্বের বাণীপ্রধান গান হলেও তাতে অন্তর্নিহিত অর্থ বিভিন্ন নাটকীয় ঘটনা, নৃত্য, গীত ও কাহিনির মধ্য দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে *চর্যাপদ*-এর বীণা পা রচিত ১৭ নম্বর চর্যা বিশ্লেষণ করলে বুদ্ধ নাটকের উপাদান পাওয়া যায়। যথা :

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।[৪]

এর অর্থ হচ্ছে, বাজিল নাচছেন ও দেবী গান গাইছেন। এ জন্য বুদ্ধ বিসমা বা স্বাভাবিকের চেয়ে বিপরীত। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, বুদ্ধের যুগে অনুষ্ঠান-পার্বণে নৃত্যগীতসহ পালা পরিবেশিত হতো। যা প্রাচীন বাংলা নাট্যধারার আদি নিদর্শন।

এ সময় পাহাড়পুর-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক ও প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ দেবদেবী, অপ্সরা, গন্ধর্ব নারী ও সেবাদাসী নর্তকীদের নাচের ভঙ্গিতে প্রাচীন নাট্যকলার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মের লোকায়ত রূপ নাথপন্থি সাধকদের কায়া সাধনার কাহিনি অবলম্বন করে মৌখিকভাবে পরিবেশিত ও পরবর্তী সময়ে ফয়জুল্লা রচিত *গোরক্ষবিজয়*, রাজশাহী অঞ্চলের শুকুর মাহমুদের *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* (১৭০৫); পাল রাজাদের গাথা *যোগীপাল, ভোগীপাল*, রংপুর অঞ্চলে রাজবংশীয় নিম্নশ্রেণির মধ্যে

প্রচলিত *মহীপালের গান*, *মোনাই তোনাই*, ময়মনসিংহ অঞ্চলের *গোর্খের পালা*, নোয়াখালী অঞ্চলের *শিবের গাজন*, বরিশালের *শিব বিষয়ক পালা*, মালদহের শিব বিষয়ক অনুষ্ঠান *আদ্যের গম্ভীরা*, গার্হস্থ্যদের *ভাদু পরব*, মানভূমে পৌষমাসের পার্বণ হিসেবে *তুসু পরব*, সিলেট অঞ্চলের *ধামালী*, রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন কৃত্য ও কাহিনি অবলম্বনে রামাই পণ্ডিতের *আগম পুরাণ* অর্থাৎ *শূন্যপুরাণ*, লক্ষণসেনের সভাকবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* ও সভাসদ হলায়ূধ মিশ্র রচিত *শেক শুভোদয়া;* প্রাচীন বাংলার পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত *নেটো* ইত্যাদির আঙ্গিক-পরিবেশনা বিশ্লেষণ করে নাট্যবোদ্ধারা গায়েন-বায়েন-দোহার অধ্যুষিত প্রাচীন বাংলার নাট্যসাহিত্যের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের (আনুমানিক ১৩৭০-১৪৩৩ খ্রি.) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন;* কৃষ্ণধামালী বিষয়ক বিভিন্ন পালা যেমন– *রাধার শাকতোলা পালা*, *কৃষ্ণের মাছধরা পালা*, *বড়শীর সাহায্যে কৃষ্ণের মাছ ধরা পালা*, *রাসের পালা;* কৃত্তিবাস রচিত *রামায়ণ পাঁচালী*, *মহাভারত পাঁচালী*; ষোড়শ শতকে চন্দ্রাবতী রচিত *রামায়ণ*, মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, মাধবাচার্য্যের *কৃষ্ণমঙ্গল*, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে দুঃখী শ্যামদাসের *গোবিন্দমঙ্গল*; সপ্তম শতকের শেষে অভিরাম দাস রচিত *গোবিন্দবিজয়*, পরশুরাম রায়ের *মাধব সঙ্গীত*, দীন ভবানন্দের *হরিবংশ*, বৃন্দাবনদাস রচিত *শ্রীচৈতন্য ভাগবত*, লোচনদাসের *শ্রী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল*, জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত;* কীর্তন থেকে রাধা-কৃষ্ণের লীলা কীর্তন যেমন– যমুনাকেলী, নৌখেলা, বংশী চুরি, বস্ত্র চুরি, দানঘট্ট, দ্যুতক্রীড়া, *কৃষ্ণযাত্রা*, চন্দ্রশেখর দাসের *হরিবিলাস*, *চৈতন্যযাত্রা*; তেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্য যেমন– *ধর্মমঙ্গল*, ছড়া-ব্রতকথারূপে পরিবেশিত কানাহরিদত্তের *মনসামঙ্গল*, ষোলটি পালার সমন্বয়ে মানিকদত্তের (আনুমানিক ১২০০-১৩০০ খ্রি.) *চণ্ডীমঙ্গল*, *মঙ্গলকাব্যের গান*, *অন্নদামঙ্গল;* অপ্রধান মঙ্গলকাব্য যেমন– *ষষ্ঠীমঙ্গল*, *শীতলামঙ্গল*, *রায়মঙ্গল*, *পদ্মপুরাণ*, *মঙ্গল চণ্ডীর গান*, *বিষহরার গান*, *রয়াণী*, *চণ্ডীযাত্রা*, *ভাসান যাত্রা;* শাহ মোহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ জুলেখা*, দ্বিজশ্রীধর ও সাবিরিদ খানের *বিদ্যাসুন্দর*, দৌলত উজির বাহরাম খানের *লাইলী-মজনু*, মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী*, কাজী দৌলত রচিত *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী*, মাগন ঠাকুরের *চন্দ্রাবতী;* সতেরো শতকে আলাওলের *পদ্মাবতী*, *হপ্ত পয়কর*, দোনা গাজীর *সয়ফুলমূলুক বদিউজ্জামাল*, মোহাম্মদ খতরের *আলেফ-লায়লা*; ষোল শতকে বিভিন্ন কবি রচিত *সত্যপীরের পাঁচালী*, শ্রীকবি বিবল্লভ রচিত *সত্যনারায়ণের পুঁথি*, গরিবুল্লাহ রচিত *সত্যপীরের পুঁথি*, *গাজীর গান*, *মাদার পীরের গান*, *মানিক পীরের গান*, *জারীগান*; ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালা যেমন– *মহুয়া*, *কাঞ্চন কন্যা*, মনসুর বয়াতির *দেওয়ানা মদিনা*, চন্দ্রাবতীর *দস্যু কেনারামের পালা;* আঠারো শতকে *কালীয়দমন যাত্রা*, শাক্তদের *শক্তিযাত্রা*, নাথদের

নাথযাত্রা, পাল রাজাদের কাহিনী অবলম্বনে *পালযাত্রা*, কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল* কাব্য অবলম্বনে *বিদ্যাসুন্দর যাত্রা*, রামায়ণ ভিত্তিক– রামায়ণগান, কুশানগান, লক্ষ্মীর গান; আঠারো শতকের প্রথম ভাগে *পদাবলী কীর্তন*, শেষ ভাগে *ঢপ কীর্তন*, *নিমাই সন্ন্যাসের পালা*, গরিবউল্লাহর *জঙ্গনামা*, জোনাব আলীর *আদি ও আসল সহিদে কারবালা*, সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*, *শবে মেরাজ*, *ওফাতে রসুল*, মুহম্মদ খানের *মুকতুল হোসেন* (১৬৪৬), *জারিগান*, *ঘাটু*, *ঝুমুর*, *আলকাপ*, মোহাম্মদ মুকিম রচিত *গুলে বকাওলী* প্রভৃতি সাহিত্য প্রাচীনকাল থেকে নাট্যরীতিতে পরিবেশিত হতো। এসব সাহিত্যের নাচ-গান-বাদ্য-কথা-কাহিনি ইত্যাদি নাটকীয় উপাদান বিশ্লেষণ করে বাংলা নাট্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। এক্ষেত্রে গবেষক সেলিম আল দীনের মতামত প্রণিধানযোগ্য :

> বাঙলা নাটকের অজস্র আঙ্গিক সহস্র বছরের ধারায় বাহিত হয়েছে কিন্তু আদ্যন্ত তার দেহমনে অদ্বৈতের ঝঙ্কার বিদ্যমান। নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেনি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ, তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেও বাঙলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে।[৫]

তবে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মধ্যযুগের লীলানাটক কেন্দ্রিক যাত্রা পালা এ অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এসব যাত্রা পালার গীত, নৃত্য ও সংলাপ এই তিনটি নাটকীয় উপাদান একই সঙ্গে বিদ্যমান দেখে কোনো কোনো নাট্য সমালোচক যাত্রাকে বাংলা নাটকের প্রাচীনতম রীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ মতের পক্ষে জোরালো কোনো যুক্তি খাটে না। তবে অধুনা কলকাতায় আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজদের সংস্পর্শে বিভিন্ন রঙ্গালয়কেন্দ্রিক বাংলা নাটক যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তা পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত।

ইংরেজরা এদেশে তাদের প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কাজকর্মে ক্লান্তি দূর করতে অবসর বিনোদনের উদ্দেশে প্রথমে ১৭৫৩ সালে 'ওলড প্লেহাউস বা রঙ্গালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত 'দি নিউ প্লে হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার' (১৭৭৫), 'মিসেস বিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার' (১৭৮৯), 'হোয়েলার প্লেস থিয়েটার' (১৭৯৭),'এথেনিয়াম থিয়েটার' (১৮১২), 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' (১৮১৩), 'দমদম থিয়েটার' (১৮১৭), 'বৈঠকখানা থিয়েটার' (১৮২৪) এবং 'সাঁসুসি থিয়েটার' (১৮৩৯-৪৯) প্রভৃতি থিয়েটার কলকাতা তথা সমগ্র বাংলায় নাট্যচর্চার দ্বার উন্মোচন করে। এছাড়াও এ

Dhaka University Institutional Repository

সময় প্রতিষ্ঠিত 'ডেভিড হেয়ার একাডেমি' (১৮৫১) ও 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে' (১৮৫৩) ইংরেজি নাটক অভিনীত হতো।

ইংরেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ইংরেজ রাজকর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশে এসব থিয়েটারে ইংরেজি নাটক অভিনীত হলেও এর প্রভাব কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম রুশ নাগরিক গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলি থিয়েটারে' (১৭৯৫) দুটি ইংরেজি প্রহসনের বাংলায় অনূদিত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের ধারায় নবচেতনা সঞ্চারিত করে। ফলে 'কলকাতা-কেন্দ্রিক এ-সব নাট্যচর্চা আঠার ও উনিশ শতকে রঙ্গরসপ্রিয় বাবু-সংস্কৃতির স্থূল রসচর্চার মাঝে বাঙ্গালি ভাবমানসে পাশ্চাত্য ও আধুনিক জীবনচেতনা সঞ্চারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশিদের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয় ও অপেরার অনুকরণে ও অনুসরণে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা।'[৬]

পাশ্চাত্য ও ইংরেজদের অনুকরণে-অনুসরণে হলেও গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ-এর পরবর্তী সময়ে প্রথম বাঙালি হিসেবে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এগিয়ে এলেন। 'তাঁর উদ্যোগে তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাগানবাড়িতে 'হিন্দু থিয়েটার'-এর দ্বার উন্মোচিত হয় ১৮৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর।'[৭] এই থিয়েটারে *জুলিয়াস সিজার* নাটকের অংশ বিশেষ এবং উইলসন অনূদিত *ভবভূতি* ও *উত্তররাম চরিত* নাটকদ্বয় অভিনীত হলে কলকাতার নাট্যমোদিরা এগিয়ে আসেন। পরবর্তী সময় 'নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা' (১৮৩৩), প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা', 'সতুবাবুর নাট্যমঞ্চ', 'পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গ নাট্যালয়' (১৮৬৫), 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা', 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটারিক্যাল সোসাইটি' এবং 'বহুবাজার রঙ্গনাট্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা নাটকের পথযাত্রা সুগম হয়। এসব নাট্যালয় বা থিয়েটারে অভিনীত অনূদিত ও মৌলিক নাটক কলকাতাকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার ধারাকে বেগবান করেছে।

তবে নাট্যচর্চার এ ধারা শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার বাহিরে সমগ্র বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। 'উনিশ শতকে কলকাতাতে বাংলা থিয়েটারের জন্ম, লালন এবং তার বিকাশ ঘটলেও ১৮৫০-এর মধ্যভাগ থেকে থিয়েটার আর কলকাতাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঢাকাসহ এ-দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে।'[৮] কারণ এ সময় ইংরেজ রাজকর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ঢাকাসহ সারাদেশে বসবাস করতেন। তারাও কলকাতার মতো এদেশের বিভিন্ন 'স্টেশনকেন্দ্রিক স্থানগুলো'তে

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদনের জন্য রঙ্গালয় বা থিয়েটার নির্মাণ করেন। এসব থিয়েটারে যেহেতু ইংরেজ রাজকর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নাটকের আয়োজন করতেন, সেহেতু বিদেশি নাটকই মঞ্চস্থ হতো। এই ধারায় ইংরেজ নৌ-সেনাদের উদ্যোগে ১৮৫৭ সালে দুটি প্রহসন *ক্যাওস ইজ কাম এগেন* এবং *অরিজিনাল* ঢাকায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ইংরেজদের এই নাট্যচর্চা ঢাকাকেন্দ্রিক নাটকের বিকাশের ধারাকে অনুপ্রাণিত করে। ফলে 'উনিশ শতকীয় পূর্ব-বাংলায় স্থানীয় উদ্যোগের ফলে ইউরোপীয় নাট্যাদর্শে অনুপ্রাণিত নাট্যকলার তিনটি বিশেষ ধারায় বিকাশ লাভ করে– (১) সৌখিন দলসমূহ, যারা বিশেষ অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে নাট্যপ্রদর্শন করতো, (২) সামাজিক অঙ্গিকারে উদ্বুদ্ধ দলসমুহ, যারা প্রায়ই দর্শনীর বিনিময়ে নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন করতো এবং (৩) পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয়।'[৯] এ সময় ঢাকায় প্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ হিসেবে 'ইস্টবেঙ্গল ড্রামাটিক হল' (১৮৬০) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৯০ সালে হলের ভবনটি ভেঙ্গে 'ক্রাউন থিয়েটার' নির্মাণ করা হয়। ঢাকা তথা পূর্ব বাংলার নাট্যচর্চার বিকাশে এ দুটি হল উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করে। এ দুটি হলে প্রথমত 'ইস্টবেঙ্গল ড্রামাটিক হল'কে কেন্দ্র করে 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার', 'নবাবপুর এ্যামেচার থিয়েটার কোম্পানি', 'ইলিশিয়াম থিয়েটার', সনাতন নাট্যসমাজ', অলিম্পিয়া থিয়েটার,' 'পূর্ব-বাঙলা নাট্য সমাজ' প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠী *শরৎ সরোজিনী*, *মেঘনাথবধ*, *মহারাষ্ট্র কলঙ্ক*, *শকুন্তলা*, *বিল্বমঙ্গল*, *নীল দর্পণ*, *রামাভিষেক*, *নবনাটক* ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করেন। পরবর্তী সময় 'ইস্টবেঙ্গল থিয়েটার হল' ভেঙে 'ক্রাউন থিয়েটার' গড়ে উঠলে *চৈতন্যলীলা*, *পূর্ণচন্দ্র জনা*, *লাইলী মজনু* প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। এছাড়া ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার কোম্পানি'র আয়োজনে মঞ্চস্থ *দুর্গেশ নন্দিনী*, *দেবী চৌধুরাণী*, *বিজয় বসন্ত* নাটক ছাড়াও কলকাতা থেকে আগত বিভিন্ন নাট্যদলের অভিনীত *নীল দর্পণ*, *কৃষ্ণকুমারী*, *সধবার একাদশী*, *বুড়ো শালিকের ঘারে রোঁ* প্রভৃতি নাটক পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের নাটকের গোঁড়া মজবুত করে। এ সময় স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্যোগ, জমিদার কিংবা সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্যোগে ঢাকার বাইরে বগুড়া, ময়মনসিংহ, রংপুর, ফরিদপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলেও বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে 'ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটারের' মালিকানা পরিবর্তিত হয়ে 'লায়ন থিয়েটার' নামে বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করে। এ সময় ঢাকাকেন্দ্রিক 'উয়ারী ড্রামাটিক ক্লাব', 'টিকাটুলি ড্রামাটিক ক্লাব', 'আর্মানীটোলা ড্রামাটিক ক্লাব', 'সব্জি মহল ড্রামাটিক ক্লাব' 'গেণ্ডারিয়া ড্রামাটিক ক্লাব', 'ফরাশগঞ্জ ড্রামাটিক ক্লাব' প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠীর মঞ্চস্থ *সীতা*, *রাম*, *জন*, *শাজাহান*, *বাজিরাও*, *কারাগার*, *অশোক*, *টিপু সুলতান* ইত্যাদি নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপর মধ্যবিত্ত নারী অভিনেত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত 'পোস্টাল ড্রামাটিক ক্লাব' ও 'ঢাকেশ্বরী নাট্যসমাজ' দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখানোর আয়োজন

করে, কিন্তু সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। তবে এ সময়ে 'ঢাকা থিয়েটার্স' (১৯৪৩) নামক একটি নাট্যগোষ্ঠী রূপকধর্মী নাটক *মেশিন ও মানুষ*, *আমন ধান*, *ওরা ঘর বাঁধতে চায়* ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে সফলতা অর্জন করে। তবে এই কালপর্বে ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম হলের ছাত্রদের মঞ্চস্থ ডি.এল. রায়ের *বঙ্গনারী* এবং জগন্নাথ হলের ছাত্রদের মঞ্চস্থ গিরিশ ঘোষ রচিত *প্রফুল্ল*, বিধায়ক ভট্টাচার্যের *ক্ষুধা*, *মেঘমুক্তি*, রবীন্দ্রনাথের *বৈকুণ্ঠের খাতা*, *শেষরক্ষা* এবং বনফুলের *মধুসূদন* ইত্যাদি নাটক বাংলাদেশের বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের ধারাকে গতিশীল করেছে।

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক ও মানবিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক মন্দা, দুর্ভিক্ষ, মজুতদার-চোরাকারবারি শ্রেণির দৌরাত্ম্য এ অঞ্চলের মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে শোষিত-নির্যাতিত মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন আরো জোরালোভাবে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার এদেশের মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের কাছে নতি স্বীকার করে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক পৃথক দুটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 'পাকিস্তান সৃষ্টি হলো ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই পূর্ববাংলার প্রশাসন ব্যবসা চাকুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। পাকিস্তানি ব্যবসায়ী এবং সামন্ত প্রভূদের সেবাদাসরূপে কাজ করবে এমন রক্ষণশীল ধর্মান্ধ সামন্ত মূল্যবোধ আশ্রয়ী ব্যক্তিদেরকে প্রশাসন, বেতার, সেক্রেটারিয়েট অর্থাৎ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠিত করলো।'[১০] অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের হিন্দুদের একাংশ কলকাতায় চলে গেলে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত সংস্কৃতি সাধনা মুসলিম ঐতিহ্যপ্রিয় সাহিত্যিকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কেননা দীর্ঘ সময়ে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন-শোষণে জর্জরিত জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে হিন্দুদের চেয়ে অনগ্রসরতা, অন্যদিকে নব্য পাকিস্তানের ইসলামী ভাবাদর্শ বাস্তবায়নের স্বপ্ন তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ করে তোলে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ জামিল আহমদের মন্তব্য :

> পাকিস্তানের জন্ম এতদিনে শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে থাকা অবহেলিত মুসলমান সম্প্রদায়কে আত্মপ্রতিষ্ঠার এবং নেতৃত্বদানের এক সুযোগ এনে দেয়। এই সূত্রে স্থানীয় নাট্যকারদের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট সুযোগ এবং ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।[১১]

এ কারণে নবগঠিত পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) রক্ষণশীল নাট্যকাররা জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিজেদের প্রতিষ্ঠায় নাটককে তাঁদের

আত্মপ্রতিষ্ঠার অবলম্বন হিসেবে বেছে নিলেন। ইসলামী আদর্শের ভাবচেতনা সঞ্চারিত করতে এ ধারার নাট্যকারগণ 'নাটকের বিষয় হিসেবে বেছে নেয় মুসলমান সম্প্রদায়ের সংগ্রামী ইতিহাস-ঐতিহ্যকে। মুঘল ঐতিহ্য, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সাম্রাজ্যসমূহ, বাংলার মুসলমান শাসকগোষ্ঠী ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিমণ্ডলে এই ধারার নাট্যকাররা নাটকের গতিপথ ও সার্থকতা অনুসন্ধান করতো।'[১২] এদের মধ্যে আকবরউদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮), ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), এবং ইব্রাহীম খলিল (জন্ম ১৯১৬) উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার আকবরউদ্দীনের *সিন্ধু বিজয়, সুলতান মাহমুদ, বন্দীমুক্তি* ইত্যাদি নাটকে ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাবচেতনা পটভূমিতে চিত্রিত হয়েছে। আর *আযান* ও *অভিশাপ* নাটকে সামাজিক জীবন বর্ণিত হয়েছে। শাহাদাৎ হোসেনের *মসনদের মোহ, সরফরাজ খান, আনারকলি* ইত্যাদি নাটক ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচিত হলেও ইসলামী ভাব-চেতনায় সমৃদ্ধ। ইতিহাস অবলম্বনে ইব্রাহীম খাঁ'র *কামাল পাশা* ও *আনোয়ার পাশা* নাটকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্থান বিষয়বস্তুতে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। আর *স্পেনে* মুসলমানদের বিজয় অভিযানের মহত্ব নিয়ে নাট্যকার ইব্রাহীম খাঁ রচিত *স্পেন বিজয়ী মুসা* এ ধারার উল্লেখযোগ্য নাটক।

অন্যদিকে পাকিস্তান সৃষ্টির অল্পকাল পরে শাসকশ্রেণির শোষণ-নিপীড়ন, অত্যাচার-নির্যাতন ও বাংলাদেশের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণে অপেক্ষাকৃত বয়সে নবীন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, স্বজাত্যবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ একশ্রেণির নাট্যকারের মোহমুক্তি ঘটলো। এ ধারার জীবনবাদী, গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতিশীল নাট্যকারগণ সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনীতিকে তাঁদের নাটকের প্রধান উপজীব্য করে তোলেন। এদের মধ্যে নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৮৯), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-২০০৯), ওবায়েদ-উল-হক (১৯১১-২০০৭), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) প্রমুখ নাট্যকার নাটকের প্রগতিশীল ধারাকে এগিয়ে নিলেন।

এ সময়ে রচিত নাটকগুলোর মধ্যে নুরুল মোমেনের *নেমেসিস* (১৯৪৮) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কালো-বাজারিদের দৌরাত্ম্য আর দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবনচিত্র রূপায়ণে বিশিষ্ট। তাঁর *রূপান্তর* (১৯৪৮) নাটকে পারিবারিক জীবনের জটিলতা ফুটে উঠেছে। শওকত ওসমানের *আমলার মামলা* (১৯৪৯), *তস্কর ও লস্কর* (১৯৪৫), *কাকর মণি* (১৯৪৯) ইত্যাদি নাটকে সামাজিক অবক্ষয়, ব্যবসায়ীদের মুনাফা লোভী মানসিকতা, মধ্যবিত্ত কর্মকর্তাদের পদের লোভে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের

পদলেহনের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। এ সময় আসকার ইবনে শাইখের *বিরোধ* (১৯৪৮), *পদক্ষেপ* (১৯৫১) গ্রামীণ জীবনের পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও দেশবিভাগের পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব মানবীয় চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছে। ওবায়েদ-উল-হকের *দিগ্বিজয়ী চোরাবাজার* (১৯৫০) নামক একাঙ্কিকা সংকলনের পাঁচটি একাঙ্কিকা– *দিগ্বিজয়ী*, *চোরাবাজার*, *নেতা এলো দেশে*, *ভোট ভিখারী*, *জাল ভেজাল*, এবং *টমি আর টুসি*, *যুগ-সন্ধি* নাটিকা দুটিতে সামাজিক নানা সমস্যা ও সচেতনতা ফুটে উঠেছে। নাট্যকার আবুল ফজল তাঁর একটি সকাল (১৩৪১ বঙ্গাব্দ) একাঙ্কিকা সংকলনে– *মেয়ে লোক*, *একটি সকাল*, *শেষপথ*, *মধুরেণ* ও আলোকলতা সংকলনে প্রকাশিত (১৯৩৬) *কবির বিড়ম্বনা*, *নেতা*, *ভাই ভাই*, *তা'ত হবেই*, *বোরকা* ইত্যাদি একাঙ্কিকায় হিন্দু-মুসলিম সংকট, নারীর মনস্তত্ত্ব, সমাজে নারী-পুরুষের অধিকার চেতনা, দারিদ্র্য, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনি *কায়েদে আজম* (১৯৪৭), *প্রগতি* (১৯৪৮), *স্বয়ম্বরা* (১৯৪৮) ইত্যাদি নাটকে সামাজিক অসঙ্গতি ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জসীম উদ্‌দীনের *পদ্মাপার* (১৯৫০), *বেদের মেয়ে* (১৯৫১) লোককাহিনি ভিত্তিক হলেও গ্রামবাংলার মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ এ নাটক দুটিতে চিত্রিত হয়েছে। এ সময় মুনীর চৌধুরী রচিত *স্বামী সাহেবের অনশন ব্রত* (১৯৪৫) ও *বেশরিয়তি* (১৯৪৬) নাটকে সমাজ জীবনের নানা অসঙ্গতি প্রতিফলিত হয়েছে। নাট্যকারের *মানুষ* (১৯৪৭) নাটকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং *নষ্ট ছেলে* (১৯৫০) নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে পাকিস্তানপন্থি আদর্শের মোহভঙ্গের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অল্পকাল পরেই মাতৃভাষার প্রসঙ্গ পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মতো প্রগতিশীল নাট্যকারদের মধ্যেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন সভা-সেমিনারে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে অগ্রাহ্য করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। কায়েদে আজম খ্যাত মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে :

> But let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Any one who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan.[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র এ ঘোষণায় পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। 'এ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি উত্থাপন করেন।'[১৪] কিন্তু পাকিস্তান সরকার বাঙালির এই প্রাণের দাবি অগ্রাহ্য করে একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা চালায়। এরপর মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র মৃত্যু হলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন লিয়াকত আলি খান। তিনিও ১৯৫০ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে সংবিধান প্রণয়নের মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে সমগ্র বাঙালির মধ্যে এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম লিখেছেন :

> ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্রের জন্য মূলনীতি নির্ধারণ সাব-কমিটির রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করেন। এই রিপোর্টে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার এবং পূর্ব বাঙলাকে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের অতিরিক্ত মর্যাদা দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পূর্ব বাঙলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।[১৫]

পরবর্তী সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন :

> Urdu will be the state language of Pakistan.[১৬]

এই ঘোষণার প্রতিবাদ-প্রতিরোধে ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রজনতা মাতৃভাষার দাবী আদায়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ছাত্ররা 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা' পরিষদের ডাকে দেশব্যাপী সভা-সেমিনার ও ধর্মঘট-বিক্ষোভের ডাক দেন। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্ররা 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ ঐদিন পাকিস্তান সরকার গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পাশ করবে বলে আগেই ঘোষণা দেয়। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী প্রতিবাদী রাজনীতিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রজনতা পাকিস্তান সরকারের অন্যায় দাবী মেনে নিতে পারেননি। একারণে ছাত্রজনতা সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দেন। পাকিস্তান সরকার বাঙালির এই আন্দোলন দমন করতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্রজনতা সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গণপরিষদের দিকে এগোতে থাকলে পুলিশের গুলিতে বাঙালির জাতীয় জীবনে এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাস রচিত হয়। বস্তুত '১৯৪৭ এর পর

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অবস্থা শুধু বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খলই ছিল না বরং একুশে ফেব্রুয়ারির এই সংগ্রাম-আন্দোলন পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সূচনা করে এক নতুন অধ্যায়ের। ভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গের এই আন্দোলন তখন আর বাংলা ভাষাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ আন্দোলন পূর্ববাংলার নির্যাতিত-শোষিত জনগণের মধ্যে সঞ্চার করে সংগ্রামী চেতনা এবং পরবর্তী সময়ে তা রূপ নেয় বৃহত্তর গণ আন্দোলনে।'[১৭]

বায়ান্নর এই অর্জন বাঙালির জাতীয় জীবনে বিশেষত গণতন্ত্রপন্থি-মানবতাবাদী নাট্যকারদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সচেতনতা জাগিয়ে তোলে। ফলে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালির সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকার চেতনার সারৎসারকে প্রাণে ধারণ করে নাট্যকারগণ অসংখ্য নাটক রচনা করেছেন। এই কালপর্বে উপরিল্লিখিত নাট্যকারগণ ছাড়াও আযীম উদ্দীন আহমদ (১৯০২-১৯৭৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), আ. ন. ম বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০) প্রমুখ নাট্যকার ভাষা আন্দোলন, দেশ-কাল, রাজনীতি, মানবতা ইত্যাদি চেতনাকে ধারণ করে বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ জীবন সংলগ্ন নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন।

ভাষা আন্দোলন উত্তরকালে 'পাশ্চাত্য মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সমাজতান্ত্রিক চেতনাশ্রয়ী স্রোতধারার অন্যতম নাট্যকার শওকত ওসমান।'[১৮] এ পর্যায়ে তিনি *বাগদাদের কবি* (১৯৫৩) নাটকটি ইতিহাস অবলম্বনে রচনা করলেও, এ নাটকে ধর্মের নামে শোষণ নয়, একটি সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬৮) নাটকটি এই নামের উপন্যাসের রূপান্তর। শওকত ওসমান এ নাটকটি রামেন্দু মজুমদারের সঙ্গে যৌথভাবে রূপান্তর করেন। এ নাটকে উপন্যাসের মতো একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিত্রিত হয়েছে।

সমাজের সকল স্তরে ভাষা-শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশে রচিত নুরুল মোমেনের *যদি এমন হতো* (১৯৬১) উল্লেখযোগ্য নাটক। তাঁর *আলোছায়া* (১৯৬২), *নয়াখান্দান* (১৯৬২) ও *আইনের অন্তরালে* (১৯৬৭) নাটকে সমাজের মানুষের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে *শতকরা আশি* (১৯৬৯) ও শিক্ষা পদ্ধতির বিশ্লেষণে *রূপলেখা* (১৯৭০) নুরুল মোমেনের সামাজিক শিক্ষা-বিষয়ক নাটক। তাঁর *যেমন ইচ্ছে তেমন* (১৯৭০) নাটকে প্রেমকে কেন্দ্র করে সামাজিক

অবক্ষয়ের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। ছোট ভাইকে পারিবারিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার গ্লানিবোধ থেকে গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে *হোসেন সরদারের উইল* (১৯৭০) নুরুল মোমেনের উল্লেখযোগ্য নাটক। 'নাটকটিতে পারিবারিক হিংসা বিদ্বেষ ও সম্পত্তি নিয়ে বিভ্রাটের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।'[১৯]

বাংলাদেশের নাট্যকারদের মধ্যে গ্রামীণ জীবন ও সমাজবাস্তবতার নিরিখে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রাজনীতিজনিত শোষণ-বঞ্চনা রূপায়ণে আসকার ইবনে শাইখ একজন সমাজ সচেতন শিল্পী। নদীবিধৌত গ্রামবাংলার পদ্মাপাড়ে জেগে ওঠা চরকে কেন্দ্র করে এখানকার মানুষের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার সুখ-স্বপ্ন নিয়ে তাঁর *বিদ্রোহী পদ্মা* (১৯৫৩) অনন্য নাটক। কালোবাজারি-মজুতদারদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র রূপায়ণে *আওয়াজ* (১৯৫৩) এবং শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক অনুরণণের প্রকাশে *যাত্রী* (১৯৫৩) নাট্যকারের সফল নাটক। তাঁর *দুর্যোগ (১৯৫৩)* নাটকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পটভূমি এবং *দুরন্ত ঢেউ* (১৯৫৩) নাটকটিতে সমকালীন মুসলীম লীগ বিরোধী কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গভীর দেশপ্রেম চিত্রিত হয়েছে। এছাড়া জেলে-মৎসজীবী ও নিম্নবিত্ত মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সমবায়ী জীবনচিত্র রূপায়ণে *অনুবর্তন* (১৯৫৯), *বিল বাওড়ের ঢেউ* (১৯৬০) আসকার ইবনে শাইখের উল্লেখযোগ্য নাটক। 'আসকার ইবনে শাইখের *এপার ওপার* (১৯৬২) একটি প্রচারধর্মী সামাজিক নাটক। গ্রামীণ জীবন নাটকের পটভূমি।'[২০] এ নাটকে তিনি সমবেত শক্তির মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের দুঃখের অবসান হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফকির মজনু শাহ্‌র নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস অবলম্বনে রচনা করেন *অগ্নিগিরি* (১৯৫৯) ও *রক্তপদ্ম* (১৯৬২) নাটক। তাঁর *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৬৫) নাটকে ১৯৬২ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চিত্রণের মধ্য দিয়ে গভীর দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। এছাড়া বাউল ফকির লালন শাহ্‌র জীবনী অবলম্বনে *লালন ফকির* (১৯৬৯) ও আধুনিক নগরচেতনা চিত্রণে *প্রচ্ছদপট* (১৯৭০) আসকার ইবনে শাইখের উল্লেখযোগ্য নাটক।

ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাসকে ধারণ করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে ১৯৫৩ সালে কারাগারে বসে রচিত মুনীর চৌধুরীর *কবর* (প্রকাশ ১৯৬৬) নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতহাসে নতুন মাত্রা যোগ করে। '*কবর* আমাদের আধুনিক নাট্য ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের শেকড়, বাতিল মূল্যবোধ ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিকে কবর দিয়ে অগ্রসর চেতনা সৃষ্টির দিক নির্দেশক প্রতিবাদী নাট্যসাহিত্য।'[২১] মুনীর চৌধুরী রচিত *রক্তাক্ত প্রান্তর* (১৯৬২) নাটকের পটভূমি পানিপথের

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় যুদ্ধ হলেও যুদ্ধ নয়, মানব-মানবীর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ সমগ্র নাটককে ট্র্যাজিক করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর মন্তব্য হচ্ছে, 'যুদ্ধের ইতিহাস আমার নাটকের উপকরণমাত্র, অনুপ্রেরণা নয়। ইতিহাসের এক বিশেষ উপলব্ধি মানব-ভাগ্যকে আমার কল্পনায় যে বিশিষ্ট তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে তোলে নাটকে আমি তাকেই প্রাণদান করতে চেষ্টা করেছি।'[২২] এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নানা ঘটনা বা পটভূমিকে কেন্দ্র করে মুনীর চৌধুরীর *চিঠি* (১৯৬৬), তিনটি একাঙ্কিকার সংকলন দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬) নাট্যগ্রন্থে *দণ্ড*, *দণ্ডধর*, *দণ্ডকারণ্য* ও *মর্মান্তিক* (১৯৬৭) ইত্যাদি মূলত হাস্যরসাত্মক নাটক। এসব নাটকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক নানা অসঙ্গতি নাট্যকার হাস্যরসের মধ্য দিয়ে চিত্রিত করেছেন। মুনীর চৌধুরীর পরবর্তী পর্যায়ে *পলাশী ব্যারাক* (১৯৬৯), *ফিটকলাম* (১৯৬৯), *আপনি কে* (১৯৬৯) ইত্যাদি নাটকে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনবোধ, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারে মানুষের দৈনন্দিন দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণা, পাকিস্তানি গোয়েন্দা পুলিশের বাড়াবাড়ি, দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে। *একতালা দোতলা* (১৯৬৯), *বংশধর* (১৯৬৯) নাটকে মুনীর চৌধুরী '৬৯-এর গণ-আন্দোলন তুলে ধরেছেন। এছাড়া তাঁর রচিত *মিলিটারী* ও *মর্মান্তিক* (১৯৬৯) নাটকে পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে ইউরোপীয় শিল্পচেতনার সঞ্চারণে দেশীয় জীবনবোধ আর অন্তরদৃষ্টির আলোকে দেশজ সমাজ এবং গভীর জীবনবোধকে তুলে ধরেছেন। 'সমাজ সচেতনতা, ইতিহাস-চেতনা এবং প্রত্যক্ষ পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা-প্রসূত আধুনিক শিল্প-সচেতনতা এই ত্রিবিধ উপাদানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র শিল্পী-মানস গঠিত।'[২৩] তাঁর রচিত *বহিপীর* (১৯৬০) নাটকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজ এবং নবোত্থিত ধনবাদী সমাজের রূপান্তরিত মূল্যবোধ প্রাধান্য লাভ করেছে। *তরঙ্গ ভঙ্গ* (১৯৬৪) নাটকে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এক নারীর স্বামী ও সন্তানকে হত্যার করুণ কাহিনি বেদনাবহ হয়ে উঠেছে। এ নাটকে আমেনা স্বামী-সন্তানকে হত্যা করে নেওলাপুরীকে সঙ্গী করে সুখের আশায় বাঁচতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সমাজ তাকে বাঁচতে দেয়নি। আমেনার মনের ভাবনাগুলো তার জীবনের হতাশা-গ্লানি, সুখ-স্বপ্ন আর সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও শূন্যতা থেকে উৎসারিত হয়েছে। 'ব্যক্তির অবচেতন মনের ভাবনা তরঙ্গের বিহঙ্গতা উপস্থাপন করে নাট্যকার এই নাটকে সংযোজন করেছেন অভিব্যক্তিবাদী চেতনা।'[২৪] *সুরঙ্গ* (১৯৬৪) নাটকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কিশোর-কিশোরীদের মনের অপ্রকাশিত প্রেমের প্রচ্ছন্নরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর *উজানে মৃত্যু* (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) একাঙ্কিকায় মানব জীবনের অন্তর্বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। এ একাঙ্কিকায় নৌকার বাহক জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত-শ্রান্ত মানব সন্তান মাত্র। আর সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি শুদ্ধতার প্রতীক যিনি নৌকাবাহককে

মানবজীবনের অর্থ বোঝাতে চান। অন্যদিকে কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি অসত্যের প্রতীক– যিনি ষড়যন্ত্র করে মানুষকে অসৎপথে টানতে চান।

ষাটের দশকে উজ্জীবিত গণ-আন্দোলন ও মানবতাবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফরের পুরাণকে আশ্রয় করে রচিত *শকুন্ত উপাখ্যান* (১৯৬১) এবং বাংলার শেষ নবাবী ইতিহাস অবলম্বনে *সিরাজ-উদ-দৌলা* (১৯৬৫) নাটক দুটি বিশিষ্ট। *শকুন্ত উপাখ্যান* নাটকে নাট্যকার যুদ্ধ নয়, শান্তির মহত্ব ও *সিরাজ-উদ-দৌলা* নাটকে ব্রিটিশ সরকার আরোপিত কলঙ্ককে মিথ্যা প্রমাণিত করে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে জাতীয় বীর হিসেবে বাঙালির ভাবমানসে সাহস এবং দেশপ্রেমের প্রতীকরূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর *মহাকবি আলাউল* (১৯৬৬) নাটকে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আলাওলের জীবন চিত্রিত হয়েছে। *মাকড়সা* (১৯৬৬) নাটকে সমকালীন বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রাম ও পরিণতিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। বস্তুত এ সময় 'বাংলার মানুষের বুকের গভীরে লালন করা স্বপ্ন বার বার ভেঙে গেছে স্বৈরাচারী শাসনের কঠিন আঘাতে। সেই হতাশাগ্রস্ত মানুষদের ব্যর্থ স্বপ্নের বিদ্রোহী প্রতীক *মাকড়সা*'।[২৫]

এ পর্যায়ে পল্লিবাংলার জীবনবোধ আর লোকজকাহিনি অবলম্বন করে রচিত জসীম উদ্‌দীনের *মধুমালা* (১৯৫৬), *পল্লীবধূ* (১৯৫৬) ও *বাদল বাঁশী* (১৯৫৬) সার্থক নাটক। জসীম উদ্‌দীনের *মধুমালা* নাটকটি *মধুমালার কেচ্চা* নামক রূপকথা অবলম্বনে রচিত হয়েছে। *পল্লীবধূ* নাটকে গ্রামবাংলার প্রকৃতির রূপের ছবি এবং *বাদল বাঁশী* নাটকে পল্লির এক নর-নারীর প্রেম-বিরহের কাহিনি চিত্রিত হয়েছে।

আনিস চৌধুরী মধ্যবিত্ত দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের জীবনচিত্র রূপায়ণে ষাটের দশকের অন্যতম নাট্যকার। তাঁর *মানচিত্র* (১৯৬৩) নাটকে সমকালীন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এক স্কুল মাস্টারের পরিবার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং গ্রামীণ মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনা আর হতাশার চিত্র পাওয়া যায়। আনিস চৌধুরীর *ফেরদৌসী* (১৯৬৪) জীবনীভিত্তিক ঐতিহাসিক নাটক। এ নাটকে মহাকবি ফেরদৌসীর জীবন সংগ্রাম, সুখ-দুঃখের সুনিপুণ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সমাজে অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাসকে কেন্দ্র করে উদ্ভূদ সমস্যা আনিস চৌধুরীর *এ্যালবাম* (১৯৬৫) নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। এ 'নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে সমাজের দুটি শ্রেণিচিত্র– একটি উচ্চবিত্ত শ্রেণি, অপরটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি।'[২৬] সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি সর্বদা কীভাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণিকে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত করে তার দৃশ্যও নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

সমকালীন সমাজজীবনে সর্বত্র ব্যক্তির মূল্যবোধের অবক্ষয় আর লাঞ্ছনা-বঞ্চনার স্বরূপ তুলে ধরতে ওবায়েদ-উল-হক একজন সফল নাট্যকার। তাঁর রচিত *এই পার্কে* (১৯৫৩) নাটকে একজন শিক্ষিত বেকার যুবকের করুণ লাঞ্ছনার চিত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে চোরাকারবারি আর অসৎ চিকিৎসকদের দৌরাত্ম্যে মানুষের জীবনযন্ত্রণার চিত্রণে *রুগ্ন পৃথিবী* (১৯৬৮) নাট্যকারের অনন্য সৃষ্টি।

বাংলাদেশের নাটকের বিকাশে আলাউদ্দিন আল আজাদের পুরাতন উপাখ্যান অবলম্বনে *মরক্কোর জাদুকর* (১৯৫৯) ও জেনেসিসের কাহিনি অবলম্বনে *ইহুদির মেয়ে* (১৯৬২) নাটক দুটি অনন্য সৃষ্টি। '*মরক্কোর জাদুকর* নাটকে লেখক প্রাচীন লোক-কাহিনির পটভূমিতে সমকালীন সমাজব্যবস্থার রূপরেখা অঙ্কন করেছেন।'[২৭] নাট্যকারের *মায়াবী প্রহর* (১৯৬২) নাটকে অর্থের অভাবে চোরাকারবারির নিকট কন্যা সমর্পণের দৃশ্য এদেশের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার করুণ অবক্ষয়ের চিত্রকে তুলে ধরে। অন্যদিকে *ধন্যবাদ* (১৯৬৪) নাটকে অর্থের লোভে রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি ও যুবসমাজকে ধ্বংস করার কৌশল এবং সমকালীন রাজনীতির চিত্র তুলে ধরেছেন।

আ. ন. ম বজলুর রশীদ সামাজিক সমস্যা ও লোকনাট্য অবলম্বনে কাব্যনাট্য রচনায় একজন সফল নাট্যকার। তাঁর রচিত *উত্তর ফাল্গুনী* (১৯৬৪) নাটকে বস্তুবাদের সঙ্গে আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে। এ নাটকে সমবায়ের মাধ্যমে নাট্যকার একটি আদর্শ সমাজের রূপ কল্পনা করেছেন। *সংযুক্তা* (১৯৬৫) নাটকে একদিকে প্রবল সামাজিক মর্যাদা-আভিজাত্যের অহংকার আর অন্যদিকে মানবিক আকর্ষণে এক নারীর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে মিলনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। আ. ন. ম বজলুর রশীদের *ত্রিমাত্রিক* (১৯৬৬) নাট্য সংকলনে– ময়মনসিংহ গীতিকার দেওয়ানই-মদীনা অবলম্বনে *ধনুয়া গাঙের তীরে*, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের উম মারুই লোকগাথা অবলম্বনে *কোন এক দীপক সন্ধ্যায়* এবং লোকগাথা অবলম্বনে *মেহের তোমার নাম* তিনটি সার্থক কাব্যনাটক। তাঁর *শিলা ও শৈলী* (১৯৬৬), *সুর ও ছন্দ* (১৯৬৬) *একে একে এক* (১৯৬৯), এবং *ধানকমল* (১৯৬৯) ইত্যাদি নাটকে ষাটের দশকের সমাজের সত্য-সুন্দর, অনাড়ম্বর জীবনবোধ, আধুনিকতার নামে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলা, গ্রামীণজীবনের সুখ-দুঃখ চিত্রিত হয়েছে। নাট্যকারের প্রকৃতি সচেতনতার চিত্র *রূপান্তর* (১৯৬৯) নাটকে পাওয়া যায়। 'প্রকৃতিচেতনা অথবা তত্ত্বনিষ্ঠা জগৎ– বহির্ভূত নয়। পৃথিবীতে মানব এবং প্রকৃতি– উভয়ের সহ অবস্থান সত্যনিষ্ঠ।'[২৮] –এই দর্শন *রূপান্তর* নাটকের বিষয়কে শাণিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আযীম উদ্দীন আহমদের *মহুয়া* (১৯৫২) ময়মনসিংহ গীতিকথার জনপ্রিয় কাহিনি ভিত্তিক নাটক। *মা* (১৯৬০) নাটকে তিনি সৎমাকে একজন আদর্শবান সৎ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। নাট্যকারের *অহঙ্কার* (১৯৬০) নাটকে সামাজিক আভিজাত্য ও বংশমর্যাদা এবং *কাঞ্চণ* (১৯৬২) নাটকে লোককাহিনি নির্ভর ধোপার মেয়ের সঙ্গে জমিদারের ছেলের প্রণয় কাহিনি চিত্রিত হয়েছে।

এ সময়ের একজন সমাজসচেতন নাট্যকার আলি মনসুরের নাটকে সামাজিক নানা অসঙ্গতি, সুখ-দুখ, দ্বন্দ্ব-মীমাংসা চিত্রিত হয়েছে। তাঁর রচিত *পোড়োবাড়ী* (১৯৫৫) নাটকে স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক দ্বন্দ্বে সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার করুণ অবহেলার ছবি পাওয়া যায়। *বোবামানুষ* (১৯৫৬) নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের জীবন এবং বিত্তবানদের দ্বারা গ্রামীণ সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনা-গঞ্ছনার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নীলিমা ইব্রাহিম বলেন, 'মানস চিন্তায় ও জীবন দর্শনে সম্ভবত নাট্যকার বামপন্থি, সর্বহারা কিষাণ ও দারিদ্র্যপিষ্ট জনগণের জন্য তাঁর আত্মিক সহানুভূতি নাট্যকার রচিত অধিকাংশ নাটকের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।'[২৯] তাঁর *দুর্নিবার* (১৯৬২) নাটকে গ্রামীণজীবনের দুঃখ-দুর্দশার ছবি ফুটে উঠেছে। নাট্যকারের *শেষ রাতের তারা* (১৯৬৪) নাটকে গ্রামের এক যুবক শহরে গিয়ে পড়াশোনা শেষ করে সেখানে সংসার গড়ে তোলেন। তিনি আর গ্রামে ফিরে আসেননি। এ নাটকে শহরমুখী মানুষের গ্রামীণজীবনের প্রতি অবহেলার চিত্র পাওয়া যায়।

সাঈদ আহমদ বাংলা নাটকে প্রথম অ্যাবসার্ট ধারা প্রবর্তন করেন। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিতে রচিত তাঁর *কালবেলা* (১৯৬২) এ ধারার প্রথম শিল্পসফল নাটক। *মাইলপোস্ট* (১৯৬৫) নাটকেও তিনি মানব জীবনের ক্লান্তি-হতাশা আর শূন্যতাকে একই ধারায় প্রতিফলিত করেছেন। আর *তৃষ্ণায়* (১৯৬৯) নাটকে 'শিয়াল ও কুমির ছানা'র গল্পের আলোকে দেশ-কাল ও রাজনৈতিক পটভূমিতে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামকে চিত্রিত করেছেন। এ নাটকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জন্য এদেশের মানুষের সংগ্রামকে অভিব্যঞ্জিত করেছেন। বাংলা নাটকে 'সাঈদ আহমদ দেশজ লোক কাহিনির যথাযথ ব্যবহারে সফলকাম। দেশজ লোক কাহিনির ব্যবহারে নাট্যকার তাঁর আধুনিক চেতনাজাত বোধ এবং বোধির সার্থকতম প্রয়োগ করেছেন।'[৩০]

এ সময়ের অন্যান্য প্রগতিশীল নাট্যকারদের মধ্যে ফররুখ শিয়রের *ব্ল্যাকমার্কেট* (১৯৫৩), *সামনে পৃথিবী* (১৯৬০), আবদুল হকের *অদ্বিতীয়া* (১৯৫৬), আশরাফ-উজ-জামানের *সয়লাব* (১৯৫৬), সৈয়দ মকসুদ আলীর *ইউরেকা* (১৯৬২), রাজিয়া খানের *আবর্ত* (১৯৬০), লায়লা সামাদের *বিচিত্রা* (১৯৬২)

ইত্যাদি নাটকে সমকালীন সমাজের মজুতদারি কারবার, মুসলমান সমাজের বহুবিবাহ, নারীর অবমূল্যায়ন, মনস্তত্ত্ব, গ্রামীণজীবনের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। কবি ফররুখ আহমদের *নৌফেল ও হাতেম* (১৯৬১), জিয়া হায়দারের *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* (১৯৭০) দুটি ব্যতিক্রমি নাটক। *নৌফেল ও হাতেম* নাটকটি পুঁথি সাহিত্য নির্ভর নিরীক্ষাধর্মী কাব্যনাটক। আর *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাটকে শান্তিতত্ত্বের দিক প্রাধান্য পেয়েছে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন উত্তরকালেও প্রতিক্রিয়াশীল নাট্যকারগণ এদেশের নাট্যচর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। এ সময়কালে আকবরউদ্দীনের *নাদির শাহ্* (১৯৫৩), *মুজাহিদ* (১৯৬৩), ইব্রাহীম খলীলের *ফিরিঙ্গি হার্মাদ* (১৯৬০), *সমাধি* (১৯৫৭), ইব্রাহীম খাঁর *ঋণ পরিশোধ* (১৯৫৫) উল্লেখযোগ্য। এসব নাটক রচনায় নাট্যকারগণ '৪৭ উত্তর পাকিস্তানি ভাবাদর্শের সেই হারানো ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোককাহিনি কিংবা রূপকথা থেকে কাহিনি ও বিষয়বস্তু চয়নে সচেতন হলেও নাটকগুলো ভাষা আন্দোলন উত্তরকালে বাঙালির জাতীয় জীবন এবং মানসিকতার সঙ্গে যোগসূত্র বিনির্মাণ করতে পারেনি।

এ যাবৎ কালে বাংলাদেশের উদার গণতন্ত্রপন্থি-মানবতাবাদী নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকে স্বদেশচেতনা, গণতন্ত্র, মানবতা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও ইতিহাস-ঐতিহ্য সংলগ্ন যে ধারার নাট্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা আরো পরিপুষ্ট লাভ করে। তবে 'এ সময়ে প্রাক-স্বাধীনতা কালের প্রায় সব নাট্যকারই আপাত অর্থে দৃশ্যের অন্তরালে মৌন ও নিষ্ক্রিয় অবস্থানে স্থিত। বিপরীতভাবে, প্রায় প্রতিটি প্রধান নাট্যদলকে কেন্দ্র করে নতুন প্রতিশ্রুতিঋদ্ধ নাট্যকারের আবির্ভাব। প্রায় অনস্বীকার্য যে, এই নতুন, প্রতিভাবান, নিয়ত নিরীক্ষামুখর নাট্যকারদের হাতেই তৈরি হয়েছে উত্তর-স্বাধীনতাকালের ঢাকার নাটক।'[৩১] কারণ স্বাধীনতাযুদ্ধ অপেক্ষাকৃত বয়সে নবীন নাট্যকারদের নিকট নতুন 'প্রত্যয় ও প্রাতস্বিকতার' দ্বার উন্মোচন করে। এ প্রসঙ্গে আলী যাকেরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এখানে নাটক হতো। নাটক হয়েছে এবং এমনও অনেক নাটক '৭১ এর আগে এখানে মঞ্চায়িত হয়েছে যা মানগত দিক দিয়ে আজকের অনেক নাটক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তবু [...] স্বাধীনতার পরে মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে এমন কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা পরাধীন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল অদৃষ্ট। স্বাধীনতারই প্রত্যক্ষ অবদান।[৩২]

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের বাংলা নাটকে মমতাজউদ্‌দীন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮), আবদুল মতিন খান (১৯৩৬), রশীদ হায়দার (১৯৪১), আবদুল্লাহ আল-মামুন (১৯৪২-২০০৮), মামুনুর রশীদ (জন্ম ১৯৪৮), সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮), কবীর আনোয়ার (জন্ম. ১৯৫০), রাজীব হুমায়ুন (১৯৫১-২০১৭), এস এম সোলায়মান (১৯৫৩-২০০১), আবদুল্লাহেল মাহমুদ (জন্ম. ১৯৫৫), মান্নান হীরা (জন্ম. ১৯৫৬), সাজেদুল আউয়াল (জন্ম. ১৯৫৮), প্রমুখ নাট্যকার বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে বসে মমতাজউদ্‌দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* (রচনাকাল ১৯৭১), *এবারের সংগ্রাম* (রচনাকাল ১৯৭১), *স্বাধীনতার সংগ্রাম* (রচনাকাল ১৯৭১), এবং *বর্ণচোরা* (রচনাকাল ১৯৭২) ইত্যাদি নাটক রচনা করেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে মমতাজউদ্‌দীন আহমদ রচিত *স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা* (১৯৭৩), *ফলাফল নিম্নচাপ* (১৯৭৪), *বিবাহ* (১৯৭৮), *রাজা অনুস্বারের পালা* (১৯৮২), *কী চাহ শঙ্খচিল* (১৯৮৫), *সাত ঘাটের কানাকড়ি* (১৯৮৯) ইত্যাদি নাটকে সমকালীন মানুষের হতাশা আর সমাজ-রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ চিত্রিত হয়েছে।

'বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক মূলত নিরীক্ষা-প্রবণ ও নতুন আঙ্গিক-প্রকরণ শৈলী সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত নাট্যকার। তিনি সচেতনভাবে নাটকে বিষয়বস্তু হিসেবে ইতিহাস, রাজনীতি এবং সমাজ জীবনের বাস্তবতা গ্রহণ করেন।'[৩৩] সৈয়দ শামসুল হক স্বাধীনতা উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে রচনা করেন *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৫), *গণনায়ক* (১৯৭৬), *এখানে এখন* (১৯৮১), *নূরল দীনের সারা জীবন* (১৯৮২), *যুদ্ধ এবং যুদ্ধ* (১৯৮৬), *ঈর্ষা* (১৯৯০) ও *খাট্টা তামাশা* (১৯৯৫) ইত্যাদি নাটক।

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন বাংলাদেশের নাটকে স্বাধীনতা উত্তর সমাজবাস্তবতা রূপায়ণে একজন নিপুণ কারিগর। 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকের প্রিয় অনুষঙ্গ এবং নাট্যোপকরণ আহরিত হয় মুক্তিযুদ্ধ থেকে। ফলে তাঁর রচিত প্রায় সব নাটকের ঘটনাই কমবেশি আবর্তিত হয়েছে স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী সময়ে দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতিকে কেন্দ্র করে।'[৩৪] যুদ্ধোত্তর কালে সমাজের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণা, মধ্যবিত্তের টানাপড়েন, সমাজে নারীর মর্যাদা, দেশভাবনা, প্রকৃতি সচেতনতা, নবোত্থিত সাম্প্রদায়িক শক্তির আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি সমস্যা রূপায়ণে

তাঁর রচিত মৌলিক-রূপান্তরিত-অনূদিত সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যে *ডা. ফস্টাস* (১৯৭৩), *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪), *এখন দুঃসময়* (১৯৭৫), *অরক্ষিত মতিঝিল* (১৯৮০), *ক্রস রোডে ক্রস ফায়ার* (১৯৮১), *চারদিকে যুদ্ধ* (১৯৮৩), *শাহজাদীর কালো নেকাব* (১৯৮৪), *ঘরে বাইরে* (১৯৮৩), *আমাদের সন্তানেরা* (১৯৮৮), *কোকিলারা* (১৯৯০), *উজান পবন* (১৯৯১), *একা* (১৯৯৪), *স্পর্ধা* (১৯৯৬), *মেরাজ ফকিরের মা* (১৯৯৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৯৯৭), *জন্মদিন* (২০০৬), *নিয়তির পরিহাস* (অপ্রকাশিত), *বিন্দু বিন্দু রং* (অপ্রকাশিত), *ঋতুরাজ* (অপ্রকাশিত) উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের চিত্র বা সংঘাত নেই, তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবনে রচিত আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলো হচ্ছে *এবার ধরা দাও* (১৯৭৭), *আয়নায় বন্ধুর মুখ* (১৯৮৩), *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৪), *তোমরাই (১৯৮৮)*, *তৃতীয় পুরুষ* (১৯৮৮), *বিবিসাব* (১৯৯১), *দ্যাশের মানুষ* (১৯৯৩) ও *মেহেরজান আরেকবার* (১৯৯৮)। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে পাকিস্তানি আমলে আইয়ুব খানের শাসনের ভিতে আঘাত হানতে তাঁর রচিত কাব্যনাটক *শপথ* (প্রকাশিত ১৯৭৮) সার্থক সৃষ্টি। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে রচিত *কুরসী* (১৯৯১), *মাইক মাস্টার* (১৯৯৭) এবং পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শ্রেণিসংগ্রামের পটভূমিতে রচিত *সেনাপতি* (১৯৮০) ও *দূরপাল্লা* (১৯৮৮) আবদুল্লাহ আল-মামুনের উল্লেখযোগ্য নাটক।

'মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই সাহসী ও অপেক্ষাকৃত তরুণ মুক্তিযোদ্ধা মামুনুর রশীদ ১৯৭১ সালে তাঁর রচিত প্রথম নাটক *পশ্চিমের সিঁড়ি* (১৯৭২) কলকাতার রবীন্দ্রসদনে মঞ্চায়নের চেষ্টা করেন।'[৩৫] মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে তিনি *গন্ধর্ব নগরী* (১৯৭৪), *ওরা কদম আলী* (১৯৭৬), *ওরা আছে বলেই* (১৯৮০), *ইবলিশ* (১৯৮১), *গিনিপিগ* (১৯৮৩), *এখানে নোঙর* (১৯৮৪), *খোলা দুয়ার* (১৯৮৪), *অববাহিকা* (১৯৮৪), *সমতট* (১৯৮৫), *উৎসব* (১৯৮৫), *মানুষ* (১৯৮৫), *পাথর* (১৯৯২), *পাবলিক* (১৯৯৪), *জয়জয়ন্তী* (১৯৯৫), *রাষ্ট্র বনাম* (১৯৯৫), *ঐ আসে*, *লেবেদেফ* (১৯৯৫) ইত্যাদি নাটকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, পেশিশক্তির উত্থানজনিত কারণে রাজনৈতিক-সামাজিক নানা সমস্যা চিত্রিত করেছেন।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা নাটকের বিষয়-প্রকরণ আর আঙ্গিক বিনির্মাণে প্রাগ্রসর নাট্যকার সেলিম আল দীন পুরাণ, কিংবদন্তি কিংবা লোকজ উপাদানকে আধুনিক শিল্পপ্রতিমায় বাংলা নাটকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোর মধ্যে *সর্প বিষয়ক গল্প* (১৯৭২), *জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন* (১৯৭২), *এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা* (১৯৭৩), *সংবাদ কার্টুন* (১৯৭৩), *করিম বাওয়ালির শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা* (১৯৭৩), *অনিকেত অন্বেষণ* (১৯৭৩), *মুনতাসীর ফ্যান্টাসি* (১৯৭৪-৭৫), *আঁতর*

আলীদের নীলাভ পাট (১৯৭৫), *শকুন্তলা* (১৯৭৭), *কিত্তনখোলা* (১৯৮০), *কেরামত মঙ্গল* (১৯৮৬), *হাতহদাই* (১৯৮৭-৮৮), *চাকা* (১৯৯০), *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৯২), *হরগজ* (১৯৯২), *একটি মারমা রূপকথা* (১৯৯৫), *বনপাংশুল* (১৯৯৭), *প্রাচ্য* (১৯৯৮) ইত্যাদি নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও লোকজজীবনের চালচিত্র চিত্রিত হয়েছে।

সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতায় জীবনবোধকে ফুটিয়ে তুলতে নাট্যকার এস এম সোলায়মান রচিত *এলেকশান ক্যারিকেচার* (১৯৮০), *ইংগিত* (১৯৮৪), *গণিমিয়া একদিন* (১৯৮৬), *এই দেশে এই বেশে* (১৯৮৮) শিল্পসফল নাটক। মুক্তিযুদ্ধকালে পাক-হানাদার সেনাদের বর্বরোচিত করুণ চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে প্রাক-স্বাধীনতা কালের নাট্যকার জিয়া হায়দার রচিত *সাদা গোলাপে আগুন* (১৯৮২), *পঙ্কজ বিভাস* (১৯৮২) অসাধারণ সৃষ্টি। এ সময়ে নাট্যকার আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত *নিঃশব্দ যাত্রা* (১৯৭২), *নরকে লাল গোলাপ* (১৯৭৪) নাটক দুটিতে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া নাট্যকার মোহাম্মদ এহসানুল্লাহর *কিংশুক যে মরুতে* (১৯৭৪), নীলিমা ইব্রাহিমের (১৯২১-২০০২) *যে অরণ্যে আলো নেই* (১৯৭৪), কল্যাণ মিত্রের *জল্লাদের দরবার* (১৯৭২), আল মনসুরের *হে জনতা আরেকবার* (১৯৭৪), রণেশ দাশগুপ্তর *ফেরী আসছে* (১৯৭৪) ইত্যাদি নাটক মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে রচিত হয়েছে।

প্রকরণে অভিনব নাট্যকার সাঈদ আহমদ মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে মানবিক অবক্ষয়ের চিত্র ও ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচনা করেন *প্রতিদিন একদিন* (১৯৭৮), *শেষ নবাব* (১৯৮৯) নাটক দুটি। এ সময়ে নাট্যকার রশীদ হায়দারের *তৈল সঙ্কট* (১৯৭৪), আবদুল মতিন খানের *মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব* (১৯৮০), *সম্মেলন* (১৯৮১), কবীর আনোয়ার রচিত *জনে জনে জনতা* (১৯৮৪), *পোস্টার* (১৯৮৬), মান্নান হীরা রচিত *খেলা খেলা* (১৯৯১), *আগুন মুখা* (১৯৯৪), *ময়ূর সিংহাসন* (১৯৯৯), আবদুল্লাহেল মাহমুদ রচিত *সাত পুরুষের ঋণ* (১৯৮২), *নানকার পালা* (১৯৮৫), *প্রাকৃতজন কথা* (১৯৯৭) ইত্যাদি নাটকে যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নবর্গের জেলে জীবনের সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও পরাজয়কে কেন্দ্র করে এ সময়ে সাজেদুল আউয়াল রচিত কাব্যনাটক *ফণিমনসা* (১৯৮০) বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এ অধ্যায়ে উল্লিখিত নাটকগুলো ছাড়াও বিশ শতক পেরিয়ে বর্তমান একুশ শতকের মানবতাবাদী-অসাম্প্রদায়িক চেতনার নাট্যকারগণ নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বাংলা নাট্যচর্চার ধারা

অব্যাহত রেখেছেন। এখনকার নাটকের বিষয় আরো গভীর-সংবেদনশীল, দেশপ্রেম-মুক্তিযুদ্ধ-মানবতাবাদ-সমাজচেতনা প্রভৃতি ছাড়াও নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকে জঙ্গিবাদ বিরোধী বৈশ্বিক সচেতনতা, উন্নয়ন প্রভৃতি তত্ত্বকে উপজীব্য করে তুলছেন। আমাদের গবেষণা পরিধিভুক্ত আবদুল্লাহ আল-মামুন এবং তাঁর রচিত নাটকসমূহ এই প্রেক্ষাপট ধারণ করেই বিকশিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়াস পাওয়া যাবে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১. সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জুন ১৯৯৫), পৃ. ২।

২. 'প্রবৃত্তি' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভরত। '*নানাদেশবেষভাষাচারাবার্তঃ*'– হচ্ছে প্রবৃত্তি। দেশ-বেষ-ভাষা ও রীতি অনুসারে চার– ধরনের প্রবৃত্তি নির্ণীত হয়েছে। এগুলো যথাক্রমে আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী এবং ওড্র-মাগধী। ওড্রমাগধী নাট্যপ্রবৃত্তি যে-সকল অঞ্চলে সেকালে প্রচলিত ছিল বলে ভরত উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে 'বঙ্গ'ও রয়েছে। ওড্রমাগধীরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে '*নাট্যশাস্ত্রে*' বলা হয়েছে যে, এই প্রবৃত্তি ভারতী ও কৈশিকী প্রবৃত্তির আশ্রয়ে রচিত হয়েছে। অর্থাৎ ওড্রমাগধী রীতি এই দুইটি বৃত্তি অবলম্বনে প্রযুক্ত হয়। কৈশিকী বৃত্তির নিমিত্তে ব্রহ্মা স্বতন্ত্রভাবে ত্রয়োবিংশ অপ্সরা সৃজন করেছিলেন। এ বৃত্তি শিবের শৃঙ্গার নৃত্য থেকে উদ্ভূত। নারীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কৈশিকীর প্রয়োগ সম্ভব নয়।'

–সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, (ঢাকা : হাওলাদার প্রকাশনী, প্রথম হাওলাদার সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮), পৃ. ১৭।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

৪. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, (কলকাতা : নয়া প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪০২), পৃ. ১৪১।

৫. সেলিম আল দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

৬. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮), পৃ. ১।

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, *(১৭৯৫-১৮৭৬)*, ৪র্থ সংস্করণ (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১।

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্ধৃত, সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

৯. মুনতাসীর মামুন, উদ্ধৃত সৈয়দ জামিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

১০. সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫০।

১১. সৈয়দ জামিল আহমেদ, 'নাটক ও নাট্যকলা' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)*, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০), পৃ. ৪৯৯।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯।

১৩. রফিকুল ইসলাম, 'ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট' মুকুল চৌধুরী (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলন*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩), পৃ. ২৩৯।

১৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), পৃ. ৫৪-৫৮।

১৫. রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১।

১৭. বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধপর্ব বাংলাদেশ*, (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ১২।

১৮. সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।

১৯. সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজচেতনা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, মে ২০০৩), পৃ. ১০।

২০. সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮।

২১. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *কথা ও কবিতা*, (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮১), পৃ. ৬০।

২২. *রক্তাক্ত প্রান্তর* ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৩. সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত পৃ. ২২৬।

২৪. সৈয়দা খালেদা জাহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

২৮. সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।

২৯. নীলিমা ইব্রাহিম, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

৩০. সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩১।

৩১. সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, মে ২০০৮), পৃ. ২৯।

৩২. আলী যাকের, 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আমাদের নাটক', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক*, (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ১১৫।

৩৩. বোরহান বুলবুল, *বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪), পৃ. ৫৬।

৩৪. সোলায়মান কবীর, *আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয় ও পরিচর্যা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুন ২০১৪), পৃ. ২২।

৩৫. বোরহান বুলবুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবদুল্লাহ আল-মামুনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও নাট্য-পরিচিতি

সংক্ষিপ্ত জীবনী :

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের বাংলা নাটকের গোড়াপত্তন ও বিকাশযাত্রা থেকে উৎকর্ষ সাধনে একজন বিরলপ্রজ প্রতিভাধর নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন। জামালপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে অধ্যয়নকালে নিছক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁর নাটক লেখায় হাতেখড়ি। এরপর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ভাঙাগড়ার ঢেউ-তরঙ্গ তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে বহুমুখী ধারায় শাণিত করেছে। একারণে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাটক বহুমখী বিষয়বৈচিত্র্য ও রূপ-রীতিতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রজ্জ্বলিত নাট্য-প্রতিভা আবদুল্লাহ আল-মামুন জামালপুর জেলার অন্তর্গত বকশীগঞ্জ থানায় অবস্থিত তার নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বকশীগঞ্জকে শ্রীবর্দী থানার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। যথা :

> আমার জন্ম হয় নানার বাড়িতে, তা-ও শেরপুর থানায়। আর দাদা বাড়ি যেটাকে বলে, সেটা হলো গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশে, বকশীগঞ্জ গ্রামে, শ্রীবর্দী থানায়।'[১]

প্রকৃতপক্ষে বকশীগঞ্জ ও শ্রীবর্দী পাশাপাশি অবস্থিত ভারতের সীমান্তবর্তী দুটি পৃথক থানা। বকশীগঞ্জ জামালপুর জেলার অধীন আর শ্রীবর্দী শেরপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত। আবদুল্লাহ আল-মামুন বকশীগঞ্জকে অনবধানতাবশত শ্রীবর্দী থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম বলে অভিহিত করতে পারেন। তবে বাবার চাকরিসূত্রে জামালপুর জেলা শহরে তাঁর শৈশব কাটে এবং নিউলজ, আমলাপাড়া, জামালপুর স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। দুঃখের বিষয় এই অসাধারণ নাট্যশিল্পীর জন্মসাল ও তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। আবদুল্লাহ আল-মামুন গবেষক সোলায়মান কবীর[২] জন্মসাল ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ নির্দেশ করেছেন। তারিখ ১২ জুলাই। কিন্তু সার্টিফিকেটে ১২ জুলাই, ১৯৪২ সাল উল্লেখ থাকায় সবখানে তা লিপিবদ্ধ আছে। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের প্রকৃত জন্মসাল ১৯৪৩, এ বিষয়ে তিনি নিজেও রামেন্দু মজুমদারের নিকট বলেছেন। তবে তারিখ ১২ বা ১৩ জুলাই, তা নাট্যকার নিজেও সঠিক

বলতে পারতেন না। এ প্রসঙ্গে নাট্যজন রামেন্দু মজুমদারের মন্তব্য হচ্ছে, 'তাঁর জন্মসাল-তারিখ নিয়ে একটু বিভ্রান্তি রয়েছে। ১২ বা ১৩ জুলাই, সেটা মামুনও সঠিক বলতে পারতেন না। জন্মসাল আসলে ১৯৪৩, কিন্তু সার্টিফিকেটে ১৯৪২ বলে সব জায়গাতে সেটাই লিপিবদ্ধ আছে।'[৩] বাংলা একাডেমির চরিতাভিধানে আবদুল্লাহ আল-মামুনের জন্মসাল উল্লেখ করা হয়েছে '১৩ জুলাই, ১৯৪২।'[৪] প্রতিবছর 'থিয়েটার' কর্তৃক ১২ জুলাই আবদুল্লাহ আল-মামুনের জন্মোৎসব পালন করা হয়। এছাড়া ১৯ মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আবদুল্লাহ আল-মামুনের অকৃত্রিম বন্ধু নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার ১২ জুলাই, ১৯৪২ সালকে গ্রহণ করতে মত দেন। সুতরাং উপর্যুক্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে ১২ জুলাই, ১৯৪২ সালকে আবদুল্লাহ আল-মামুনের জন্মসাল হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের বাবার নাম আবদুল কুদ্দুস, মায়ের নাম ফাতেমা খাতুন। আবদুল্লাহ আল–মামুনের বাবা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে আবদুল্লাহ আল-মামুন ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর বড় বোন মারা গিয়েছিলেন। ছোট ভাই জার্মানিতে পড়াশোনা শেষ করে সেখানেই নাগরিকত্ব নিয়েছেন। আর একজন ছোটবোন ছিলেন। আবদুল্লাহ আল–মামুনের সহধর্মিণী ফরিদা খাতুন। তাঁর এক ছেলে লুৎফুল কুদ্দুস মামুন, তিন মেয়ে দীনা, মনা ও দীবা।

একজন আদর্শ কলেজ অধ্যক্ষ বাবার সন্তান আবদুল্লাহ আল-মামুন শৈশবকাল থেকে পড়াশোনার গণ্ডির মধ্যে ছিলেন। বাবা শিক্ষক হওয়ায় খেলাধুলার মতো পড়ালেখাকেও তিনি আনন্দের সঙ্গে নিতেন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক পুঁথিগত বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাংলার মাটি-প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গ সখ্য। বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতি তাঁর আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। সঙ্গত কারণে গ্রামবাংলার প্রকৃতির ছাপ আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক ও সৃষ্টিকর্মে স্পষ্ট হয়েছে। এখানকার মানুষের জীবনের চালচিত্র, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-মিলন; হিন্দু-মুসলমানের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান-পার্বণ; গ্রামবাংলার আবহমান সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, হিন্দু-মুসলমানের জীবন-সংস্কৃতি বাল্যকাল থেকে আবদুল্লাহ আল-মামুনের জীবনবোধকে এতটাই শাণিত করেছে যে, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন নাটকে তিনি তার পরিশীলিত রূপ দেন। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের এক সাক্ষাৎকারে তাঁর পারিবারিক জীবনে গড়ে ওঠা এমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র প্রণিধানযোগ্য :

> আমাদের সময় হিন্দু-মুসলমান এক সাথেই ছিলাম। আমরা বুঝতে পারতাম না, কেন আমার নাম মামুন আর বন্ধুর নাম শ্যামল। [...] রায়টের সময় দেখতাম, ব্রিটিশ আমলে, তখন খুবই ছোট, তো

> দেখতাম যে, হিন্দু পরিবারের লোকজন গহনার পুটলি মা'র কাছে রেখে যাচ্ছে। আমার মা সাবধানে ওগুলো রেখে দিতেন। পরে রায়ট থেমে গেলে ওনারা ওগুলো নিয়ে যেতেন। আমাদের নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির কোনো অভাব ছিল না। তাদের পূজা-পার্বণ, আমাদের ঈদ, সব জায়গায় আমাদের সবার অংশগ্রহণ ছিল।[৫]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাট্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে স্কুলে অধ্যয়নকালে– বলা যায়, শিক্ষক বাবার হাত ধরে। তার আগে স্কুলে দেয়ালপত্রিকা প্রকাশিত হলেও আবদুল্লাহ আল-মামুন নিজে মৌলিক কোনো বিষয়ে লিখতেন না, তবে হাতের লেখা সুন্দর হওয়ায় লিখে দিতেন। কিন্তু সেবার স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বন্ধুরা মিলে নাটক করার সিদ্ধান্ত নিলে আবদুল্লাহ আল-মামুন যেন মুশকিলে পড়েন। সমাধানও হয়। এ সময় আবদুল্লাহ আল-মামুন রচনা করলেন *নিয়তির পরিহাস* নামক একটি নাটক। তিনি এ নাটকের নির্দেশনাও দেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ আল-মামুনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে :

> আমাদের স্কুলে একবার আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা নাটক করবো। [...] তো আমরা প্রস্তাব নিয়ে স্যারের কাছে গেলাম। স্যার বললেন– ঠিক আছে, তবে শর্ত হচ্ছে তোমাদের মধ্য থেকেই কাউকে না কাউকে লিখত হবে, [...] কী বিপদ! বাবার কাছে বললাম। তো বাবা বললেন, তুমি একটা গল্প ঠিক করো, যে গল্পে দ্বন্দ্ব আছে। তিনিই পরে আমাকে হেল্প করলেন আমাদের ওখানকার একজন সরকারি কর্মকর্তার গল্প বলে দিয়ে, যে কিনা চাকরি করে বড় হওয়ার পর নিজের বাবাকে বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় নি। তো আমি সেটাকেই আরো ক্লাইমেক্স এনে নাটক লিখলাম। এবং নির্দেশনাও দিলাম।[৬]

আবদুল্লাহ আল-মামুন মাধ্যমিক পর্যন্ত জামালপুরে পড়েন। এরপর ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। ঢাকায় এসে যেন তাঁর স্কুল জীবনে গড়ে ওঠা নাট্যপ্রীতি উন্মুক্ত পরিসর খুঁজে পায়। তিনি 'ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় লেখেন কাব্যনাটক *ঋতুরাজ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে জড়িত হন সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গে। তাদের জন্যে রচনা করেন প্রতীকী নাটক শপথ।'[৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যয়নকালে আবদুল্লাহ আল-মামুন নাটক এবং নাট্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। এ প্রসঙ্গে রামেন্দু মজুমদার বলেন :

> ১৯৬৩ সালে যখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী গঠন করি, তখন মামুন তার সক্রিয় সদস্য ছিলেন।[৮]

আবদুল্লাহ আল-মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক (সম্মান) ১৯৬৩ ও স্নাতকোত্তর ১৯৬৪ সালে সম্পন্ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি নাটকে অগ্রগামী ছাত্র নাজমুল হুদা বাচ্চু, আহসান আলী সিডনী এবং শিক্ষক নাট্যকার নুরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ আরও পরে নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হন। ফলে ছাত্রাবস্থা থেকেই নাটক ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা আরও শাণিত হয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল) প্রমোদ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তখন আবদুল্লাহ আল-মামুন 'সংবাদ' পত্রিকায় পার্ট টাইম চাকরি করতেন। কথাসাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সারের প্রেরণায় প্রতি সপ্তাহে টেলিভিশনে নাটক দেখে সমালোচনা লিখতেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের (তৎকালীন পাকিস্তান টেলিভিশন) প্রযোজক জামান আলী খান আবদুল্লাহ আল-মামুনের লেখা সমালোচনা পড়ে তাঁকে টেলিভিশনে নাটক সম্পাদন করার পার্ট টাইম চাকরি দেন। ততোদিনে টেলিভিশনের নাটক সম্পাদন করতে করতে তিনি টেলিভিশন নাটক তথা নাটক লেখার দক্ষতা অর্জন করেছেন। পরে ১৯৬৬ সালে প্রযোজক হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (তৎকালীন পাকিস্তান) স্থায়ী নিয়োগ পান।

এ বছর শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক নেতৃত্বে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এর মূলে ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং তজ্জনিত কারণে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ধারায় ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবির প্রেক্ষিতে বাঙালি জাতি জাতীয়তাবোধ ও স্বাধিকার চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গণ-আন্দোলনে রূপ নিলে পাকিস্তান সরকারের ভিতে কম্পন সৃষ্টি করে। ফলে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমকালীন এই রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধ নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের মানসপটে গভীরভাবে রেখাপাত করে। সঙ্গত কারণে টেলিভিশনে কর্মরত একজন প্রযোজক হিসেবে একদিকে গভীর স্বজাত্যবোধ, অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারের চাপ উপেক্ষা করে তাঁকে প্রোগ্রাম তৈরি করতে হতো। তবু তিনি দেশপ্রেম থেকে বিচ্যুত হননি, পাকিস্তান সরকারের চাপ উপেক্ষা করে কৌশলে সংগ্রামী বাঙালি জাতির জন্য উদ্দীপনাময় টেলিভিশন প্রোগ্রাম রচনা করতেন। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আবদুল্লাহ আল–মামুন বলেন :

> ৭১ এ এসে বাঙালি যখন স্বাধীন হওয়ার জন্য জাগ্রত হলো, তখন এই সুযোগটা আমরা, মানে পাকিস্তান টেলিভিশন– ঢাকা কেন্দ্র, পুরোপুরি নিই। আমরা সুকান্তের কবিতা পিকচারাইজেশন

করলাম, গণসঙ্গীত করতে থাকলাম। এগুলো আমাদের ম্যানেজমেন্ট কিন্তু তেমনভাবে খেয়াল করতো না।[৯]

ইতোমধ্যে বাঙালির জাতীয় জীবনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ নতুন আশা-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। 'বাংলাদেশের সুদীর্ঘকালের নাট্য ঐতিহ্যের পথ বেয়ে '৭১-এ রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নাটক সৃষ্টি ও মঞ্চায়নে বিস্তৃততর প্রয়াস ও নতুন মাত্রা লক্ষ করা যায়। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের এক বর্ধিষ্ণু উজ্জ্বল শাখারূপে নাটক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।'[১০] এ সময় বাংলাদেশের নাট্যকারগণ মুক্তিযুদ্ধ সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বপ্নভঙ্গজনিত হতাশা, অবক্ষয় প্রভৃতিকে ধারণ করে নাটক রচনার নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন সমকালে বাংলাদেশের নাটকের ঐতিহ্য নির্মাণে যেন সহজ পন্থা আবিষ্কার করলেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ আল-মামুনের মন্তব্য :

> ১৯৭১ সালে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। ন'মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জীবন ধারাটাই বদলে দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগ এবং অর্জন এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জাতিসত্তাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় জাগিয়ে তোলে। এই ধাক্কা নাটকের গায়েও লাগে। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বাংলাদেশের নাটক নতুনভাবে পাখা মেলতে শুরু করে।[১১]

বস্তুত স্বাধীনতা লাভের পরপরই বাংলাদেশের বাংলা নাটকে পরিবর্তন সূচিত হয়। পুরাতন ধারার সঙ্গে নবচেতনার মুক্তিযুদ্ধ যুক্ত হলে বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ও আঙ্গিক-প্রকরণে স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য লাভ করে। বাংলাদেশের নাটকে এই নবধারা মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপিত একদল তরুণ ও বিভিন্ন নাট্যসংগঠনের হাতে গড়ে ওঠে। কেননা, 'বিপুল সংখ্যক নবীন-নবীনা, নবাগত অজস্র তরুণ-তরুণী, তাঁদের সৃষ্টিশীলতার দ্বারা এই জগতের বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ঠিক তেমনি এ দেশের নতুন নাট্যধারার সূতিকাগারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি নতুন ধারার এই নাট্যচর্চার জন্যে জন্ম নেয় আরণ্যক, নাট্যচক্র, বহুবচন, থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটার, চট্টগ্রাম থিয়েটার, অরিন্দম, তীর্যক ইত্যাদি নাট্যসংস্থা।[১২] এই ধারাবাহিকতায় নাট্যকার আবদুল্লাহ আল–মামুন ১৯৭২ সালে নাট্যসংগঠন থিয়েটার-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুদ্ধোত্তর কালের সমাজ-মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর রচিত নাটকে রূপায়িত করে বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রামেন্দু মজুমদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> মামুনের নাট্য প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর। আমরা যারা একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক করতাম তাদেরই কয়েকজন মিলে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে থিয়েটার গঠন করি। [...] কিন্তু মামুন সেসময় হঠাৎ চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমরা ১৯৭৪-এর আগে আর নাটক নিয়ে মঞ্চে আসতে পারিনি। তবে ১৯৭২-এ মামুন ওরই লেখা *উজান পবন* নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন ক্রান্তির জন্য।[১৩]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধকে প্রধান উৎস হিসেবে ধারণ করলেও সমকালের ইতিহাস, বিশেষত যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকের আশাহত বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রাজনৈতিক-সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। একারণে 'বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের ইতিহাস রচনা করতে গেলে যেমন মুক্তিযুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের বিষয়সমূহকে চিহ্নিত করতে হবেই, ঠিক একইভাবে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাট্যকর্মের আলোচনায় [...] ওই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও একান্তই প্রাসঙ্গিক।'[১৪] কেননা তিনি সমকালীন মানুষের হতাশা, সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রতিক্রিয়াশীল স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির আস্ফালন প্রভৃতিকে টেলিভিশন ও মঞ্চের উভয়ক্ষেত্রে নাটকে রূপদান করেছেন। কখনো তিনি নিজে অভিনয় করে, কখনো নির্দেশনা দিয়ে কিংবা কখনো নাটক লিখে সমকালের সমাজবাস্তবতা ও জীবনচিত্রকে উন্মোচন করেছেন। এ প্রসঙ্গে গবেষক সুকুমার বিশ্বাসের মন্তব্য :

> আবদুল্লাহ আল-মামুন কেবল নাট্যকার নন। অভিনেতা নাট্যনির্দেশক হিসাবেও তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। চলচ্চিত্র অঙ্গনেও তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা লক্ষণীয়। সমকালীন দেশ কাল তাঁর নাটকের প্রিয় বিষয় বলে মনে হয়। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের মানুষ সমাজ তাঁর নাট্যচেতনার প্রধানতম প্রবাহ।[১৫]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন নাটক লিখতেন, অভিনয় করতেন, নির্দেশনা দিতেন এবং অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতেন। তিনি পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পান। ১৯৭৫ সালে শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রযোজক হিসেবে জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার এবং শ্রেষ্ঠ কাহিনি ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে বাচসাস পুরস্কার লাভ করেন। সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৯ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন শুধু নাটক রচনা ও প্রযোজনায় নন, চলচ্চিত্র পরিচালনা ও অভিনয়েও দক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এ বছর তিনি *এখনই সময়* চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

এ সময় বিশেষত 'আশির দশকের নাট্যচর্চার একটি বিশেষ দিক হলো, রাজনৈতিক নাট্যচর্চা। কিছু কিছু দল জোরেসোরেই ঘোষণা দিলো নাটককে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলতে হবে। কারণ সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে রাজনীতিকে নাটকের মধ্য দিয়ে রূপান্তরের বিকল্প নেই। দলগুলো এই প্রতিশ্রুতি কতোটা সমাজবিজ্ঞান সচেতন হয়ে দিয়েছিলো সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক সঙ্কট ও শাসন-শোষণের চালচিত্র রূপায়ণ করে আবদুল্লাহ আল-মামুন এদেশের জনগণকে গণতন্ত্র মনস্ক ও অধিকার সচেতন করে তোলার একটা সার্থক প্রয়াস চালিয়েছেন।'[১৬] কারণ তখন স্বৈরশাসক এরশাদের শাসন-শোষণে এদেশের মানুষের জর্জরিত জীবন অস্থির হয়ে উঠেছিল। একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন খুব সহজেই তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এজন্য একজন রাজনীতিক না হয়েও আবদুল্লাহ আল-মামুন জনমনে রাজনৈতিক সচেতনা জাগিয়ে তুলতে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো আড়ালে কখনো বা ছদ্মবেশে স্বৈরশাসনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও শুদ্ধ গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায় রাজনীতিকে নাটকের অনুষঙ্গ করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে রামেন্দু মজুমদারের মন্তব্য :

> মামুন দুটি পথনাটক রচনা করেছিলেন– একটি *কুরসী*, অন্যটি *বিবিসাব*। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় আমরা নাটক দুটি অভিনয় করি। মামুন যেহেতু তখন সরকারি চাকরি করতেন, লেখক হিসাবে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন তীরন্দাজ। মামুন দুঃখ করে বলতেন, আমার নাটক শহিদ মিনারে অভিনীত হচ্ছে, আমি অভিনয় করতে পারছি না, আমার রচনার কথা বলা যাচ্ছে না।'[১৭]

আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর পেশার প্রতি সর্বদা নিষ্ঠাবান ছিলেন। নাট্য রচনার মতো একজন অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে প্রযোজনা পেশাকেও তিনি শিল্প হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। একারণে একজন দক্ষ গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে পেশাগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এআইবিডি আয়োজিত টেলিভিশন ও রেডিও অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সে যোগদান করেন। ১৯৮৩ সালে পশ্চিম জার্মানিতে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদান করে চলচ্চিত্র বিষয়ে একটা বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। এর পরের বছর সহধর্মিণীর হঠাৎ মৃত্যুতে যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন। সংসারের হাল ধরতে ও চার সন্তানকে পরিচর্যার জন্য অনেকে আবদুল্লাহ আল-মামুনকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু পিতৃত্বের দ্বায় থেকে সন্তানদের লালন-পালনের জন্য আবদুল্লাহ আল-মামুন এ পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ১৯৮৪ সালে অকালে পত্নী বিয়োগের পর মামুন অনেকটাই হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। বহুদিক থেকে চারটি সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালনের জন্য একজন মাতা আর তাঁর নিজের শেষ বয়সের অবলম্বনরূপী দ্বিতীয় পাণিগ্রহণের উপদেশ বর্ষিত হতে থাকে। মামুনের স্পষ্ট জবাব, মাতৃহারা শিশুদের মায়ের অভাব পূরণে তার চেয়ে বেশি যোগ্যতা ও মমতা আর কারও থাকতে পারে না।[১৮]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের পিতৃত্বের এই দৃষ্টান্ত তাঁকে যেমন মহিমান্বিত করেছে, তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতাকে আরও উচ্চকিত করেছে– যা একজন বাবার জন্য অনুসরণীয়।

একজন আদর্শ, নিষ্ঠাবান বাবার মতো কর্মক্ষেত্রেও আবদুল্লাহ আল-মামুন দায়িত্বশীল ছিলেন। পত্নী বিয়োগের পর একদিকে যেমন তিনি শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে নাটকের মতো চলচ্চিত্র নির্মাণে সমান তালে অগ্রসর হয়েছেন। একারণে ১৯৮৮ সালে *দুই জীবন* চলচ্চিত্রের জন্য আবারও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। শুধু নাটক-চলচ্চিত্র নয়, উপন্যাস রচনায়ও আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ বছর তাঁর উপন্যাস *মানব তোমার সারাজীবন* প্রকাশিত হয়।

তবে নাটক ছিল আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিচরণ ভূমি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাটক করাকে সৌখিন উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করলেও পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ আল-মামুন নাটককে সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও 'সমাজ বদলের হাতিয়ার' হিসেবে গ্রহণ করে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই নাট্যচর্চায় গভীর ধ্যানস্থ হয়েছেন। তাঁর কারিগরি উদ্যোগে বাংলা নাটক রচনা, নির্দেশনা, অভিনয়, মঞ্চ-প্রযোজনা এবং মঞ্চসজ্জায় গুণগত মানে উন্নীত হয়েছে। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের এই বহুমুখী নাট্যগুণ প্রসঙ্গে সমালোচক শফি আহমদের বক্তব্য :

> আবদুল্লাহ আল-মামুন নাটকের জগতের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শক্তিমান অভিনেতা, দেশের অধিকাংশ মানুষ টেলিভিশনের সৌজন্যে তাঁকে সেভাবেই চেনেন ব্যাপকভাবে। মঞ্চনাটকের দর্শকবৃন্দ ও নাট্যকর্মীজন জানেন, তিনি একজন সিদ্ধহস্ত নাট্যকার। [...] আবদুল্লাহ আল-মামুনের মঞ্চাভিনয়ের এক আকর্ষণী শক্তি ছিল, মঞ্চে তাঁর চরিত্র রূপায়ণের অসামান্য দক্ষতা আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। নাট্য পরিচালক হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশজোড়া।[১৯]

একারণে বাংলা নাটককে আরও বিস্তৃত পরিসরে প্রসারিত করতে ও দক্ষ নাট্যকর্মী সৃজনে ১৯৯০ সালে থিয়েটার স্কুল (বর্তমানে আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুল) প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় উদ্যোগ নেন। থিয়েটার স্কুলে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তিনি উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল নাট্য প্রশিক্ষক বা শিক্ষক হিসেবে আবদুল্লাহ আল-মামুনের জুড়ি নেই। তিনি নিজ হাতে অসংখ্য মেধাবী নাট্য কলাকুশীলব গড়ে তুলেছেন। আবদুল্লাহ আল-মামুনের এই কারিগরি গুণ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> মামুন আমার অভিনয় জীবনের জীবন। আমার আত্মার আত্মীয়। আমার নাট্যগুরু। আমার অভিনয় জীবনের সেই শুরু *সুবচন নির্বাসনে* থেকে *মেরাজ ফকিরের মা* পর্যন্ত– ৩৪টা বছর ধরে মহাযত্ন করে, ভালোবেসে, মনোযোগ দিয়ে সানন্দে আমাকে গড়ে তুলেছেন তিনি।'[২০]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের এ নাট্যপ্রতিভার ছাপ শুধু মঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; টেলিভিশন নাটক রচনা, নির্দেশনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। একারণে ১৯৯০ সালে তাঁকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্র ও ভিডিও ইউনিটের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত উপ-পরিচালক পদে উন্নীত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ বছর বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করলে আওয়ামীপন্থি বিবেচনায় আবদুল্লাহ আল-মামুনকে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের দায়িত্ব দেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে সবার প্রত্যাশা ছিল নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেয়া হবে। কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশনের কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তার বিরোধিতায় আবদুল্লাহ আল-মামুনের আর বাংলাদেশ টেলিভিশনে ফেরা হয়নি।

তবু নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন নিরাশ হননি। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অবিচল থেকে নাট্যচর্চা, চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাণ অব্যাহত রেখেছেন। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রয়াত মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর আমন্ত্রণে *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* শিরোনামে ১০ পর্বের একটি ডকু-ড্রামা নির্মাণের জন্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হন। নিয়ম অনুসারে তিনি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সহায়তায় চট্টগ্রাম গ্রুপ থিয়েটার এবং থিয়েটার-এর কলাকুশীলবদের নিয়ে কাজটি সম্পন্নও করেন। এ তথ্যচিত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামবাসীর অবদান ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির প্রামাণ্য ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এরই মধ্যে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন নাট্যকলায় অবদানের

স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদকে ২০০০-এ ভূষিত হন। ২০০১ সালের মার্চে তিনি শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পান। সে বছর অক্টোবর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন প্রত্যাশা করেছিলেন *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* নামে ডকু-ড্রামাটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হবে। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতা গ্রহণ করলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের আবদুল্লাহ আল-মামুনের সঙ্গে মতানৈক্য সৃষ্টির কারণে ডকু-ড্রামাটি আর প্রচারিত হয়নি।

ব্যক্তিজীবনে আবদুল্লাহ আল-মামুন একজন সৎ, নির্ভীক ও অমায়িক মানুষ ছিলেন। তাঁর সমকালে অনেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বাইরে বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনের প্রযোজনার কাজ করলেও তিনি অর্থের পেছনে ছুটেননি। পেশাগত মান অক্ষুন্ন রেখে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের উন্নয়নে সর্বদা নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেছেন। 'একটি জীবন তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পেশাতেও অসামান্য দক্ষতা ও নেতৃত্বের উদাহরণ রেখে গেছেন– কি টেলিভিশনের কর্মকর্তা হিসেবে, কি জাতীয় গণমাধ্যমের মহাপরিচালক হিসেবে, কি শিল্পকলা একাডেমির প্রধান হিসেবে।'[২১] কিন্তু এই অসামান্য মনীষীর জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে কলঙ্কলেপনের অপচেষ্টা চালানো হয়। ২০০৭ সালে সামরিক সমর্থনে ফখরউদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মহিউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* নামক ডকু-ড্রামা নির্মাণের জন্য আবদুল্লাহ আল-মামুনকে অর্থ-আত্মসাতের মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। তবে এই মামলার অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তেই মিথ্যা প্রমাণিত হলে মহাপ্রাণ আবদুল্লাহ আল-মামুনকে দুর্নীতির কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারেনি।

বস্তুত আবহমান বাংলার সবুজ-শ্যামলঘেরা জল-হাওয়ায় বিকাশমান গ্রামীণ সমাজে অকৃত্রিম অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত-পালিত আবদুল্লাহ আল-মামুন শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উত্থান-বিকাশ ও পরিণতিপর্বের একজন প্রত্যক্ষ দর্শক। এদেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা, স্বপ্ন-আশা তাঁর নাট্যমানসকে আলোড়িত করেছে। সঙ্গত কারণে তিনি নাটকে বাংলাদেশের মানুষের হতাশা-অবক্ষয়, স্বদেশচেতনা, মানবতা, মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনীতি, রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি প্রভৃতিকে অনুষঙ্গ করে তুলেছেন।

দীর্ঘ এক বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান ঘটিয়ে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন ২১শে আগস্ট ২০০৮ সালে বারডেম হাসপাতালের পঞ্চম তলার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, শাহবাগ ঢাকায় বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন ২২শে আগস্ট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে স্মরণসভা শেষে বনানী কবরস্থানে স্ত্রীর কবরে আবদুল্লাহ আল-মামুনকে সমাহিত করা হয়।

নাট্য-পরিচিতি :

আবদুল্লাহ আল-মামুন সাহিত্যচর্চার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো অব্যাহত রাখলেও ১৯৫৭ সালে স্কুলজীবনে প্রথম নাটক রচনা থেকে শুরু করে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৯ বছরের নাট্যসাধনায় মৌলিক, রূপান্তরিত ও অনূদিতসহ মোট ৩২টি নাটক রচনা করেছেন। এ নাটকগুলোর মধ্যে অনূদিত নাটক ২টি, রূপান্তরিত নাটক ৩টি, মৌলিক নাটক ২৭টি। তবে মৌলিক নাটকগুলোর মধ্যে কাব্যনাটক ২টি । এ অধ্যায়ে রচনার কালক্রম অনুসারে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি।

১৯৫৭ সালে আবদুল্লাহ আল-মামুন জামালপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রথম নাটক *নিয়তির পরিহাস* রচনা করেন। এ নাটকের বিষয় একজন সরকারি কর্মকর্তা জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর তার বন্ধুদের সঙ্গে বাবাকে পরিচয় করে দেননি– এই সামাজিক অবক্ষয়কে আশ্রয় করে। তাঁর নিজের নির্দেশনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শর্তজুড়ে দেয়ার কারণে এ নাটকে কোনো নারী চরিত্র ছিল না। নাটকটি আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

আবদুল্লাহ আল-মামুন ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট অধ্যয়নকালে ১৯৫৯ সালে উত্তর ছাত্রাবাসে বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে কাব্যনাটক *ঋতুরাজ* রচনা করেন। এ নাটক আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় ১৯৫৯ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকটিও গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুযোগ পায়নি।

১৯৬২ সালে আবদুল্লাহ আল-মামুন রচনা করেন *বিন্দু বিন্দু রং* নাটক। নাটকটি নাজমুল হুদা বাচ্চুর নির্দেশনায় ঐ বছরে ইউসিস মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তী সময় 'কালের পুতুল নাট্যসংস্থা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এ নাটকটিও প্রকাশিত হয়নি।

'ষাটের দশকের মাঝামাঝি আবদুল্লাহ আল-মামুন একটা যুদ্ধবিরোধী নাটক লিখলেন। কাব্যনাট্যের ভঙ্গিতে।'[২২] নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৪ সাল। আবদুল্লাহ আল-মামুনের এই নাটকের নাম *শপথ*। ফিল্ড

মার্শাল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ভিতে নাটকটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। নাটকটি বাংলা একাডেমির খোলা মঞ্চে ঐ নাট্য মৌসুম 'সংস্কৃতি সংসদের' মঞ্চ প্রযোজনায় ১৯৬৪ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকে আতাউর রহমান যুদ্ধ চরিত্রে অভিনয় করেন। পরে ১৯৭৮ সালে মুক্তধারা প্রকাশনা থেকে নাকটটি গ্রন্থরূপ লাভ করে।

'*উজান পবন* আবদুল্লাহ আল-মামুনের পথনাটক।'[২৩] নাটকটি ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে প্রথমে মঞ্চস্থ হয় ১৯৭২ সালে। মুক্তধারা থেকে *তিনটি পথনাটক : উজান পবন/বিবিসাব/ কুরসী* শিরোনামে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে নাটকটি গ্রন্থভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এ নাটকে নাট্যকার বৃষ্টি মুখরিত এক বিকেলে বারান্দায় আশ্রয় নেওয়া মানুষের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর ঢাকার সামাজিক পরিবর্তনের ধারা চিত্রিত করেছেন। নাট্যকার গ্রাম থেকে শহর দেখতে আসা একদল চাষার জীবনচিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের নানা অসঙ্গতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ নাটকে দৃশ্য কিংবা অঙ্ক বিভাজন নেই।

১৯৭৩ সালে আবদুল্লাহ আল-মামুন ক্রিস্টোফার মার্লোর *ডা. ফস্টাস* নাটকের অনুবাদ করেন। এ সময় ঢাকার মঞ্চে বিদেশি নাটকের অনুবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নাকটটি ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে থিয়েটার পত্রিকায় প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ নাটকের কোনো মঞ্চায়ন হয়নি।

'ষাটের দশকের মাঝামাঝি আবদুল্লাহ আল-মামুন নাট্য-আমোদী বন্ধু-বান্ধবদের প্ররোচনা ও পীড়নে *ক্রস রোডে ক্রস ফায়ার* নামে একটা নাটক লিখেছিলেন। চরিত্রের দিক থেকে এই নাটক নিছকই বিনোদনধর্মী।'[২৪] নাটকটি ১৯৭৩ সালে 'আমরা ক'জনা' নাট্য সংস্থা কর্তৃক বাংলা একাডেমিতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। পরে সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

একাত্তরের যুদ্ধোত্তর কালে সামাজিক অবক্ষয়ের বিনাশী পটভূমিতে *সুবচন নির্বাসনে* নাটকটি রচিত হয়। '*সুবচন নির্বাসনের* নাট্যকার হিসাবে আবদুল্লাহ আল-মামুনের প্রথম প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৪-এ নাটকটি যখন রচিত ও অভিনীত হয় তখন আমাদের চারদিকে বিরাজ করছিল যুদ্ধোত্তর এক হতাশা, মুল্যবোধের অবক্ষয়। তাকে উপজীব্য করে তিনি রচনা করলেন *সুবচন নির্বাসনে*।'[২৫] নাটকটি আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৪ সালে থিয়েটার-এর প্রযোজনায় মহিলা সমিতি মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকে একজন স্কুল শিক্ষক বাবার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সততাকে সামাজিক অবক্ষয় কীভাবে বিনষ্ট করে তা চিত্রিত হয়েছে। *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে চরিত্র সংখ্যা ৭টি।

কোনো দৃশ্য বিভাজন ছাড়াই আলোকসম্পাতের মধ্য দিয়ে এ নাটকের কাহিনি ফুটে উঠেছে। ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে মুক্তধারা *সুবচন নির্বাসনে* নাটক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশে চুয়াত্তর সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যায় দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের উপর কালোবাজারিদের নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখন দুঃসময়* নাটক রচিত হয়। নাটকটি সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে থিয়েটার-এর প্রযোজনায় ও আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ সালে মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে *এখন দুঃসময়* নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এক অঙ্ক বিশিষ্ট এ নাটকে প্রধান চরিত্র বেপারি, সোনা, জরিনা ও মুন্সির ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার গ্রামীণ সমাজজীবনে আড়তদার-কালোবাজারি শ্রেণির শোষণের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

'আবদুল্লাহ আল-মামুনের *চারদিকে যুদ্ধ* নাটকটি স্বাধীনতা উত্তরকালে সর্বব্যাপ্ত সামাজিক নৈরাজ্যের পটভূমিতে রচিত। এর উৎস প্রফুল্ল রায়ের একই নামের উপন্যাস।'[২৬] এ নাটকে নাট্যকার একজন অবসরপ্রাপ্ত সৎ হেড ক্লার্কের ছোট ছেলের অবৈধ উপার্জনের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা কিংবা পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে লীলা নামে এক অসহায় নারীর সমাজের অন্ধকার গলিতে জৈবিক বৃত্তি অবলম্বনের মধ্য দিয়ে অর্থ উপার্জনের চিত্র উন্মোচন করে সমকালীন সামাজিক অবক্ষয়ের চালচিত্রকে তুলে ধরেছেন। নাটকটি উপন্যাস অবলম্বনে রূপান্তরিত হলেও নাট্যকার নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। *চারদিকে যুদ্ধ* নাটকে ৫টি দৃশ্যে ১০টি প্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার অধঃপতিত এক সমাজচিত্র চিত্রিত করেছেন। এ নাটকটি থিয়েটার-এর প্রযোজনায়, আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় ২০ জানুয়ারি, ১৯৭৬ সালে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। আগস্ট ১৯৮৩ সালে মুক্তধারা প্রকাশনী নাটকটি প্রথম প্রকাশ করে।

এবার ধরা দাও নাটক ১৯৭৭ সালে সৈয়দ সিদ্দিক হোসেনের নির্দেশনা ও অবসর-এর প্রযোজনায় শিল্পকলা একাডেমিতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সালে মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে এ নাটক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এ নাটকে বিনষ্ট অর্থনীতির প্রতিবেশে একজন বাবা কর্মক্ষম শিক্ষিত যুবক ছেলের উপার্জন থেকে জীবিকা নির্বাহের আশায় ব্যর্থ হয়ে কীভাবে মেয়েকে বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেন, তার নগ্ন সমাজচিত্র উপস্থাপন করেছেন। কোনো রকম দৃশ্য বিভাজন ছাড়াই

নাট্যকার নয়টি চরিত্রের মধ্য দিয়ে যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ছোবলে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র উন্মোচন করেছেন এ নাটকে।

সেনাপতি নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন রূপকের অন্তরালে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সৃষ্ট ব্যক্তির স্বার্থান্ধতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারিতা চিত্রিত করেছেন। নাট্যকার এ নাটকে দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদী সমাজের অন্ধ পথে আব্বাস আলী তালুকদারের মতো এক শ্রেণির মানুষ শিল্প মালিকদের তোষামোদ করে নিজেই পুঁজিবাদের প্রতিভূ হয়ে ওঠেন। ফলে আব্বাস আলী তালুকদার বা এই পুঁজিবাদী সিস্টেম শ্রমিক শ্রেণির শোষণ-নিপীড়নের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। নাট্যকার এ নাটকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সৃষ্ট মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। *সেনাপতি* নাটকটি আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় থিয়েটার-এর প্রযোজনায় ২ মার্চ ১৯৭৯ সালে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। মুক্তধারা প্রকাশনী জুলাই ১৯৮০ সালে নাটকটি প্রকাশ করে।

'বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকার শহুরে বাস্তবতায় কেরানিদের নির্মম সংসার জীবনের অনুপুঙ্খ চিত্র *অরক্ষিত মতিঝিল*'[২৭] নাটক। আবদুল্লাহ আল-মামুন এ নাটকে ঢাকা শহরের এক অফিসে কর্মরত নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরানির সংসার জীবনের অর্থনৈতিক টানাপড়েনকে কেন্দ্র করে আমাদের অসম সমাজবাস্তবতাকে চিত্রিত করেছেন। এ নাটকটি ৬টি চরিত্রকে কেন্দ্র করে ৬টি দৃশ্যে বিন্যস্ত। নাট্যকাহিনিতে অফিসের ঘুষখোর কর্মকর্তার দুর্নীতি কীভাবে একজন কেরানি ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে নাট্যকার তার সুনিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। নাটকটি মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে জুলাই ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

আয়নায় বন্ধুর মুখ নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে দুই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা– রানার সৎ পথে এবং বাবুর অসৎপথে উত্তরণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিবাদে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সঙ্কটকে চিত্রিত করেছেন। নাট্যকাহিনির পরিণতিতে নাট্যকার অসৎপথে রাজনীতি ও ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাবুর ধ্বংস এবং সৎ রানার শাশ্বত রূপকে নির্দেশ করেছেন। ১২টি চরিত্রে ১২টি দৃশ্যে উপস্থাপিত *আয়নায় বন্ধুর মুখ* নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন দুই মুক্তিযোদ্ধার জীবনের পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন। নাটকটি থিয়েটার-এর প্রযোজনা ও ফেরদৌসী মজুমদারের নির্দেশনায় ২৭ নভেম্বর, ১৯৮৬ সালে পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। মুক্তধারা প্রকাশনী জুন ১৯৮৩ সালে নাটকটি প্রকাশ করে।

তিন অঙ্ক বিশিষ্ট মোট এগারোটি দৃশ্যের সমন্বয়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের *শাহজাদীর কালো নেকাব* নাটকটি মুক্তধারা থেকে ১৯৮৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ নাটকে কিশোর, খানসামা, বেয়ারা ও গ্রামবাসী-লাঠিয়ালসহ বারোজন চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার জীবনের অর্থনৈতিক দৈন্য ও অবহেলার চিত্র উন্মোচন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নভঙ্গের বেদনার চিত্র তুলে ধরেছেন। এ নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে রাজাকার কাজী আবদুল মালেকরা অসৎপথে প্রভূত সম্পদের মালিক হয়েছেন আর মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ারা অবহেলিত জীবনযাপন করছেন। ৮টি দৃশ্যে ২০জন চরিত্রের প্রধানত ৮টি চরিত্রের মধ্য দিয়ে *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে নাট্যকার যুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা চিত্রিত করেছেন। *এখনও ক্রীতদাস* নাটকটি ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে থিয়েটার-এর প্রযোজনায় ও আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় মহিলা সমিতিতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি আগস্ট ১৯৮৪ সালে মুক্তধারা প্রকাশনী প্রকাশ করে।

ঘরে-বাইরে আবদুল্লাহ আল-মামুনের রূপান্তরিত নাটক। এ নাটকের মূল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *ঘরে-বাইরে* উপন্যাস। রূপান্তরিত নাটক হলেও আবদুল্লাহ আল-মামুন এ নাটকে নিজস্ব নাট্য-কুশলতার ছাপ রেখেছেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সালে গাইড হাউসে এ নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। মার্চ ১৯৮৬ সালে থিয়েটার পত্রিকায় দ্বাদশ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যায় *ঘরে-বাইরে* নাটক প্রকাশিত হয়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে স্বামী এবং দুই সন্তান হারানো এক বিধ্বস্ত পরিবারের মইরাম বিবির জীবনে স্বাধীনতার শত্রু বসিরুদ্দি মোল্লাদের অত্যাচার-নির্যাতনের চিত্র *বিবিসাব* নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। আবদুল্লাহ আল-মামুন *বিবিসাব* নাটকে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এক পরিবারের দুর্দশার চিত্র কোনো দৃশ্য-বিভাজন ছাড়া ৫০টি সিকোয়েন্সে ১২টি চরিত্রের মধ্য দিয়ে চিত্রিত করেছেন। *বিবিসাব* নাটক ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকের সংলাপ ঢাকার বস্তিবাসীদের মৌখিক রীতির। নাটকটি তিনটি পথনাটক শিরোনাম গ্রন্থে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়।

তোমরাই নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধের ঋদ্ধ চেতনাকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন। এ নাটকে নাট্যকার স্বাধীনতা উত্তরকালে ছদ্মবেশী স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রে ও অপতৎপরতায় বিধ্বংসী তরুণ সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র উন্মোচন

করেছেন। তবে মুক্তিযুদ্ধের ঘরের সন্তান রঞ্জুকে নাট্যকার ননী ব্যানার্জীর মতো মুক্তিযোদ্ধাদের শাণিত চেতনায় ঋদ্ধ করে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। *তোমরাই* নাটক প্রসঙ্গে ইউসুফ ইকবাল বলেছেন :

> মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে সমাজ জীবনের অবক্ষয়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি, যুদ্ধে পরাজিত শক্তির উত্থান ও প্রতিষ্ঠা, নতুন প্রজন্মের দিকভ্রান্ততা প্রভৃতি *তোমরাই* নাটকে উঠে এসেছে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে।[২৮]

তোমরাই নাটকের মোট দৃশ্য চৌদ্দটি। এ নাটকের ভাষা চরিত্রানুগ। নাটকটি ১৫ জুলাই, ১৯৮৭ সালে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে থিয়েটার-এর প্রযোজনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। জানুয়ারি ১৯৮৮ সালে মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে নাটকটি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

কুরসী আবদুল্লাহ আল-মামুনের রাজনৈতিক নাটক। স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলে শোষণ-নির্যাতনের চিত্রকে নাট্যকার এ নাটকে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। এটি একটি পথনাটক। আবদুল্লাহ আল-মামুন তখন বাংলাদেশ টেলিভিশনে এরশাদ সরকারের অধীনে চাকরি করতেন। এ কারণে নাট্যকার তীরন্দাজ ছদ্মনামে *কুরসী* পথনাটক রচনা করেন। এ নাটকের ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের আগমনে নাট্যকাহিনি গতিশীল হয়েছে। নাটকটি ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। *কুরসী* মে, ১৯৮৮ সালে থিয়েটার পত্রিকায় চতুর্দশ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে মুক্তধারা থেকে তিনটি পথনাটক গ্রন্থে গ্রন্থিত হয়ে *কুরসী* প্রকাশিত হয়।

আবদুল্লাহ আল-মামুন *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে লায়লা-ইমাম চরিত্রের মনোজাগতিক টানাপড়েন ও ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনবাস্তবতা উপস্থাপন করেছেন। এ নাটকে দুটি চরিত্রের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত একজন লায়লা প্রবল আত্মমর্যাদার সঙ্গে শহিদ স্বামীর স্মৃতিকে ধারণ করে বাঁচতে চান। অন্যজন আলী ইমাম নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবী করে প্রেম ও কামের বশে বন্ধু-পত্নী লায়লাকে আপন করে পেতে চান। নাট্যকার এই দুটি চরিত্রের মনোজাগতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা তুলে ধরেছেন। *তৃতীয় পুরুষ* নাটকটি আগস্ট ১৯৮৮ সালে কথন প্রকাশনী থেকে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আমাদের সন্তানেরা নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন সমাজের কতিপয় অসাধু ব্যক্তি কর্তৃক যুবসমাজের অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ নাটকে মিজান ও হাবিবের মতো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেরা অর্থের সংস্থানে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজে ছিনতাই-চাঁদাবাজির মতো অপকর্মে লিপ্ত হন। সমাজকে তারা অপকর্ম দিয়েই বিষিয়ে তোলেন– তাদের ছড়ানো বিষবাষ্পে সৎ ডাক্তার রহমত আলী সন্তানদের রক্ষায় সামাজিক আন্দোলনে নেমে জীবনদান করেন। নাট্যকার ১১টি দৃশ্যে আমাদের সমাজবাস্তবতার নির্মম সত্য তুলে ধরেছেন এ নাটকে। *আমাদের সন্তানেরা* সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে কথন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। পরে কামরুজ্জামান রুনুর নির্দেশনা ও থিয়েটার স্কুলের প্রযোজনায় ২ অক্টোবর, ১৯৯১ সালে গাইড হাউসে এ নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

দূরপাল্লা আবদুল্লাহ আল-মামুনের শ্রেণি-সংগ্রামের নাটক। এ নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন শ্রমিক ও মালিকের দাবি-দাওয়া নিয়ে সৃষ্ট আন্দোলনকে রূপায়িত করেছেন। *দূরপাল্লা* নাটকে শ্রমিক নেতা রায়হান শ্রমিক শ্রেণির দাবি আদায়ের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে মালিক পক্ষের ভাড়াটে গুণ্ডার আক্রমণে পঙ্গুত্ব বরণ করে ধুকে ধুকে মরেছেন। এ নাটকে ১৪টি দৃশ্যের প্রতিটিই আলাদা মঞ্চ পরিকল্পনায় উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকটি কথন প্রকাশনী থেকে নভেম্বর ১৯৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

কোকিলারা আবদুল্লাহ আল-মামুনের একক চরিত্রনির্ভর নিরীক্ষামূলক একটি নাটক। এ নাটকে নাট্যকার পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর লৈঙ্গিক-বৈষম্যের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। নাটকটি প্রসঙ্গে রামেন্দু মজুমদার বলেন, 'মামুনের অনেক নাটকেই একটি মায়ের চরিত্র আছে। ব্যক্তিগত জীবনে মামুন মাকে খুব ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। মামুনের নাটকে মা কেবল স্নেহশীলা নন, প্রতিবাদী ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী। আমাদের সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থান নিয়ে মামুন রচনা করেছেন এক চরিত্রের নাটক কোকিলারা।'[২৯] নাটকটি একক চরিত্রনির্ভর হলেও তিনপর্বে সমাজের গৃহপরিচারিকা, গৃহিণী ও ব্যারিস্টার এই তিন স্তরের তিনজন কোকিলা কিন্তু এক নারীর জীবনবাস্তবতাকে তুলে ধরে। নাটকটি আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় থিয়েটার-এর প্রযোজনায় এবং ফেরদৌসী মজুমদারের অভিনয়ে ১৯ জানুয়ারি, ১৯৮৯ সালে গাইড হাউসে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। মুক্তধারা প্রকাশনী ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সালে প্রথম এ নাটক প্রকাশ করে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন *দ্যাশের মানুষ* নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে মুক্তিযুদ্ধের মলিনপ্রায় চেতনাকে আবারও উজ্জ্বল ও শাণিত করে তোলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এ নাটকে স্বাধীনতা বিরোধী রহমত

একজন মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী সাহানার বাড়িটি দখলে নিতে চান। সাহানা বাড়িটি রক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা সাংসদের নিকট আবেদন করেও ব্যর্থ হন। কারণ মুক্তিযোদ্ধারা এখন আর মুক্তিযোদ্ধা নেই– তারা ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়েছেন। অথচ আর. কে. (আর– রাজা, কে– কার) অর্থাৎ একজন রাজাকার মন্ত্রী রহমতকে ভয় দেখিয়ে সাহানার বাড়িটি উদ্ধার করে দেন। নাট্যকার এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত চেতনার মলিন রূপ তুলে ধরেছেন। *দ্যাশের মানুষ* নাটকে ২৩টি দৃশ্য, কোরাস দল, সূত্রধর প্রভৃতি সংযোজনের মধ্য দিয়ে বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এ নাটকটি মুক্তধারা থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটি ৭ মে ১৯৯১ সালে থিয়েটার-এর প্রযোজনায় গাইড হাউসে প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

স্পর্ধা নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন একজন অবসরপ্রাপ্ত বাবা-মা ও তাদের সন্তানদের জীবনযাপনের ভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাঙালি সমাজে বাবা-মা সন্তানদের লালন-পালন করে বড় করলেও বাবা-মায়ের শেষ জীবনে সন্তানেরা স্নেহ-ভালোবাসা ভুলে আলাদা জীবনযাপন করেন। নাট্যকার সমাজের এই কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন *স্পর্ধা* নাটকে। এ নাটকের চরিত্রগুলো হচ্ছে বাবা, মা, রবি, কথা প্রমুখ। *স্পর্ধা* নাটকটি একুশটি দৃশ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকটি ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৩ সালে থিয়েটার–এর প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হয়। সাহিত্য প্রকাশ থেকে এপ্রিল ১৯৯৬ সালে নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় তাঁর অনূদিত নাটক *একা* ১৯৯৪ সালে জার্মান কালচারাল সেন্টারে প্রথম অভিনীত হয়। এ নাটকটি সংলাপবিহীন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেন, '*একা* হলো আমার সংলাপবিহীন নাটক। একদিন রামেন্দু এসে বললেন জার্মানির একটা নাটক আছে একক চরিত্র কিন্তু সংলাপ নাই। শুনেই তো আমার খুব ভালো লাগলো, বললাম– আনেন। তো এরপর এটাকে মঞ্চরূপ দিলাম।'[৩০] ফেরদৌসী মজুমদার এ নাটকে একক চরিত্রে অভিনয় করেন। নাটকটি ১৯৯৫ সালে থিয়েটার পত্রিকার উনবিংশ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণকান্তের উইল আবদুল্লাহ আল-মামুনের রূপান্তরিত নাটক। বঙ্কিমচন্দ্রের একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে নাট্যকার এটি নাটকের রূপ দেন। ফেরদৌসী মজুমদারের নির্দেশনায় থিয়েটার-এর মঞ্চ প্রযোজনায় *কৃষ্ণকান্তের উইল* ৬ নভেম্বর ১৯৯৪ সালে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে মুক্তধারা থেকে নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক ও বাহক আবদুল্লাহ আল-মামুন *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে ধর্মান্ধতার বিপরীতে প্রগতিশীলতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এ নাটকে মেরাজ ফকির, গেদা ফকির ও গ্রাম্য রাজনীতিক কাজী তোবারক ধর্মান্ধ মৌলবাদী; অন্যদিকে আলোরানী, মোজাহের মণ্ডল, সেরাজ, স্কুল মাস্টার প্রমুখ প্রগতিশীল আধুনিক মনস্ক। আলোরানীর পূর্বের হিন্দু পরিচয় উন্মোচিত হলে, তার সন্তান মেরাজ ফকির মাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। গেদা ফকির ফতোয়া দিয়ে আলোরানীকে শায়েস্তা করতে চান। কিন্তু মানবিকতায় মেরাজ ফকিরের মুক্তি হলে তিনি প্রগতির পক্ষ নিয়ে মাকে রক্ষা করেন। নাটকটি ২০মে, ১৯৯৫ সালে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সাহিত্য প্রকাশ থেকে এপ্রিল ১৯৯৭ সালে *মেরাজ ফকিরের মা* নাটক প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে থিয়েটার পত্রিকার বিংশতিবর্ষপূর্তি সংখ্যায় আবদুল্লাহ আল-মামুনের রাজনীতি বিষয়ক নাটক *মাইক মাস্টার* প্রকাশিত হয়। পরে ফরহাদ জামান পলাশের নির্দেশনায় থিয়েটার-এর প্রযোজনায় নাটকটি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে শিল্পকলা একাডেমিতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। রূপকধর্মী এ নাটকে একজন নিবেদিত রাজনৈতিক কর্মী দলের জন্য কৈশোর-যৌবন থেকে প্রচার চালালেও তার কোনো পদোন্নতি হয়নি। কাঙ্ক্ষিত রাজনীতি ঘটাতে পারেনি সমাজের নিচু তলার মানুষগুলোর ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন। অথচ যারা ভাগ্যহারাদের নিয়ে রাজনীতি করেন তাদের পরিবর্তন রাতারাতি ঘটেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুন আমাদের রাজনীতির এমন বাস্তবতা নিয়ে একক চরিত্র নির্ভর *মাইক মাস্টার* নাটক রচনা করেন।

মেহেরজান আরেকবার নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মীয় মৌলবাদীদের উত্থান; মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষের করুণ দুর্দশারচিত্র চিত্রিত করেছেন। রাজাকার হাজী সাহেব রাজনৈতিক যোগসাজশে সোনার বাংলা হোটেলে আশ্রিত মুক্তিযোদ্ধা শিকদারকে হত্যা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মেহেরজানকে জিম্মি করে রাখেন। কিন্তু মেহেরজানের হাতেই মৌলবাদী হাজীর পরাজয় ঘটে। নাটকটি ফেরদৌসী মজুমদারের নির্দেশনায় থিয়েটার-এর প্রযোজনায় ১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে থিয়েটার পত্রিকার একবিংশতি বর্ষ ১-২ সংখ্যায় নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের শেষ নাটক *জন্মদিন*। জুলাই ২০০৬ সালে থিয়েটার পত্রিকার ৩৫তম বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রথম এ নাটকটি প্রকাশিত হয়। ৫টি দৃশ্যে নাটকটি উপস্থাপিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের রচিত নাটকগুলোর বিষয়বৈচিত্র্য ও রূপ-রীতি স্বতন্ত্রমণ্ডিত এবং আলোচনা সাপেক্ষ। এ অধ্যায়ের পরিসর অনুসারে আমি তাঁর নাটকগুলোর আলোচনা স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ রেখেছি। আমার গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী অধ্যায়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের প্রতিনিধিস্থানীয় নির্বাচিত নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও রূপ-রীতি বিস্তৃত আলোচনায় সচেষ্ট থাকব।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১. বিপ্লব বালা ও হাসান শাহরিয়ার (সাক্ষাৎকার), 'আলাপনে আবদুল্লাহ আল-মামুন', হাসান শাহরিয়ার (সম্পা.), *থিয়েটারওয়ালা*, (ঢাকা : থিয়েটারওয়ালা, দশম বর্ষ : ৩-৪ যুগ্ম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮), পৃ. ৮৪।

২. সোলায়মান কবীর, *আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয় ও পরিচর্যা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৪), পৃ. ৬।

৩. রামেন্দু মজুমদার, 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : প্রোজ্জ্বল স্মৃতি', *নির্বাচিত রচনা*, (ঢাকা : কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮), পৃ. ৩৯৫।

৪. সেলিনা হোসেন ও নূরল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৬২।

৫. বিপ্লব বালা ও হাসান শাহরিয়ার (সাক্ষাৎকার), 'আলাপনে আবদুল্লাহ আল-মামুন', হাসান শাহরিয়ার (সম্পা.), *থিয়েটারওয়ালা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

৭. রামেন্দু মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮।

৯. বিপ্লব বালা ও হাসান শাহরিয়ার (সাক্ষাৎকার), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।

১০. সুকুমার বিশ্বাস, 'পঁচিশ বছরের বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন', *একুশের প্রবন্ধ-৯৬*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৬), পৃ. ১২৫।

১১. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'বাংলাদেশের নাটক রচনা : ধারা ও বিবর্তন', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাটক : তত্ত্ব ও শিল্পরূপ*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০১৩), পৃ. ১৭২।

১২. রাহমান চৌধুরী, উদ্ধৃত, সোলায়মান কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

১৩. রামেন্দু মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯।

১৪. শফি আহমেদ, 'সমকাল ও আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক', হাসান শাহরিয়ার (সম্পা.), *থিয়েটারওয়ালা*', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

১৫. সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।

১৬. 'আশির দশকের নাট্যচর্চার একটি বিশেষ দিক হলো এই, নাট্যদলগুলো বুঝতে পারলো রাজনীতির সাথে নাটকের কোনো বিরোধ নেই। কিছু কিছু দল জোরেসোরেই ঘোষণা দিলো নাটককে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলতে হবে। সেজন্য আশির দশকে যে নাট্যদলগুলো জন্ম নিচ্ছিলো তাদের প্রায় সকলেরই ঘোষণায় নাটকের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি ছিলো। দলগুলো এই প্রতিশ্রুতি কতোটা সমাজবিজ্ঞান সচেতন হয়ে দিয়েছিলো সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে নাটককে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করা যে নাট্যদলের একটি দায়িত্ব সেটা তারা বুঝতে পেরেছিলো। সেজন্য দলগঠনের পেছনে সমাজ পরিবর্তন বা শ্রেণিসংগ্রাম খুব জোর পেয়েছিলো।'

–রাহমান চৌধুরী, *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭), পৃ. ৩৭১।

১৭. রামেন্দু মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০।

১৮. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, 'নাটক জগতের ধূমকেতু', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, (ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১১), পৃ. ৬৬।

১৯. শফি আহমেদ, 'সমকাল ও আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক', *থিয়েটারওয়ালা*', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

২০. ফেরদৌসী মজুমদার, 'থিয়েটারের প্রাণপুরুষ', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

২১. সৈয়দ শামসুল হক, 'বিশাল বাংলার নাট্যপ্রাণ পুরুষ' রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২-১৩।

২২. শফি আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।

২৩. সোলায়মান কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

২৪. শফি আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

২৫. রামেন্দু মজুমদার, 'বাংলাদেশের নাটক : ১৯৭২-৮৬', *নির্বাচিত রচনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।

২৬. মো. জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৭), পৃ. ১৮২-৮৩।

২৭. সোলায়মান কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।

২৮. ইউসুফ ইকবাল, 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ : স্বপ্নভঙ্গজনিত বেদনার ভাষাচিত্র', *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, ৩৪তম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫), পৃ. ১৪৪।

২৯. রামেন্দু মজুমদার, *নির্বাচিত রচনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯।

৩০. বিপ্লব বালা ও হাসান শাহরিয়ার (সাক্ষাৎকার), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।

তৃতীয় অধ্যায়

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয়বৈচিত্র্য

বাংলাদেশের নাটকে সমকালের পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশকে যে কয়েকজন নাট্যকার তাঁদের নাটকের বিষয় হিসেবে উপজীব্য করে তুলেছেন আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁদের পুরোধা পুরুষ। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মেষ-বিকাশ-পরিণতি-অর্জন এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে বিধ্বস্ত-বিনষ্ট আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে গভীর মনোযোগসহ পর্যবেক্ষণ করেছেন। কারণ, 'সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন ঘটল। সাধারণ মানুষকে প্রথমেই অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। [...] কালো টাকা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি এবং সামাজিক নৈরাজ্য নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে করল বিচলিত ও বিভ্রান্ত। বিপর্যস্ত এই শ্রেণির দৈনন্দিন জীবনে তখন এক ভয়ংকর ভীতি, হতাশা আর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।'[১] আবদুল্লাহ আল-মামুন এই নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের ভীতি-হতাশা আর শূন্যতাকে ধারণ করে নাটকে রূপায়িত করলেন যুদ্ধোত্তর সমাজের চালচিত্র। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হকের মন্তব্য, 'আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর সমসময়কে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের আলোটা প্রধানত ছিলো প্রান্তিক মানুষ, গ্রাম ও বস্তির দরিদ্রজন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর, কখনো কখনো সমাজের সেই সুবিধাভোগী শ্রেণির ওপর যারা লুটেরা ও বলদর্পী, যারা বাক্যে পিচ্ছিল, আচরণে সুভদ্র, কিন্তু হন্তারক আসলে সুবচন ও মানবতার।'[২]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলোতে মূলত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশে শোষিত-বঞ্চিত-অসহায় দরিদ্র সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র, স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানজনিত কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবমূল্যায়ন, পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসনে বন্দি সমাজকে মুক্তির জন্য রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ থেকে নিম্নবিত্ত মানুষকে মুক্তির জন্য শ্রেণিসচেতনতা নবরূপ লাভ করেছে। জনৈক আলোচক বলেছেন, 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে মূল প্রেক্ষাপট মধ্যবিত্ত সমাজজীবন, দেশ, রাজনীতি বিশেষত– দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি বাংলাদেশের সমকালীন

সমাজজীবন থেকে নাট্যোপাদান সংগ্রহ করেন। স্বভাবতই তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ-রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ এবং সমকালীন সমাজজীবনের অবক্ষয়।'[৩] তিনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে ক্ষয়িষ্ণু সমাজবাস্তবতার প্রতিবেশে গভীর দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে সমাজের অবক্ষয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবমূল্যায়ন, মানুষের স্বপ্নজনিত আশা-ভঙ্গের দরুণ প্রতিবাদী চেতনা, অশুভ শক্তির দমনে রাজনৈতিক সুচেতনা এবং নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদ-বিদ্রোহ ইত্যাদি তাঁর নাট্যসাহিত্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাই বিষয়বৈচিত্র্যের আলোকে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলোকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

ক. স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়ভিত্তিক

খ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবন কেন্দ্রিক

গ. সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি নির্ভর

ঘ. শ্রেণিসংগ্রাম কেন্দ্রিক

ক. স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়ভিত্তিক :

আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত মৌলিক নাটকগুলোর মধ্যে *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪), *এখন দুঃসময়* (১৯৭৫), *অরক্ষিত মতিঝিল* (১৯৮০), *ক্রস রোডে ক্রস ফায়ার* (১৯৮১), *শাহজাদীর কালো নেকাব* (১৯৮৪), *আমাদের সন্তানেরা* (১৯৮৮), *কোকিলারা* (১৯৯০), *উজান পবন* (১৯৯১), *স্পর্ধা* (১৯৯৬), *মেরাজ ফকিরের মা* (১৯৯৭), *জন্মদিন* (২০০৬), *নিয়তির পরিহাস* (অপ্রকাশিত), *বিন্দু বিন্দু রং* (অপ্রকাশিত), *ঋতুরাজ* (অপ্রকাশিত) ইত্যাদি নাটকে প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে রচিত *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়জনিত কারণে নীতিহীন সমাজজীবনের চিত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি *এখন দুঃসময়* নাটকে মজুতদার-কালোবাজারিদের অর্থনৈতিক শোষণে নিপীড়িত মানুষের জীবনের ছবি দুঃখ গাঁথা হয়ে উঠেছে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমাজজীবনে অর্থনৈতিক টানাপড়েন, দুঃখ-দুর্দশা ও যুবসমাজের অবক্ষয়ের চালচিত্র রূপায়ণে *অরক্ষিত মতিঝিল, আমাদের সন্তানেরা* আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাট্যপ্রতিভার অনন্য সৃষ্টি। স্বাধীনতা উত্তরকালে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশযাত্রায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ট নারীনিগ্রহের প্রামাণ্য দলিল তাঁর *কোকিলারা* নাটক। এ সময়ে নবোত্থিত স্বাধীনতা বিরোধীদের মৌলবাদী-রাজনৈতিক শাসন-শোষণে জর্জরিত সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির ভগ্ন প্রতিবেশে প্রকৃত ধর্ম, মানবতা ও আবহমান বাঙালির সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির প্রস্ফূটনে *মেরাজ ফকিরের মা* আবদুল্লাহ আল-মামুনের কালজয়ী সৃষ্টি। তবে বাঙালির বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে তাঁর *ঋতুরাজ*

নাটকে বসন্ত ঋতুর রূপ-বৈচিত্র্য চিত্রিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়ভিত্তিক নাটকগুলোর *সুবচন নির্বাসনে*, *এখন দুঃসময়*, *কোকিলারা* ও *মেরাজ ফকিরের মা* প্রভৃতির বিষয়বৈচিত্র্য প্রকাশের কালক্রম অনুসারে বিশ্লেষিত হলো :

সুবচন নির্বাসনে

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সুবচন নির্বাসনে*[৪] নাটক ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত সমাজ কাঠামোর প্রতিবেশে সামাজিক অবক্ষয়ে প্রামাণ্যচিত্র। এ নাটকে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাঙালির জনমানসে আজন্ম লালিত শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির যে স্বপ্ন উপ্ত হয় তা একশ্রেণির অসাধু মানুষের নৈতিক-স্খলনজনিত কারণে সামাজিক অবক্ষয়ে পর্যবসিত হয়। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে যখন আস্তে আস্তে একটা নতুন দেশ নির্মিত হচ্ছে তখন লোভের বশবর্তী হয়ে অনেকে ভাগ্য পরিবর্তনের খেলায় ঘুষ-দুর্নীতিসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়। ফলে সমাজে নেমে আসে হতাশা, বেড়ে ওঠে আইন অমান্য করার প্রবণতা। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়জনিত প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট জাতীয় জীবনের হাতাশা, মেধার অবমূল্যায়নজনিত কারণে তরুণ সমাজের সন্ত্রাসবাদের পথ অবলম্বন, নারীর মর্যাদাহানি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছেন *সুবচন নির্বাসনে* নাটক। '*সুবচন নির্বাসনে* নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের নীতিহীন অবক্ষয়ের স্বরূপ চিত্রিত করেছেন। নাট্যকার শাণিত নাট্য-সংলাপে *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে দেখিয়েছেন– সৎ-মানুষ, সৎ-কর্মের অবমূল্যায়ন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নিয়ত নিয়মে পরিণত হয়েছে।'[৫] অন্যদিকে একশ্রেণির সুবিধাবাদী মানুষ ঘুষ-দুর্নীতির মধ্য দিয়ে বিত্ত-বৈভবের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। আর সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে দুর্বিষহ যন্ত্রণা, করুণ ভোগান্তি। এ প্রসঙ্গে সৌমিত্র শেখর যথার্থই বলেছেন :

> *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মানবিকতার অবক্ষয়ের একটি করুণ চিত্র আছে।[৬]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে সমকালীন মানবজীবনের করুণ-বেদনাবহ চিত্রটি একজন আদর্শ স্কুলমাস্টার পিতার শেখানো তিনটি শাশ্বত সত্য সুবচন বা নীতিশিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয়েছে। এ নীতিশিক্ষা বা সুবচনগুলোর প্রথমটি হচ্ছে– 'সততাই মহৎ গুণ'।[৭]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজনৈতিক বাস্তবতায় অর্থনৈতিক-সামাজিক শোষণমুক্তির স্বপ্নে বিভোর একদল মানুষ রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের দরুণ রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী রাজনীতিক ও ক্ষমতাবানদের সঙ্গে হাত মেলান। যুদ্ধোত্তর কালে এই সুবিধাবাদী শ্রেণি সমাজজীবনে সর্বব্যাপ্ত আধিপত্য বিস্তার করলে ব্যক্তিজীবনে নেমে আসে অস্থিরতা। ফলে চিরন্তন সত্যগুলোর প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ কারণে *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে নীতিহীন, ক্ষয়িষ্ণু সমাজবাস্তবতায় ব্যক্তিগত জীবনে পরাজিত আত্মগ্লানি নিমগ্ন তরুণ শিক্ষিত খোকন স্কুল মাস্টার বাবার শেখানো চিরন্তন আদর্শের সুবচনের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেননি। 'সততাই মহৎ গুণ'– এই আদর্শ শিক্ষা এবং সমাজের চিরাচরিত সত্যগুলো তার কাছে মিথ্যা কুহকে পরিণত হয়। খোকনের সংলাপে সেই সমাজবাস্তবতার চিত্র পাওয়া যায়। যেমন :

> আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো এ বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার বাবা। আমি তাঁর প্রথম সন্তান। ইনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন 'সততাই মহৎ গুণ'। একে গুণ তাতে আবার মহৎ–কাজেই তাঁর কথা আমি ফেলতে পারিনি। সৎ হয়েছিলাম। সৎ থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৎ হয়ে বাঁচতে পারিনি। অথচ কি আশ্চর্য, যখন সময় ছিল তখন কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি আসলে আমার জন্মদাতা আমাকে একটা ডাহা মিথ্যা কথা শিখিয়েছেন।[৮]

সমকালীন সমাজব্যবস্থায় সততা যখন নির্বাসিত তখন সামাজিক মূল্যবোধ বিনাশে চারদিকে নানা আয়োজন চলেছে। সে সময়ে খোকনের বাবার মতো শিক্ষকদের বৃহৎ অংশ সততাকে প্রতিষ্ঠা করতে অন্তপ্রাণ হলেও তাদেরই একাংশ জাতির মূল্যবোধ অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তারা ব্যক্তিস্বার্থে অর্থের লালসায় প্রশ্নপত্র বিক্রির মতো হীনকাজ করতেও দ্বিধা করতেন না। ফলে সমাজ থেকে সততা হারিয়ে যায়। ঘুষ-দুর্নীতি হয়ে ওঠে রাতারাতি বড়লোক বনে যাওয়ার উত্তম পন্থা। আর যারা ঘুষ দিতে পারেন না তারা অবমূল্যায়িত হয়েছেন সমাজের প্রতিটি পদে পদে। এ নাটকে বস নামক উচ্চ পদস্থ কর্তাব্যক্তির নিকট বাবার চিঠি নিয়ে খোকন পার্টটাইম চাকরির প্রত্যাশায় গেলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছেন। অথচ সেকেন্ড ডিভিশন ডিগ্রিধারী খোকন চাকরিটা না পেলেও ঘুষের বদৌলতে তার থার্ড ডিভিশন ডিগ্রিধারী বন্ধু চাকরিটা পেয়েছেন। সামাজিক মূল্যবোধ সমকালে এতটাই তলানিতে নেমেছিল যে, মেধার বদলে মেধাহীনরাই যোগ্য হয়ে ওঠেন। ঘুষ-বাণিজ্যের কাছে শিক্ষাগত যোগ্যতা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সমাজসত্যের এমন অবক্ষয়ের চিত্র খোকনের বন্ধুর সংলাপে প্রণিধানযোগ্য :

যেখানে ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন পাওয়া ক্যান্ডিডেটরা হালে পানি পেল না, সেখানে আমি থার্ড ডিভিশন ঠিক কূলে পৌঁছে গেলাম। চাকরির বাজারে কেউ অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কনসিডার করে না।[৯]

সুবচন নির্বাসনে নাটকে সমাজজীবন থেকে দ্বিতীয় নির্বাসিত সুবচন বা আদর্শ হচ্ছে– 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।'[১০] এ নাটকে অবসরপ্রাপ্ত স্কুল মাস্টারের ছোট সন্তান তপন বাবার শেখানো এই নীতিবাক্যের আদর্শের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। কারণ সমকালীন নীতি-নৈতিকতাহীন, অধঃপতিত, দুর্গন্ধময় সমাজে একশ্রেণির অসাধু মানুষ নিজেদের নিয়মে সমাজকে প্রভাবিত করে। এরা ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, টেন্ডারবাজি ইত্যাদি অপকর্ম করে মানবজীবনকে করে তোলে অস্থির, যন্ত্রণাময়। এ নাটকে বস এবং কেরানির সংলাপে নীতি-নৈতিকতাহীন এই সমাজের চিত্র পাওয়া যায় । যথা :

বস : নীতি-ফীতি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?

[...]

কেরানি : প্রিজম-এর ভেতর দিয়ে আলো যেমন সাত ভাগ হয়ে সাত রঙ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের নীতির ভেতর দিয়ে সত্য মানবতা–পরোপকার ইত্যাকার নানান ব্যাপার তেমনি সাত ভাগ হয়ে সাত রঙে বিভিন্ন স্থানে নিপতিত হয়। ঘরে এক রকম– অফিসে আরেক রকম– ময়দানে অন্য রকম। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হয় স্যার।[১১]

আর নীতি-নৈতিকতাহীন সমাজব্যবস্থায় মানুষ তার মৌল-মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে– বিশেষত তপনের মতো তরুণ সমাজ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। একারণে পিতার শেখানো আদর্শের বাণী, সত্যের পথ পরিহার করে তপনের মতো তরুণরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে সমাজে খুন–ছিনতাই, টেন্ডারবাজি-সন্ত্রাস ইত্যাদি অপকর্ম করে সমাজজীবনকে বিষিয়ে তোলেন। যুদ্ধোত্তরকালে বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয় ও বৈনাশিকতার এই পটভূমিতে তপন আদর্শ শিক্ষক বাবার হৃদয়ে লালিত শাশ্বত মূল্যবোধগুলো 'নষ্ট সমাজের যূপকাষ্ঠে' বিসর্জন দিয়ে বিনষ্টের চূড়ান্ত সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তপনের বিনষ্টের জন্য মূলত সমকালীন সমাজব্যবস্থা দায়ী। তপনের সংলাপ থেকে এই সমাজসত্য উদ্ভাসিত হয়েছে :

কি যেন কথাটা যার প্রথম অংশটুকু আমার মনে নেই– শুধু শেষ অংশটুকু মনে আছে– গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই–আমার বড় ভাইকে যেদিন ধরে নিয়ে গেল সেদিন কি করে যেন ওই কথাটার প্রথম অংশ

> আমার মন থেকে মুছে গেল ওই যে [...] তুমি যেমন করে ডাস্টার দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা মুছতে, ঠিক তেমনি করে মুছে গেল।[১২]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে অর্থনৈতিকভাবে মেরুদণ্ডহীন সমকালীন সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন ও নিগ্রহের করুণ বেদনাবহ-চালচিত্র উন্মোচিত হয়েছে তৃতীয় নির্বাসিত সুবচন 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'[১৩]-এর মধ্য দিয়ে। এ সমাজে অর্থ আর ক্ষমতার অপব্যবহার করে নারীর সম্ভ্রম, মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করে সমাজজীবনকে বিষিয়ে তুলেছেন দুষ্কৃতিকারীরা। এ নাটকে স্কুল মাস্টার বাবার আদর্শের শাসনে নিপীড়িত রানু বিশ্বাস করেছিল যে, স্বামীর সংসারে যত গালমন্দ কিংবা অত্যাচার-নির্যাতন করুক না কেন, কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করাই সংসারপরায়ণ নারীর ধর্ম। এজন্য রানু পরিপূর্ণ রমণী হয়েই কেরানি স্বামীর সংসারে সুখের নীড় রচনা করেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও মেধা-যোগ্যতাহীন কেরানি স্বামীর চাকরিটা নির্ভর করে রানুর শরীরের ওপর। তাই স্ত্রীর দেহকে পুঁজি করে মেধাহীন কেরানি ক্ষুন্নিবৃত্তির পথ বেছে নিয়েছেন। এ নাটকে কেরানি তার চাকরি রক্ষার্থে বসের যৌন-লালসা চরিতার্থ করার জন্য সহধর্মিণী রানুকে বসের হাতে তুলে দিয়েছেন। রানু কোনোমতে সম্ভ্রম রক্ষা করে স্বামীর কাছে জানালে, তার স্বামী কেরানি চাকরিটা বাঁচাতে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। বস্তুত কেরানির এ পরাজয় ঘুষ-দুর্নীতির মধ্য দিয়ে উঠতি নব্য-পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর প্রভুত্বের নিকট সমাজের সত্য-সুবচনগুলোর অবক্ষয়ের চিত্র। কারণ যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক প্রতিবেশে মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদী শ্রেণি মানুষের ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক, সামাজিক মূল্যবোধকেও হরণ করে নেয়। কেরানির সংলাপে এ সমাজসত্য প্রণিধানযোগ্য :

> চাকরি হারানো চলবে না। জানো গাঁটের পয়সা খরচ করে এ-দু'টো বোতল আমি কিনে এনেছিলাম ওই বাজে লোকটার জন্যই। আমার আশা ছিল, তুমি নিজ হাতে এখান থেকে মদ ঢেলে দেবে। তাতে কিচ্ছু যাবে আসবে না। কিন্তু তাতে আমার চাকরি পাকা হবে।[১৪]

কেরানির এই ব্যক্তিত্বহীন কর্মতৎপরতা সমকালীন ক্ষয়িষ্ণু সমাজের নীতি-নৈতিকতাহীন মানবিক অবক্ষয়ের করুণ চিত্রকে উন্মোচন করে।

বস্তুত *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ যুদ্ধোত্তর পরিবেশে ঘুষ-দুর্নীতির মধ্য দিয়ে রাতারাতি প্রভূত সম্পদ অর্জন করেছেন, আর অন্যদিকে একশ্রেণির মানুষ শোষিত-বঞ্চিত হতে হতে হতাশাজনিত কারণে সন্ত্রাসবাদের পদ বেছে নিয়েছেন। ফলে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে মানবিক

মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। তাই 'যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের মানবিক মূল্যচেতনার সঙ্কটকে নাটকে রূপদানের অন্তঃপ্রেরণা হতে রচিত আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক *সুবচন নির্বাসনে*।'[১৫]

এখন দুঃসময়

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখন দুঃসময়*[১৬] নাটকে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা কবলিত মানুষের জীবনের করুণ প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে বন্যাকে পুঁজি করে কালোবাজারি-মজুতদার শ্রেণির শোষণ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ নাটকের এক মেরুতে সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবনে নেমে আসে অভাব-দারিদ্র্য, দুঃখ-দুর্দশা; অন্য মেরুতে বন্যা কবলিত আড়তদার-মজুতদার কালোবাজারিরা অবৈধপথে অর্থ উপার্জনের মহোৎসবে মেতে ওঠেন। সঙ্গত কারণে 'এ নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়টি হলো বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সুযোগে বন্যার্ত অসহায় মানুষকে কীভাবে এক এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী আরো অসহায় করে তোলে তা দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করা।'[১৭] তাই যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা গ্রামবাংলার ফসলের মাঠ উপচে রাজধানীর মতিঝিল পেরিয়ে 'কাপ্তানবাজার তেজতুরিবাজার-ফকিরাপুলবাজার-মগবাজার-কারওয়ানবাজার' পর্যন্ত দ্রব্যমূল্যের দামে সুউচ্চ ঢেউ তোলে তখন আড়তদার-কালোবাজারি বেপারি পণ্যের পসরা নিয়ে গ্রামের শেষ মাথায় জঙ্গলে সবচেয়ে উঁচু জায়গায় আস্তানা গড়ে তোলেন– উদ্দেশ্য গঞ্জের আড়ত থেকে নৌকা বোঝাই মালামাল আসছে আর তা বন্যাকবলিত গ্রামবাংলার মানুষের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে নগদ অর্থ, সোনা-দানা, জমি হাতিয়ে নিবেন।

বস্তুত নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক দুর্যোগকে পুঁজি করে আড়তদার-কালোবাজারি শ্রেণির এই শোষণের চিত্র *এখন দুঃসময়* নাটকে মুখ্য বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। একই সঙ্গে 'বন্যা ও দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি নাট্যকার নাটকটিতে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বিপর্যস্ত বাংলাদেশের এক শ্রেণির মজুতদার-কালোবাজারিদের দুর্বৃত্ত ও লাম্পট্যের চিত্রও তুলে ধরেছেন।'[১৮] তাই *এখন দুঃসময়* নাটকে বন্যা কবলিত মানুষকে কালোবাজারি কর্তৃক শোষণের চিত্র মূল উপজীব্য বিষয় হলেও নাট্যকারের সমাজবীক্ষণধর্মী নিরীক্ষা, নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থাভাবে হৃদয়ের টানাপড়েন, অর্থের অভাবে একবেলা খাবারের আশায় নৈতিক স্খলন, বন্যায় অসহায় মানুষকে সহায়তার নামে শহুরে সুবিধাভোগী শ্রেণির ত্রাণ-সংগ্রহ করে আত্মসাৎকরণ, বিত্তের প্রাচুর্যে ধনিক শ্রেণির যৌনলিপ্সা, মধ্যবিত্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক চিত্র ইত্যাদি বিষয়ও ফুটে উঠেছে। এ নাটকে বন্যার কবলে গ্রামবাংলার ফসল পানির নিচে তলিয়ে গেলে এর প্রভাব শহুরে জীবনে দ্রব্যমূল্যের ওপর পড়ে। সংবাদপত্রের হেডলাইন থেকে এই চিত্র পাওয়া যায়। যেমন :

রাজধানীতে বন্যার পদধ্বনি

চালের মণ একশ' আশি'

[...]

চালের মণ দুশ' ষাট

[...]

ঢাকায় জোর গুজব তিন মাসের মধ্যে মওজুত খাদ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে।[১৯]

গ্রামীণ মানুষের সহজ-সরল জীবনে বন্যা অভিশাপ হয়ে নেমে আসে। গ্রামের পর গ্রাম, ফসলের মাঠ অথৈ পানির নিচে তলিয়ে গেলে অসহায় দরিদ্র মানুষ একবেলা খাবারের আশায় কাজের সন্ধানে চারদিকে ছুটে চলছেন। কখনো বা বন্যার প্রবল স্রোতে সর্বস্ব হারানো অসহায় নারীরা সামাজিক মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে কিংবা কর্মের অভাবে দুঃখের সাগরে ভাসতে ভাসতে আড়তদার-কালোবাজারি শোষক শ্রেণির 'রক্ষিতা' হতেও দ্বিধান্বিত হন না। *এখন দুঃসময়* নাটকে গ্রাম্য সহায়-সম্বলহীন জরিনা ক্ষুধার জ্বালায় গ্রাম্য দালাল মুন্সির প্ররোচনায় কালোবাজারি বেপারির 'বান্দা নারী' হয়ে পাড়ি জমান। পাহারাদার সোনা ও জরিনার কথোপকথনে বন্যা-কবলিত জীবনের সেই করুণ চিত্র প্রণিধানযোগ্য :

সোনা : ক্যান তুই এই হানে মরতে আইলি জরিনা– ক্যান আইলি?

জরিনা : তিন দিন তিন রাইত মাচার উপরে বইসা আছিলাম। কেউ আমারে একটা দানা খাইতে দেয় নাই। মুন্সি গিয়া কইল, 'জরিনা যাইবি এক জায়গায়– মেলা ভাত আছে– ভরা পাতিল উপচাইয়া পড়তাছে– সাদা সাদা ভাত– হাজারে হাজারে লাখে লাখে–' স্বপনের মইদ্যে চইলা আইলাম হের লগে।[২০]

আবদুল্লাহ আল-মামুন *এখন দুঃসময়* নাটকে শুধু অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রই নয়, বরং এই অর্থের প্রাচুর্যকে কেন্দ্র করে নারী-সমাজের নিগৃহীত ও বঞ্চনায় ধনিকশ্রেণির চরিত্রও উন্মোচন করেছেন। এ নাটকে মজুতদার-কালোবাজারি বেপারি যেন 'বাংলাদেশের নব্যপুঁজিবাদী সমাজের গোড়াপত্তন' করে ধনিকশ্রেণির ভোগবাদী মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে নিজেকে কালের বক্ষে শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। একারণে বেপারি জরিনাকে নিজের বান্ধা নারী (রক্ষিতা) করে রাখতে চান। বেপারির সংলাপে সমকালীন নারীর প্রতি অবমাননা এবং পুঁজিবাদী সমাজের ভোগবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন :

একজন মাইয়া মানুষ পোষা কি যেমুন তেমুন কতা রে? আগিলা দিনে রাজা বাদশারা হালি হালি মাইয়া মানুষ পুষত। অহন রাজা বাদশা গো দিন নাই ঠিক অই, কিন্তু হেই মিয়াগো মেজাজ মর্জির

আছরটা ঠিকই আছে। দশজনের দোয়ার দৌলতে হেই মেজাজ মর্জির সামাইন্য কিছু এই কালু বেপারির রক্তেও ভর করছে।[২১]

বেপারি গ্রামের বন্যা কবলিত মানুষের অসহায়ত্বকে পুজি করে তার শ্রেণি-চরিত্রের প্রতিষ্ঠায় স্বমহিমায় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। আড়ত থেকে চাল-ডাল-খাবার নিয়ে বেপারির নৌকা বানভাসি মানুষের জন্য রওনা দেয়। কিন্তু বেপারি সহায়তার আড়ালে গ্রামের কৃষক-মজুর শ্রেণির মানুষের গচ্ছিত নগদ টাকা-পয়সা, সোনা-দানা এমনকি পানির নিচের তলিয়ে থাকা জমি-জমা পানির দামেই কিনে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। বেপারি ও মুন্সির সংলাপে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যাকে আশ্রয় করে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধণিকশ্রেণির এই লুণ্ঠনের চিত্র ফুটে উঠেছে :

বেপারি : আমার মাতায় আরেকটা ব্যবসা ভন ভন করতাছে। গেরামে মানুষ না খাইয়া আছে, আন্দাজ কয়দিন?

মুন্সি : সাত– দশ– পনেরো– বিশ, কেন কও তো!

বেপারি : জমি বেইচ্যা ফ্যালাইতে কও।[২২]

এখন দুঃসময় নাটকে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব নাট্যকারের সুনিপুণ নির্মাণ। বন্যায় আক্রান্ত গ্রামবাসী একদিকে পানির নিচে মাঠের ফসল, ফসলি জমি হারাতে বসেছে আর অন্যদিকে গ্রামবাসীর নগদ সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ, সোনা-দানা বেপারির মতো মজুতদার-কালোবাজারি হস্তগত করতে করালগ্রাসে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু গ্রামবাসী পুঁজিবাদী বেপারির ষড়যন্ত্র এবং লুণ্ঠনের মানসিকতা বুঝতে পেরে প্রতিবাদে জ্বলে ওঠেন। যেন সফোক্লিসের (৪৯৬-৪০৬ খ্রি. পূ.) ইডিপাস-এর জাগরিত জনগণ কিংবা সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৫) নাটকের গ্রামবাসীর (যমুনাপাড়ের সতেরো গ্রাম) মতোই বানভাসি মানুষ তাদের অধিকার আদায়ে পুঁজিবাদী-আড়তদার শ্রেণির প্রতিনিধি বেপারির আস্তানা ঘিরে ফেলেন। তখন মাতবরের মতোই বেপারি চাতুর্যের আশ্রয় নেন। বেপারির সকল অপকর্মের সহচর মুন্সি, জনরোষ থেকে মুক্তি পেতে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি মাতবরের মতোই 'পাবলিকের' পক্ষাবলম্বন করেন। বেপারির সংলাপে তা স্পষ্টত হয়েছে :

পাবলিক জিনিসটা বহুত খতরনাক বুজলা মুন্সি। একবার ক্ষেইপা উঠলে তুমি কেন, তোমার চৌদ্দ গুষ্ঠী শ্যাষ। মাল কামাইবা আর পাবলিকের মন বুইজ্যা চলবা না এইডা তো অইতে পারে না। ক্যান দেহনা দুনিয়াসুদ্ধা মাতাওয়ালা লুকেরা কেমুন সুন্দর পাবলিকের মাথায় আত বুলাইয়া দুই পয়সা কাইরা খাইতাছে।[২৩]

কিন্তু বেপারি চাতুর্যবৃত্তি অবলম্বন করে মুন্সিকে জনগণের সামনে নিক্ষেপ করে এবেলা রক্ষা পেলেও শাসক-শোষিতের শ্রেণি-দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছলে শাসকের করুণ পরিণতি ঘটে। বেপারি সফোক্লিসের থিবির রাজা কিংবা *পায়ের আওয়াজ পাওয়া* যায় নাটকে মাতবরের মতো শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি সোনার বুকের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত প্রতিশোধের লেলিহান শিখায় নিক্ষিপ্ত হন। চারদিক ঘিরে বন্যা যখন বেপারিকে ঘিরে ফেলে– মালের নৌকাও আসে না, তখন তিনি বাঁচার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালান। তিনি গঞ্জে তার বড় ছেলেকে খবর পাঠিয়ে, গ্রাম থেকে ডিঙি নৌকা আনতে সোনাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু শাসকের নিষ্ঠুর শোষণ-বঞ্চনায় জ্বলতে জ্বলতে সোনা এবং জরিনা বারুদের মতো জ্বলে উঠেছেন। তারা বেপারির অনুরোধ, শাসন উপেক্ষা করে চারদিকে ঘুরে ঘুরে নেচে-গেয়ে ওঠেন, 'দামড়া পোলা সাতার জানে না, হেই হেই।' তখন বেপারি স্বমহিমায় বন্ধুক হাতে হুংকার দিয়ে সোনাকে গুলি করার হুমকি দেন। কিন্তু সোনার প্রতিশোধ স্পৃহা তাকে নির্বিকার করে দেয়। এবার বেপারি দুই টাকা– পাঁচ টাকা– দশ টাকা– এভাবে সমস্ত টাকার থলি ও জরিনাকে দিতে চেয়েও সোনাকে টলাতে পারেন না। সোনা প্রতিশোধের স্পৃহা ব্যক্ত করে পুঁজিবাদী সমাজের ক্রীড়নক কালোবাজারি বেপারির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সোনার সংলাপে এ ক্ষোভ প্রণিধানযোগ্য :

> বেপারি বন্যার পানিতে মানুষ যখন না খাইয়া মরে–তুমি তখন ক্ষেত খামার কিনতে চাও, না? [...]
>
> বেপারি, মা বইনের পেটে ক্ষিধা লাগছে খবর পাইলেই তুমার টেকার থলি মুখ খুইলা যায়, না?[২৪]

বেপারি বাঁচার কোনো উপায় না পেয়ে বন্দুক তুলে 'হালার পো' বলে সোনার বুকে গুলি চালান। আর গুলিবিদ্ধ সোনাও উঠে এসে বেপারিকে বানের জলে ডুবে মারেন। এভাবে *এখন দুঃসময়* নাটকে শাসক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব বেপারির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমান মর্যাদা লাভ করেছে।

বস্তুত *এখন দুঃসময়* নাটকে ১৯৭৪ সালে সংঘটিত বন্যায় আক্রান্ত মানুষের জীবনের দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশাকে পুঁজি করে গড়ে ওঠে একশ্রেণির সুবিধাবাদী মজুতদার শ্রেণি। 'আবদুল্লাহ আল-মামুন *এখন দুঃসময়* নাটকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ-জীবনের বাস্তবতায় মুনাফালোভী শোষকশ্রেণির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন।'[২৫] যাদের কারসাজিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে আর সাধারণ জনজীবনে নেমে আসে দুর্গতি। ফলে সমাজের একদিকে শোষক আর অন্যদিকে শোষিতের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। কিন্তু 'নাট্যকার কালোবাজারি, মজুতদার, দুর্বৃত্ত অসৎ ব্যবসায়ীমুক্ত সুশীল সমাজে বিশ্বাসী। তাই নাট্যকার বিক্ষুব্ধ বন্যার্ত জনতার বিক্ষোভ ও একজন ক্ষুব্ধ ব্যক্তিগত কর্মচারীর মাধ্যমে সমাজের দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ী ও তার সহযোগীর হত্যার মধ্যে দিয়ে এদের

চূড়ান্ত ও মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছেন।'[২৬] তাই সোনার আত্মোৎসর্গ *এখন দুঃসময়* নাটকে শোষক শ্রেণির সকল বঞ্চনার অবসানে মাহাত্ম্য লাভ করেছে।

কোকিলারা

ভোগবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নিষ্পেষিত-নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত এবং তজ্জনিত কারণে বিদ্রোহী নারীসত্তার আখ্যান আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত *কোকিলারা*[২৭] নাটক। এ নাটকে নাট্যকার পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গ-বৈষম্যকে (Gender discrimination) কেন্দ্রাতিক উপজীব্য করে নারীর অবহেলিত জীবনের চালচিত্রকে রূপায়িত করেছেন। একারণে 'পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজে লৈঙ্গিক পীড়নে নিষ্পেষিত নারীর প্রতি পুরুষের ভণ্ডামি, নিষ্ঠুরতা, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও এই বর্বর সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ম, বিদ্রুপ, প্রতিবাদ ও নারীর অক্ষম বিদ্রোহের চিত্র হয়ে উঠেছে এ নাটকটি।'[২৮] আবদুল্লাহ আল-মামুন তিন পর্বে বিভক্ত সাধারণ, খুব সাধারণ এবং অসাধারণ অর্থাৎ পুরুষশাসিত সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাজনের ভিত্তিতে তিনজন কোকিলার জীবনের চালচিত্র কিন্তু এক নারীর সামাজিক মূল্যবোধ, অধিকার ও শোষণ-বঞ্চনার চিত্র উপস্থাপন করেছেন। নারীকে কখনো অর্থের বৃত্তে, কখনো ধর্মের দোহাই দিয়ে, কখনো বা তাকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নানাভাবে সমাজে হেয়-প্রতিপন্ন করার এক আখ্যান এই *কোকিলারা* নাটক। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ আল-মামুন ও *কোকিলারা* নাটক সম্পর্কে নারী নেত্রী ও অধ্যাপক মালেকা বেগমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> নারীর প্রতি সহিংসতার বাস্তব রূপায়ণ তিনি যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন কোকিলারা নাটকে। তিনি লিখেছেন শ্রেণি, বিত্ত, পেশা, বয়স নির্বিশেষে নারী সমাজ ও পুরুষের দ্বারা লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, ধর্ষিত, ক্ষমতাহীন হতে বাধ্য হয়। সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার নারীর মনুষ্যত্ব ভূলুণ্ঠিত করে।[২৯]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *কোকিলারা* নাটকে প্রথম পর্বে নিম্ন-অর্থবিত্তের নারীর শোষণ-বঞ্চনার চিত্র অঙ্কন করেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় নারী যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে সহায়-সম্বলহীন এবং পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন কিংবা নির্ভরশীল পুরুষকে হারিয়ে একা হন, তবে সেই নারী যেন পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে ওঠেন! সমাজের চারদিক থেকে দারিদ্র্যের সুযোগে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি সেই নারীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। তখন অসহায় নারী অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অজুহাতে কোনো না কোনো পুরুষকে অসম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে বাধ্য হন। *কোকিলারা* নাটকে প্রথম কোকিলার বাবা তাদের তিন বোনকে রেখে অকালে মৃত্যুবরণ করলে

কোকিলার মা সামাজিক নিরাপত্তার কারণে গ্রামের এক বয়স্ক মাতবরকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। এ প্রসঙ্গে কোকিলার সংলাপে তার মায়ের ভাষ্য পুরুষশাসিত সমাজের এমন চিত্র উদ্ভাসিত করেছে :

> ঐ বুইরার লগে বিয়া না বইলে, একজন পুরুষ না থাকলে এই রাক্ষসের দুনিয়ায় না আমি বাঁচতে পারুম না তরা বাঁচতে পারবি। খাবলা দিয়া তগ গতর থিকা গোশত উঠাইয়া লইব। পলানির জাগা পাইবি না। পুরুষ পোলা হইয়া জন্মাইতে পারলি না? ক্যান, ক্যান মাইয়া হইয়া জন্মাইলি? মাইয়া মানুষের একমাত্র ভরসা হইতাছে পুরুষ। পুরুষ ছারা মাইয়া মানুষ বাঁচে না।[৩০]

কোকিলার মায়ের পুরুষের ওপর এই নির্ভরতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের কর্তৃত্বের নিকট একজন নারীর অসহায় জীবনব্যবস্থার করুণ চিত্র ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাকে চিত্রিত করেছে।

কোকিলা পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজের এক অসহায় নারীর সন্তান– পিতার মৃত্যুর পর তারও সামাজিক মর্যাদা যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়। অসহায় মায়ের মতো তিনিও ভাসতে ভাসতে শহরে এসে খাদ্যের নিরাপত্তা পেলেও তার দেহের কিংবা মনের বিকাশ নির্ভর করে পুরুষের রুচির ওপর। পুরুষ শাসিত সমাজে একজন কোকিলার যেন ভালোলাগা-ভালোবাসার অধিকার থাকতে নেই! পুরুষ যতক্ষণ চাইলো তো ততক্ষণ তাকে ভালোবাসল, তার শরীর সর্বস্ব লুটিয়ে নিয়ে প্রয়োজন শেষে কেটে পড়ল। পুরুষের শরীরের প্রতি যেন নারীর কোনো অধিকার নেই, নেই স্বাদ-আহ্লাদ কিংবা সামাজিক কোনো মর্যাদা। *কোকিলারা* নাটকে নারীর দেহের প্রতি কামুক পুরুষের এই লাম্পট্যের লোলুপ চিত্র গৃহকর্তার ভাতিজা আনু ও কোকিলার প্রেমের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। এ নাটকে আনু মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে ফেলে আল্লাহকে দোহাই দিয়ে বিয়ের প্রলোভনে কোকিলার দেহ-সর্বস্ব ভোগ করে বিদেশে পাড়ি জমান। আনুর এ আচরণে নারীর হৃদয়-বৃত্তি নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জঘন্য রূপ ফুটে উঠেছে। যেমন কোকিলার সংলাপে :

> কুত্তার বাচ্চা, জালেম, হারামখোর, বেঈমান। মাসের পর মাস গেছে। আইজকা তিনমাস, ঐ মিথ্যুক পুরুষের বাচ্চা একটাবারের লিগা এই বাসায় বেড়াইতেও আসে নাই। [...] পুরুষের বাচ্চা আল্লাহর নাম লইয়া আমারে নষ্ট কইরা, আমার ইজ্জত লুট কইরা ভাগছে।[৩১]

আবদুল্লাহ আল-মামুন *কোকিলারা* নাটকে শুধু ভোগবাদী পুরুষের নিকট নারীর নিগৃহীত হওয়ার চিত্র তুলে ধরেই ক্ষান্ত হননি; নাট্যকার গৃহকর্তা কিংবা রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পুরুষের নিকটও একজন নারী যে শুধু ভোগের পণ্য হিসেবে বিবেচিত হন, সেই পুরুষতান্ত্রিক নগ্নতা উন্মোচন করেছেন।

কোকিলারা নাটকের দ্বিতীয় পর্বের কোকিলা উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের এক সুশিক্ষিত গৃহপরায়ণা নারী। উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের এবং শিক্ষিত সচেতন হওয়ায় কোকিলা সমাজে সম-অধিকার ভোগ করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ সমাজের কোকিলাদের অধিকার ভোগে প্রধান বাধা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় পুরুষের সীমাহীন ভোগবাদী মানসিকতা। পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থব্যবস্থা মানুষকে এতটাই ভোগবিলাসী করে তোলে যে, এ সমাজে পুরুষ একজন নারীকে অর্থের বিনিময়ে শুধু ভোগের পণ্যই মনে করেন। এ কারণে দ্বিতীয় পর্বের কোকিলার স্বামী খন্দকার সাহেব তার অফিসের নারী কর্মচারী অর্থাৎ 'পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট'কে কর্মঘণ্টার পরেও নানা অজুহাতে আটকে রাখতেন। চট্টগ্রামে বেড়াতে গেলেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। খন্দকার সাহেবের এই মানসিকতা স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় পুরুষের ভোগবাদী লাম্পট্য-ভণ্ডামির চিত্র উন্মোচিত করেছে। নারীর প্রতি পুরুষের এই লাঞ্ছনার চিত্র ফোনে কথোপকথনরত জনৈক মহিলার উত্তরে দ্বিতীয় পর্বের কোকিলার সংলাপে :

> গতকাল চট্টগ্রামে বিবাহিত এক পুরুষ এক কুমারীকে বিয়ে করে কক্সবাজারে সমুদ্র দেখতে গেছেন। আমার স্বামী খন্দকার সাহেব তার পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্টকে কাজের বাহানা করে চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ অভ্যাস তার বহুদিনের।[৩২]

দ্বিতীয় পর্বের কোকিলা তথাকথিত আধুনিক সমাজে ভোগবাদী অর্থব্যবস্থার নিদারুণ কষাঘাতে জর্জরিত শোষিত-বঞ্চিত এক নারীর প্রতিনিধি। কোকিলা দুই কন্যা সন্তানসহ স্বামী খন্দকার সাহেবের সঙ্গে পঁচিশ বছরের ঘরসংসার করেও স্ত্রীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দরুণ কোকিলার স্বামী খন্দকার সাহেব ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে অফিসের 'পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট'কে জীবনসঙ্গী করে নারীর নতুনত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে চেয়েছেন। তিনি একজন পুরুষ বিধায় একজন নারী অর্থাৎ কোকিলাকে পরিত্যাগ করতে পারেন, অথচ কোকিলা নারী হওয়ায় সতীনের সঙ্গে ঘর-সংসার করারও সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। খন্দকার সাহেবের এই রুচিবোধ অশ্লীল, অসভ্য, লাম্পট্য ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি নিষ্ঠুর বৈষম্যমূলক আচরণকে উন্মোচিত করেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুন *কোকিলারা* নাটকে নারীর শরীরের প্রতি পুরুষের এই বীভৎস লোভ-লালসা, লাম্পট্যের চিত্র সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। কোকিলার সংলাপে তার স্বামী খন্দকার সাহেবের বক্তব্যে পুরুষের এই লাম্পট্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন :

> আমি ঠক, জোচ্চোর, বদমাস, লম্পট, এই, এই আমার আসল রূপ। তোমার সঙ্গে পঁচিশ বছর বসবাস করে আজ আমি ক্লান্ত। আমার ভাল লাগে না। প্রতিদিন একই ঘরে একই মুখ দেখতে। আমি জীবনে বৈচিত্র্য আনতে চাই। কেন চাইব না? বৈচিত্র্য আনার ক্ষমতা তো আমার আছে। আমি টাকা দিয়ে কিনে নেব পৃথিবীর সকল সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ, ফূর্তি।[৩৩]

পুরুষশাসিত সমাজের অর্থ-বিত্ত-বৈভবের প্রভাব সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকারকে পুরুষের অপ্রতিরোধ্য কামনা-বাসনার নিকট মুহূর্তে চুরমার করে দিয়েছে। একজন কোকিলা পঁচিশ বছর স্বামীর সংসার করেও তালাক প্রাপ্ত হয়ে আশ্রয় নেন ভাইয়ের বাড়িতে। আবদুল্লাহ আল-মামুন উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে নারীর এই অধিকার বঞ্চনার চিত্র বুর্জোয়া ভোগবাদী অর্থ-ব্যবস্থার নিরিখে অঙ্কন করেছেন।

পুরুষশাসিত পুঁজিবাদের দরুণ সমাজের নিম্ন-মধ্য-উচ্চ কোনো স্তরেই নারীর জীবন ন্যূনতম মানবিক অধিকার ভোগে স্বাধীন নন। সমাজের প্রতিটি স্তরেই নারীকে শুধু তার শারীরিক গঠনের নিরিখে বিবেচনা করে নানা ধরনের লৈঙ্গিক-বৈষম্য-নিপীড়ন ও ব্যভিচার-লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হয়। তাই তৃতীয় পর্বের আইনজীবী কোকিলা নারীর প্রতি সকল লৈঙ্গিক-বৈষম্য দূর করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্পে নারীর প্রতি সংঘটিত সমকালীন সমাজের অন্যায়-অবিচার, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, সরকারি চাকরিজীবীদের ঘুষ-দুর্নীতি, নারীর প্রতি পুরুষের বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতি আদালতের নিকট উপস্থাপন করে দুই আসামির বিচার প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-রাষ্ট্রে পুরুষের প্রণীত আইন পুরুষের রক্ষাকবচ হিসেবে প্রণীত হয়েছে। এ আইনের ফাঁক-ফোকড় বা কানাগলির পথ পিছলে পুরুষরা ঠিকই রক্ষা পান আর কোকিলারা কেউ সমাজভ্রষ্ট হিসেবে অভিহিত হন, কেউ বা তালাক প্রাপ্তা হয়ে ভাইয়ের সংসারে বোঝা হন। রাষ্ট্রীয় আইনে নারী সমাজের প্রতি এই বৈষম্য আবদুল্লাহ আল-মামুন *কোকিলারা* নাটকে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। নাট্যকার দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রীয় আইনে নারী-পুরুষের অসম অধিকারের কারণে নারীর প্রতি অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন, ব্যভিচার যুগ যুগ ধরে চলেছে। পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত আইনে নারীর প্রাপ্য ন্যায্য বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদে চলেছে। একারণে নাটকের তৃতীয় পর্বের ব্যারিস্টার কোকিলা গণ-আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। গণ-আদালতের নিকট কোকিলার প্রার্থনা :

> মহামান্য আদালত, এবার আমি বাধ্য হয়েই আপনার সঙ্গে জায়গা বদল করছি। আইন যেখানে নীরব থাকে, দুঃখজনকভাবে অমানবিক ভূমিকা পালন করে, সেখানে বে-আইনই একমাত্র ভরসা। [...] আনোয়ার হোসেন, হাবিব খন্দকার এখন আপনারা যে আদালতের মুখোমুখি হয়েছেন সেই আদালতের এক এবং অদ্বিতীয় নাম গণ-আদালত। সভ্যতা এবং মানবতার মাপকাঠির বিচারে এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালতে আপনাদের অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।[৩৪]

কিন্তু যে সমাজে পুরুষের প্রাধান্য সর্ববিস্তারি সেই সমাজের গণ-আদালতেও নারীর অবস্থান ক্ষীণ কিংবা সমান অধিকার ভোগ ও ন্যায়বিচার পাবার সুযোগ নেই। একারণে গণ-আদালতে পুরুষের বিরুদ্ধে

জাদরেল ব্যারিস্টার কোকিলা তার মক্কেলদের ন্যায্য বিচার পাননি। তার মক্কেলদের পক্ষে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে আসামিরা মুক্তি পেয়েছেন। বস্তুত আনোয়ার হোসেন এবং খন্দকার সাহেবের বেকসুর খালাস প্রদানের মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আইনগত আধিপত্যবাদ আরো বিস্তৃত হয়েছে। এ নাটকে নারীর আইনগত অধিকার বঞ্চনার চিত্র নেপথ্যে গণ-আদালতের বিচারকের রায়ে প্রণিধানযোগ্য :

> আসামি আনোয়ার হোসেন এবং আসামি হাবিব খন্দকারের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় বিজ্ঞ আইনজীবীদের সওয়াল-জবাব এবং সাক্ষীগণের বক্তব্য শ্রবণ করে আদালত এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। সে মতে আদালত জনাব আনোয়ার হোসেন ও জনাব হাবিব খন্দকারকে বেকসুর খালাস প্রদান করছে।[৩৫]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *কোকিলারা* নাটকে আইনজ্ঞ কোকিলার আইনগত পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের নারীর অধিকার বঞ্চনার আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। সমাজের নিম্ন-মধ্য-উচ্চ যে কোনো স্তরেই পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর জীবন নিরাপদ নয়, তারা সর্বস্তরে পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত হন। একারণে, 'পুরুষের বর্বরতার নির্মম আলেখ্য হয়ে উঠেছে *কোকিলারা*। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ আর ধর্মের লৌহনিগর কেমন করে বন্দিনী করে রেখেছে নারীকে- তাও মূর্ত হয়ে উঠেছে। পদে-পদে, পলে-পলে নারীত্বের অবমাননার ধিক্কার এই নাটক।'[৩৬] নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *কোকিলারা* নাটকে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর পারিবারিক, সামাজিক, আইনগত ও মনস্তাত্ত্বিক বৈষম্য-নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

মেরাজ ফকিরের মা

পঁচাত্তরের কালরাত্রির পর সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারের হাত ধরে নব জাগরিত পাকিস্তান সমর্থক স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী নব্বইয়ের দশকে রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা শাখায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আজন্ম-লালিত সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষ-অস্তিত্ব, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, বাঙালি সংস্কৃতির জাগরণ প্রভৃতি চেতনা ধর্মান্ধদের অপকৌশলে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। এ সময় বাঙালির হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতি ও বিশেষত নারীজাতির ওপর ধর্মান্ধ-মৌলবাদীদের ফতোয়াবাজি বাঙালির জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মান্ধ-মৌলবাদীদের অপচেষ্টায় তখনও স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি দমে যাননি; তাঁরা 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠন করে সমগ্র দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগরিত করে ধর্মান্ধ-মৌলবাদীদের প্রতিহত করার ঘোষণা দেন। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন এ সময় ধর্মান্ধ-ফতোয়াবাজদের

প্রতিরোধে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির জাগরণে রচনা করে *মেরাজ ফকিরের মা*[৩৭] নাটক। এ প্রসঙ্গে নাট্য সমালোচক রাহমান চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত ও থিয়েটার প্রযোজিত *মেরাজ ফকিরের মা*, একই সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে রচিত।[৩৮]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে বাঙালি জাতির শেকড়ের সন্ধান করেছেন। হাজার বছরের পথ ধরে বাংলার জল-আবহাওয়ায় লালিত-পালিত সংস্কৃতির ধারায় এদেশে নানা-বর্ণ ও ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফলে গড়ে উঠেছে এক সম্প্রীতির সংস্কৃতি। কিন্তু ধর্মান্ধ-মৌলবাদীরা ধর্মকে অপব্যবহার করে মা-মাটি-সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করার কর্মতৎপরতা চালান। সঙ্গত কারণে আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'এই নাটকে বাংলাদেশে নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো, মৌলবাদী গোষ্ঠীর ভয়ংকর উত্থান, নারীর ওপর ফতোয়াবাজি এবং জেহাদি আন্দোলনের চিত্র সমান্তরাল পরিণতিতে এগিয়েছে। পরিশেষে নাটকে নারীর ওপর ফতোয়াবাজির চরম রূপ প্রতিস্থাপিত হয়েছে।'[৩৯] সংস্কৃতি মনস্ক নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন এই ধর্মীয় উন্মাদনা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বাঙালির হাজার বছরের প্রবহমান মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সংস্কৃতির ধারা ও মাতৃত্বের বিজয়কে *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে চিত্রিত করেছেন।

মেরাজ ফকিরের মা নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির বিপরীতে মৌলবাদী ধর্মান্ধদের ধর্মের নামে উন্মত্ত কুসংস্কার-গোঁড়ামীকে চিত্রিত করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে নবোত্থিত মৌলবাদীরা তাদের স্বীয়-স্বার্থ সিদ্ধি ও সমাজের সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে আধুনিক শিক্ষা সংস্কারের বিকাশে বাঁধা হয়ে দাঁড়ান। তাদের মতে বাঙালি সংস্কৃতি কিংবা আধুনিক শিক্ষা যে কেউ ধারণ করলেই ধর্ম বিরোধী হয়ে উঠবেন। তারা মনে করেন আধুনিক শিক্ষা মানুষকে ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং এ শিক্ষা ধারণকারী মানুষ সমাজে বেশরিয়তি কাজকর্মে নিযুক্ত হয়ে সমাজ ও ধর্মকে বিনষ্ট করবে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আপন সহোদর হলেও তাদের সঙ্গে বসবাস করলে একাল-পরকাল দুকুলই যাবে। *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে শহরবাসী সহোদর সেরাজের আগমনের সংবাদ শুনে মেরাজ ফকিরের প্রতিক্রিয়ায় আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতার এ স্বরূপ ফুটে উঠেছে :

> ভালমন্দ বিচার করার আমি কে? সে বিচার করবেন পাক পরওয়ার দিগার হাশরের ময়দানে। আমি শুধু এইটুকু বলবার পারি, সেরাজ মিয়া ধর্ম করে না। ধর্ম মানে না। কোরান হাদিস শরা শরিয়তের ধার ধারে না। তার সঙ্গে একগৃহে বসবাস আমার পক্ষে জায়েজ হয় না।[৪০]

ধর্মীয় মৌলবাদীরা তাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও নারীকে সামাজিকভাবে গৃহবন্দী করে রাখতে চান। ধর্মীয় অনুশাসনের নামে পর্দা-প্রথার ধুয়া তুলে নারীকে গৃহকর্মের বাহিরে দেখলে ফতোয়া জারি করেন, এমনকি জন্মদাত্রী মা অন্য ধর্মের হওয়ায় মাতৃত্বকে অপমান করেন। ধর্মান্ধদের এ বর্বরতা ধর্মীয় অনুশাসন অনুসৃত নয়– তাদের এ স্বরূপের গভীরে প্রোথিত রয়েছে যৌন-লিপ্সা এবং সামাজিক আধিপত্য বিস্তার। একারণে *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে দুই পিরের একজন– মেরাজ ফকির তার মা আলোরানীর পূর্বের হিন্দু পরিচয় জানার পর মাতৃত্বকে অপমান করতে দ্বিধাবোধ করেননি। অন্যজন গেদা ফকির গ্রামের এক যুবতী বউকে তার স্বামীকে ফসলের মাঠে সহায়তা করতে দেখে বেশরিয়তি আখ্যা দিয়ে, সেই বউয়ের পেটে আলকাতরা লাগিয়ে দিয়েছেন। ধর্মীয় শাসনের নামে নারীর প্রতি গেদা ফকিরের এই অপকর্ম ধর্মানুসৃত নয়, বরং এটি গেদা ফকিরের যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার অভিপ্রায় থেকে উৎসারিত হয়েছে। গ্রামের শিক্ষিত মাস্টারের সংলাপে ধর্মান্ধদের এই বর্বর রূপ প্রণিধানযোগ্য :

> গতকাল বৈকালে উত্তর পাড়ার কাশেম আলী জমিতে হাল দিবার কালে তার বউ তারে সাহায্য করতাছিল। আচমকা সেখানে সাঙ্গোপাঙ্গোসহ হাজির হইলেন গেদা ফকির। কথা নাই বার্তা নাই কাশেম আলীর বউয়ের পেটের কাপড় তুলে পেটে আলকাত্‌রা ঘঁষে দিল এই বুড়ো নমরুদ।[৪১]

প্রকৃত অর্থে এই পির-ফকিররা এদেশের সাধারণ ধর্মভীরু এবং ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ঘাড়ে জেকে বসেছেন। একদিকে তারা তাদের যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে ধর্মের অপব্যাখ্যা দেন, মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে ফকিরি চিকিৎসার নামে পানি-পড়া দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেন। অন্যদিকে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে পির-ফকিররা বাংলাদেশকে ভেঙে আবারও পাকিস্তান রাষ্ট্র ফিরে পাওয়ার দিবা-স্বপ্ন দেখেন। *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে পির-ফকিরদের বাংলাদেশ বিরোধিতার বীজ পাকিস্তান আমলের সাম্প্রদায়িক ধর্মীয়চেতনা থেকে উৎসারিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের প্রাক-কাল থেকে যে মৌলবাদী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী বাঙালি সংস্কৃতিকে ভারতীয় কিংবা হিন্দুর সংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে অপপ্রচার চালাতেন, তারাই স্বাধীনতা উত্তরকালে সামরিক শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনীতি ও রাষ্ট্রক্ষমতায় পুনর্বাসিত হলে নবরূপে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন। একারণে ধর্মান্ধ পির গেদা ফকিরের মতো মেরাজ ফকিরও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে পাকিস্তানের

স্মৃতি-সুখ রোমন্থন করে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলেছেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে পাকিস্তানি আদর্শের প্রতীক ধর্মান্ধ-মৌলবাদীদের ধর্মের নামে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা বিরোধীদের স্বরূপ নিপুণভাবে চিত্রিত করেছে। মৌলবাদীদের এই রূপ মেরাজ ফকিরের সংলাপে চিত্রিত হয় :

> কিসের স্বাধীনতা? মালাউনদের ঐ আরেক ষড়যন্ত্র। আল্লার দান পাকিস্তানেরে দুই টুকরা করে হেরা আল্লারেই চ্যালেঞ্জ কইরা বসল। রাগে দুঃখে পাক পরওয়ার দিগার মুখ ফিরাইয়া নিলেন। বাংলাদেশ হইয়া রইল কিছুদিন হাফ মালাউনের দেশ। আইয়ামে জাহেলিয়াত কায়েম হইল। অবশেষে আবির্ভূত হইলেন সূর্যসেনার দল। বিপদ কিছুটা কাটল। আল্লার শাসন কায়েম হইল। মুসলমান সিনা টান কইরা জায়নামাজে খাড়া হইল। কিন্তু রুকুতে গিয়াই খামোশ। সেজদা পর্যন্ত যাইতে পারল না।[৪২]

আবদুল্লাহ আল-মামুন *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত ধরে ক্ষমতায় যাওয়ার এক দেউলিয়াপনা রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এদেশের রাজনীতিতে বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আশি-নব্বইয়ের দশকে (এমনকি বর্তমানে) এক শ্রেণির রাজনীতিক রাতারাতি নিজেদের ভাগ্য বদলের জন্য মানুষের ধর্মানুভূতিকে পুঁজি করে পির-ফকিরদের সঙ্গে কিংবা ধর্মীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। ফলে রাজনীতিকরা যেমন ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে ক্ষমতা গ্রহণ করে ঘুষ-দুর্নীতির মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিত্ত-বৈভব অর্জন করেছেন, তেমনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় দিনেদিনে ধর্মের নামে মৌলবাদীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন। এ নাটকে ধর্মকে ব্যবহার করে স্থানীয় নেতা কাজী তোবারক ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে পির মেরাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে– মেরাজকে জেহাদ শুরু করার উস্কানি দিয়ে স্থানীয় ধর্মভীরু মানুষদের সহানুভূতি আদায় করে নির্বাচনে জয়লাভ করার স্বপ্ন দেখেন। কাজী তোবারকের সংলাপে ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতিতে জয়লাভের এমন হীন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

> কোমর বান্ধেন হুযুর। আমি আবুধাবি থিকা আইসা পরছি। আর চিন্তা নাই। আমি আছি আপনের পাছে। এই পলাশপুর গ্রাম থিকাই শুরু হোক মেরাজ ফকিরের জেহাদি আন্দোলন।[৪৩]

মেরাজ ফকিরের মা নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন নব্বইয়ের দশকের পির-ফকিরদের ধর্মকে আশ্রয় করে– ধর্মের অপব্যাখ্যাদান, ফতোয়াবাজি ও জেহাদি আন্দোলন প্রভৃতি উপজীব্য করে তুলেছেন। এ সময় সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে সামান্য ত্রুটি হলে কিংবা নিজেদের স্বার্থ-উদ্ধার করতে পির-ফকিররা মানুষের ওপর ফতোয়া জারি করেন। এ নাটকে গ্রামের প্রাচীনপন্থি পির গেদা ফকির

আমাদের দেশের আশি-নব্বই দশকের ধর্মের প্রকৃত সত্য আড়াল করে অপব্যাখ্যা দানকারী একজন ধর্মান্ধ মৌলবাদী। কেননা উনচল্লিশ বছর পূর্বে মেরাজ ফকিরের মা হিন্দু আলোরানী ভালোবেসে মুসলমান মোজাহের মণ্ডলের সঙ্গে কাজী অফিসে তরিকামতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু সেই বিবাহের দলিল প্রমাণ না থাকায় আলোরানী মুসলমানকে বিবাহ করে ধর্মের অবমাননা করেছেন! অথচ গেদা ফকিরের এক ফতোয়াতে আলোরানীসহ সমগ্র পরিবার তওবা করলে উনচল্লিশ বছরের পাপমুক্ত হয়ে মুহূর্তে সাচ্চা মুসলমান হয়ে যাবেন। অন্যথায় গ্রামবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলে মেরাজ ফকিরের পরিবারের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে শাস্তি দেয়া হবে। গেদা ফকিরের সংলাপে নব্বইয়ের দশকের ধর্মীয়-মৌলবাদীদের ধর্মের অপব্যাখ্যা দান ও ফতোয়াবাজির এমন স্বরূপ প্রণিধানযোগ্য :

> মজলিশে একটা বিশেষ ফতোয়া জারী করব। আমি বিধান দিব। উনচল্লিশ বছর কেন, পঞ্চাশ কি একশ বছর পরেও ভুল শুদ্ধ করা যায়। [...] মণ্ডল সাব, আমি সকলের উপস্থিতিতে, আপনি সহ আপনার ফ্যামিলির সকলকে তওবা পড়াব। [...] আমি ডিক্লেয়ার দিব, আপনেরা সাচ্চা মুসলমান হইয়া গেলেন। আপনাদের গতরে মালাউনের নাম গন্ধও থাকল না। হিন্দু রমণী আলোরানী চক্ষের পলকে আপনের আইনসঙ্গত বিবি হইয়া গেলেন। আপনের সন্তানেরা মুসলমানের সন্তানে পরিণত হইল।[৪৪]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে উগ্র-ধর্মীয় উন্মাদনায় প্রজ্জ্বলিত লেলিহান শিখায় পুড়ে ছারখার হওয়া মানুষের অন্তরাত্মার ধর্মের মূল তত্ত্বকে উচ্চকিত করেছেন। এ নাটকে মেরাজ ফকির প্রথমে তার মা আলোরানীর ধর্মীয় পরিচয় শুনে, ধর্ম অবমাননার দরুণ উন্মাদের ন্যায় জন্মদাত্রীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু ঐশী বাণীর মধ্য দিয়ে মেরাজ ফকিরের উপলব্ধি নাট্যদর্শনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও ধর্মের গুঢ়ার্থ অনুধাবন করে অধর্ম থেকে মানবতার মূল তত্ত্বে উজ্জীবিত হয়ে তিনি মাকে প্রকৃত ধর্ম মনে করেন। কেননা সকল ধর্মেই মাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হয়েছে। একারণে মেরাজ ফকির ধর্মের নাম ব্যবহার করে মানুষ ঠকানোর পথ থেকে সরে আসেন। ধর্মীয় অপ-শাসনের কবল থেকে মা, পরিবার ও ধর্মপ্রাণ মানুষকে রক্ষা করতে মাস্টার এবং প্রগতিশীল গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ফতোয়াবাজ গেদা ফকিরকে প্রতিরোধ করেন। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সেরাজ ধর্মের প্রকৃত সত্যের পথে মেরাজ ফকিরকে উদ্বুদ্ধ করে ধর্মের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে আহ্বান জানান। ধর্মের প্রকৃত সত্য আড়াল করার জন্য প্রাচীনপন্থি পির গেদা ফকিরের ভর্ৎসনা করেন। সেরাজের সংলাপে প্রকৃত ধর্ম ও মানবতার এই বিজয় সূচিত হয়েছে। যেমন :

চোউপ ধান্ধাবাজ ফকির। মায়ের ধর্ম জানস তুই? মায়ের আসল ধর্ম, সে মা। মায়ের অন্য ধর্ম, সেটা অতিরিক্ত। দুনিয়া জাহানে এক আল্লা ছারা কেউ তারে বিধান দিবার ক্ষমতা রাখে না। তুই তো এক মতলববাজ ফকির। তুই কি আমার মারে বিধান দিবি? যা ফকির, পারলে নিজের জান্নাতবাসী মায়ের মুখটা স্মরণ কর গিয়া। মাস্টার, পাজী তোবারকরে ধইরা রাইখা সময় নষ্ট কর কেন? ছাইড়া দেও। অর টাউটারি ব্যবসার সময় যায়।[৪৫]

এ নাটকে নাট্যকার ধর্মান্ধ একশ্রেণির মানুষের ধর্মকে পুঁজি করে মানুষ ঠকানোর বীভৎস চিত্র বাস্তবে রূপদান করেছেন। সমাজে এই ধর্মান্ধ গোষ্ঠী তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দিয়ে নানাভাবে ভুলিয়ে রাখতেন। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম আর ধর্মের নামে মানুষের সঙ্গে ব্যবসা করার মর্মার্থ উপলব্ধি করে মেরাজ ফকিরের রূপান্তর ঘটেছে মানবতার দিকে। একারণে নাটকের পরিশেষে মেরাজ ফকির হিন্দু মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেও ভিন্ন ধর্মের আদর্শ পথ অনুসরণ করে বাঙালির আবহমান সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে উঠেছেন। বস্তুত নাট্যকার মেরাজ ফকির এবং তার মায়ের ধর্ম পরিচয়ের ঘাত-সংঘাতে ধর্মীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধ চেতনাকে পরিত্যাগ করে ধর্মের প্রকৃত সত্য এবং মানবতার জয়গান ঘোষণা করেছেন এ নাটকে।

খ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবন কেন্দ্রিক :

মুক্তিযুদ্ধের প্রোথিত চেতনা উজ্জীবনে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলো হচ্ছে, *এবার ধরা দাও* (১৯৭৭), *আয়নায় বন্ধুর মুখ* (১৯৮৩), *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৪), *তোমরাই (১৯৮৮)*, *তৃতীয় পুরুষ* (১৯৮৮), *বিবিসাব* (১৯৯১), *দ্যাশের মানুষ* (১৯৯৩) ও *মেহেরজান আরেকবার* (১৯৯৮)। আবদুল্লাহ আল-মামুন যুদ্ধোত্তর কালে বাঙালির জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তিরোহিত সমাজবাস্তবতার পটভূমিতে অসহায় মানুষের ক্ষুধা-দারিদ্র্য, স্বাধীনতা বিরোধীদের ঔদ্ধত্য, মুক্তিযোদ্ধাদের অবহেলিত জীবনচিত্র *এবার ধরা দাও* ও *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে উপস্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের মূলচেতনা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ শহিদের আকাঙ্ক্ষিত ও স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি বাস্তবায়নে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, প্রগতিশীল-অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে *তোমরাই* নাটকে তিনি রঞ্জুদের উজ্জীবিত করেছেন। আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রীর জীবনে নামধারী মুক্তিযোদ্ধার উপদ্রবের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে রাজনৈতিক নেতৃত্বদানে সঙ্কটের সুযোগে নবোত্থিত স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার-আলবদরদের আস্ফালন-ঔদ্ধত্য, সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ ও বিনাশী সাংস্কৃতিক

আগ্রাসনের বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষদের মধ্যে দেশপ্রেম-প্রতিবাদ-বিদ্রোহের জাগরণে আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত *বিবিসাব* ও *মেহেরজান আরেকবার* নাটক দুটি অনন্য কীর্তি। তবে আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবন কেন্দ্রিক নাটকগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় নাটক *এবার ধরা দাও*, *এখনও ক্রীতদাস*, *তোমরাই*, *তৃতীয় পুরুষ* ও *মেহেরজান আরেকবার* প্রভৃতির বিষয়বৈচিত্র্য আলোচনা বিধৃত হলো :

এবার ধরা দাও

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এবার ধরা দাও*[৪৬] নাটকের মূল প্রতিপাদ্য মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক প্রতিবেশে নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনের ক্লেদাক্ত জীবনের চালচিত্র উপস্থাপন করা। এ নাটকে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র নেই, কেবল মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের প্রতিবেশে সমাজের সঙ্কটময় চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যার পর 'স্বাধীনতাবিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসন, রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার নামে কল-কারখানা ধ্বংস করার সরকারি উদ্যোগসহ এই সময় বাঙালির জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্নটি বিতর্কিত করা হয়। আর একটি ব্যাপার ঘটতে থাকে নীরবে– মধ্যবিত্তের প্রসার ও তাদের জীবনসঙ্কট বৃদ্ধি। নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের এই ক্রান্তিকালে আবদুল্লাহ আল-মামুন *এবার ধরা দাও* [...] নাটক লেখেন।'[৪৭]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মানুনের *এবার ধরা দাও* নাটকে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবেশে বিপন্ন মানুষের জীবনের করুণ চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। এ নাটকে ক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনসঙ্কটকে নাট্যকার রূপায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে বোরহান বুলবুলের মন্তব্য, 'আবদুল্লাহ আল-মামুন এ নাটকে দেখিয়েছেন– কর্মক্ষম যুবসমাজ কাজ না পেয়ে কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এর পশ্চাতে কিভাবে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল।'[৪৮] বস্তুত *এবার ধরা দাও* নাটকে পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার সঙ্কটে পড়ে শিক্ষিত তরুণ সামান্যতম অর্থ উপার্জনের জন্য কাজের সন্ধানে পথে পথে ঘুরতে থাকেন। কেননা, এতদিনে মা-বাবা যে পুঁজি বিনিয়োগ করে তাকে শিক্ষিত করে তুলেছেন তার প্রতিদান স্বরূপ অর্থ উপার্জনের জন্য তার একটা চাকরি দরকার। একারণে এ নাটকে তরুণ জনৈক মহিলার নিকট তার সঙ্কটের কথা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেন। তরুণের সংলাপে যুদ্ধোত্তর কালের কর্মহীন শিক্ষিত অসহায় যুব সমাজের এই চিত্র ফুটে উঠেছে :

দেখুন আপনাকে মুখ ফুটে বলতে আমার লজ্জা নেই, কাজ করার যথেষ্ট যোগ্যতা, ইচ্ছা এবং আবেগ থাকা সত্ত্বেও আমি একটা কাজের মতো কাজ পাচ্ছি না। অথচ আপনিই বলুন এই কাজের বয়সটা যদি বিফলে যায় তাহলে সেটা একটা জেনারেশনের জন্যে কতবড় ক্ষতির কারণ হতে পারে? ভাবতে পারেন আপনি?[৪৯]

মুক্তিযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক পরিবেশে নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজব্যবস্থায় একটা শ্রেণির মানুষ ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি অপকর্ম করে রাতারাতি অঢেল সম্পদের মালিক বনে যান। অন্যদিকে সামান্যতম অর্থ উপার্জনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপনের জন্য শিক্ষিত যুবসমাজ খুন, রাহাজানি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসবাদকে একমাত্র পথ হিসেবে অবলম্বন করেন। অথচ ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সাম্যের সমাজ বিনির্মাণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রোথিত ছিল। আবদুল্লাহ আল-মামুন যুদ্ধোত্তর কালে সমাজের এই অসাম্যের চিত্রকে তাঁর রচিত *এবার ধরা দাও* নাটকে বেঁছে নিলেন। একারণে 'তাঁর নাটকের মূল বিষয়-উপকরণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থাকলেও সামাজিক সমস্যামূলক বিষয়াদি নিয়েও তিনি নাটক রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।'[৫০] ফলে তাঁর *এবার ধরা দাও* নাটকে সমাজে বিরাজমান অসাম্য, দেশে বৃহৎসংখ্যক জনগোষ্ঠীর নিঃস্ব-অসহায় জীবনযাপনের চিত্র আর ধনিক শ্রেণির বিলাসিতার চিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে। এ নাটকে তরুণ যখন জীবনযাপনের জন্য সামান্য অর্থ উপার্জনে দিশেহারা, তখন বিত্তবান মহিলা তার অঢেল অর্থ-সম্পদ ব্যবহারে কোনো পথ না পেয়ে বিলাসিতা করে অর্থের অপচয় করেন। *এবার ধরা দাও* নাটকে মহিলা তার অঢেল অর্থ উড়িয়ে দেওয়ার কাজ তরুণকে দিলে তখন সেই সমাজসত্য স্পষ্ট হয়। যেমন :

আমি চাই আমার টাকা এমনভাবে উড়বে যা দেখে, যা শুনে আমার বুকে আগুন জ্বলবে। আমি দেখব আমার টাকা উড়ছে। আমি শুনব আমার টাকা উড়ছে– আমি তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করব। এ টাকা নিঃশেষ হবে যে পথে সেই পথেই তীরের মতো এগিয়ে আসবে আমার কষ্ট– আমার যন্ত্রণা। এ টাকা আপনি সেভাবেই উড়িয়ে দেবেন।[৫১]

যুদ্ধোত্তর কালে বিকাশমান নব্য পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার দরুণ একদিকে নিম্নবিত্তের করুণ জীবন, অন্যদিকে বিত্তবানদের অর্থের প্রতি সীমাহীন মোহ মানুষের বাস্তব জীবন থেকে সুখ কেড়ে নেয়। এ অর্থ-ব্যবস্থা মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে। টাকার পেছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ সংসার-দাম্পত্য গৃহ ছেড়ে পথে নামেন। এ নাটকে মফস্বল শহরে নির্মল প্রকৃতি, স্বামীসঙ্গ সবকিছু ছেড়ে জনৈক মহিলা শুধু অর্থের জন্য একদিন জীবনকে করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেন। পুঁজিবাদী অর্থের মোহে জীবনকে নিঃসঙ্গ করে তোলেন। নাট্যকার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ট মানবজীবনের এই সঙ্কটকে *এবার ধরা*

দাও নাটকে সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। জীবনের এই সংকট জনৈক মহিলা ও তরুণের সংলাপে ঘনীভূত হয়েছে :

মহিলা : ঐ যে মফস্বল শহরের কথা বললাম। সে সময় আমার একজন সঙ্গী ছিল। আমার আগে মফস্বল শহরের বিষণ্ন আকাশ দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।

তরুণ : হারিয়ে ফেলেছেন?

মহিলা : যেদিন থেকে টাকা আমার সঙ্গী হলো সেদিন থেকে সে হারিয়ে গেল।[৫২]

এ নাটকে একদিকে একজন বাবা তার ন্যূনতম জীবন যাপনের জন্য সামান্য অর্থের লোভে ছেলের ভালো-মন্দ বিচার না করে চাকরিতে যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, অন্যদিকে পুঁজিপতি মহিলা তার অঢেল অর্থের বিনিময়ে একমাত্র ভাই রাজুকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান। বস্তুত বাবার আকাঙ্ক্ষা এবং মহিলার আদর্শ নাট্যক্রিয়ায় নিম্ন-বিত্তের সঙ্গে পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব সাংঘর্ষিক করে তুলেছে। ফলে '*এবার ধরা দাও* নাটকে মানবিকতার চরম লাঞ্ছনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে এ দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষজন চরমভাবে অপমানিত-লাঞ্ছিত অবমূল্যায়িত হয়েছে।'[৫৩] একারণে দৈন্যের দায়ে বাবা তার একমাত্র মেয়েকে অর্থের বিনিময়ে দালালের হাতে তুলে দেয়ার বন্দোবস্ত করতে সংকুচিত হননি। মূলত বাবার চেতনাগত অবক্ষয় সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবনের গভীর হৃদয়-সংবেদ হতে উৎসারিত হয়েছে। বাবার সংলাপে এই সমাজিক অবক্ষয় প্রণিধানযোগ্য। যেমন :

> যার বাড়ি ভাড়া দেবার মুরোদ নেই, বুড়ো বয়সে যে শান্তিমতো দু'মুঠো খেতে পায় না। যার ছেলে কাজ পেয়ে ঘরে টাকা আনতে পারে না, মেয়ের দালালকে ঘরে ডেকে আনা ছাড়া তার উপায় কী?[৫৪]

জন্মদাতা পিতা হয়ে মেয়েকে অর্থের বিনিময়ে দালালের হাতে তুলে দেওয়ার মতো এই পৈশাচিকতার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজবাস্তবতার নির্মমতা প্রস্ফূটনে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ 'মামুনের নাটকের প্রধান প্রবণতা সমাজবাস্তবতা বিশ্লেষণ। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজের নানা টানাপোড়েন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আশা, হতাশা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রভৃতি তিনি নাট্যকাহিনির উপজীব্য হিসেবে বেছে নেন।'[৫৫] আর মানুষের হৃদয়ের শূন্যতাকে তিনি চিত্রিত করেন সমাজসত্যের নিরিখে। মানুষ কতটা নিঃস্ব সহায়-সম্বলহীন হলে এমন নীচু হতে পারে তা মেয়ের সংলাপে স্পষ্ট হয়েছে। যথা :

ভাইয়া জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে এই আশায় যদি কাজ করেও বেতন না নেয়, তাহলে তুমিই বা কেন একটি 'মেয়ের' বাপ হয়ে প্রতিষ্ঠা হারাবে? বিশেষ করে যখন মেয়ের এতো দাম, একসাথে জীবনের অনেক পাওনা মিটে যায় তখন তুমি কেন হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।[৫৬]

বাবার এই নির্মম পৈচাশিকতা থেকে অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে অর্থের জন্য নিম্ন-বিত্ত তরুণ চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। তরুণের অসহায় জীবনে দ্বিতীয় পথচারী অর্থ দিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে একদিকে তরুণ তার বাবার দারিদ্র্য বিমোচন করবেন, না অন্যদিকে বোনের সম্ভ্রম রক্ষা করবেন– এই কঠিন সমস্যা অসহায় তরুণকে সমাজজীবনের গভীর সঙ্কটে ফেলেন। একারণে তরুণের আকুতি :

একদিকে নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা অন্যদিকে নিশ্চিত ধ্বংস। আমি ভালো থাকতে চাই। আপনারা আমাকে বাঁচান।[৫৭]

তরুণের আর্তকণ্ঠের এই মিনতি সমকালীন সমাজ-বাস্তবতায় অসহায়-দারিদ্র্য, নিম্ন-বিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি। কেননা সমকালে যুদ্ধোত্তর ধ্বংস্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে এই অসহায় মানুষ যখন কেবল দুবেলা খেয়ে-পড়ে মাথা গোজার ঠাঁই খুঁজছিল, তখন নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনকে অসহায় করে তুলেছিল। আবদুল্লাহ আল-মামুন অসহায় নিম্ন-বিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনের এই করুণ দশা জীবনের গভীরতায় অনুভব করেছিলেন। তবে '*এবার ধরা দাও* নাটকে স্বাধীনতা-উত্তরকালে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র উপস্থাপন করা নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য নয়। তিনি বরং একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক সংকটকে উপজীব্য করে পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষয়ে যাওয়া অভ্যন্তরীণ সঙ্কট ও বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।'[৫৮] বস্তুত *এবার ধরা দাও* নাটকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সমাজের ক্ষয়িষ্ণু সঙ্কট, মূল্যবোধ ও অসহায় মানুষের জীবনসঙ্কট প্রধান বিষয় হিসেবে উপজীব্য হয়েছে।

এখনও ক্রীতদাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী গোষ্ঠীর উদ্ধত উত্থানজনিত নিপীড়ন-নিষ্পেষণে জর্জরিত প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অবহেলিত জীবনের করুণ চালচিত্র নিয়ে *এখনও ক্রীতদাস*[৫৯] নাটক। এ নাটকে যুদ্ধের কোনো চিত্র, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ কিংবা রাজাকার বাহিনীর বর্বরতার কোনো দৃশ্য নেই তবে আবদুল্লাহ আল-মামুন এ নাটকে অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনচিত্র

চিত্রণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের উত্থানে অবক্ষয়িত সমাজের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় উজ্জীবিত করার বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। গবেষক অনুপম হাসান এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তাঁর নাটকে মুক্তিযুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে তিনি কোনো নাটকেই মুক্তিযুদ্ধকে সরাসরি উপস্থাপন করেননি। মামুন নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখেন মুক্তিযুদ্ধের শাণিত চেতনা এবং তা সমকালীন বাস্তবতার নিরিখে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করেন।'[৬০]

আবদুল্লাহ আল-মামুন *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে স্বাধীনতা উত্তর ভঙ্গুর অর্থনীতির কষাঘাতে জর্জরিত বস্তিবাসী পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার দারিদ্র্য ক্লিষ্ট জীবনকে কেন্দ্র করে অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। বাক্কা মিয়া সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করেননি, কিন্তু দেশে যুদ্ধ শুরু হলে ট্রাক চালক বাক্কা মিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে উত্তরের জেলা দিনাজপুর সীমান্তের ওপারে যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য রওনা দেন। পথিমধ্যে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে দুটি পা হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন। 'স্বাধীন বাংলাদেশে বাক্কা মিয়ার মতো মুক্তিযুদ্ধের ক্ষত নিয়ে এখনো অনেকেই বেঁচে আছেন। বাক্কা মিয়ারা মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছিল। এই বিবেচনায় এরাও এক অর্থে মুক্তিযোদ্ধা।'[৬১] অথচ দেশ স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের সঙ্কটজনিত কারণে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত অর্থে মূল্যায়ন হয়নি। তাই স্ত্রী-কন্যা অর্থ উপার্জনের তাগিদে ঘরের বাহিরে যান আর ক্ষুধার তাড়নায় একজন যুদ্ধাহত পঙ্গু বাক্কা মিয়া ছটফট করেন। বাক্কা মিয়ার সংলাপে একজন আহত মুক্তিযোদ্ধার জীবনে দারিদ্র্যের কষাঘাত চিত্রিত হয়েছে :

আমার ক্ষিদা লাগছে... খাওন দে...[৬২]

বাক্কা মিয়ার এই অবহেলিত জীবন ও ক্ষুধার জ্বালা একদিকে যেমন যুদ্ধোত্তর সমাজের অসহায় মানুষের করুণ জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে, তেমনি অন্যদিকে বস্তিবাসীর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী লুটেরা-লুম্পেন ধনিক শ্রেণি ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির উত্থান *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের বিষয়কে শাণিত করেছে।

দীর্ঘ নয় মাসের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বাক্কা মিয়াদের পা কিংবা প্রাণের বিনিময়ে এদেশ ভৌগোলিক স্বাধীনতা লাভ করলেও মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাননি। কারণ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রগতিশীল অংশ ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে আত্মস্মৃতির ভেতর দিয়ে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীনতালাভের পর তা অক্ষুণ্ন থাকেনি। প্রথমত, যুদ্ধ-বিপর্যস্ত বাংলাদেশের সামগ্রিক বিশৃঙ্খল; দ্বিতীয় আদর্শবাদের জোয়ার

সরে যেতেই বিস্তৃত স্বার্থবুদ্ধির উৎকট প্রকাশ; তৃতীয়ত লক্ষ অর্জিত হবার পর বিভিন্ন সমবায়ী দলের প্রতি ক্ষমতাসীন দলের অবিশ্বাস এবং নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।'[৬৩] এ সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধীরা ও নব্য ধনিক শ্রেণি অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অঢেল বিত্ত-বৈভব ও সম্পদের মালিকানা অর্জন করেন। আর গলাচিপা বস্তিবাসী বাক্কা মিয়া কিংবা তহুরনদের যুবতী কন্যারা ক্ষুধার তাগিদে স্বাধীনতা বিরোধী নব্য ধনিক শ্রেণির শোষণ-বঞ্চনা শুধু সহ্য করেননি, নিজের দেহটাকেও ওদের ভোগ-বিলাসের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে তুলে দিয়েছেন। 'বেশরিয়তি' জেনেও এসব কাজ ক্ষুধার জ্বালায় এক সময় বস্তিবাসী মানুষের কাছে সহনীয় (শরিয়তি) মনে হয়। গলাচিপা বস্তির তহুরনের ডিউটি সম্পর্কে তার মা জানতে চাইলে দাদা কুঁজোবুড়োর ইঙ্গিতময় সংলাপে যুদ্ধোত্তর এমন নির্মম সমাজসত্য উদ্ভাসিত হয়েছে :

> বস্তির মাইয়াগো বেশরিয়তি কাম করতে দ্যাখলে খুন চইরা যাইতো চান্দিতে। কইলজায় আগুন লাগত। কেরমে কেরমে হেই আগুন কইলজা থিকা প্যাটে নামল। প্যাটের আগুনে শরা শরিয়ত ব্যাবাক জ্বইলা পুইরা সাফ হইয়া গেলো।[৬৪]

একদিকে বস্তিবাসী মানুষ জীবন-জীবিকার তাগিদের নিজের দেহ বিলিয়ে দেন, অন্যদিকে স্বাধীনতা বিরোধী ও নব্য ধনিকশ্রেণির শোষণ-নির্যাতনে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ারা অনাহারে-অর্ধাহারে, বিনে-চিকিৎসায় রেললাইনের ধারে মানবেতর জীবনযাপন করেন। দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বাক্কা মিয়া একদিন মুক্তিবাহিনীকে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো ট্রাক চালিয়ে উত্তরের সীমান্তের ওপারে ছুটে চলেছেন, অথচ দেশ স্বাধীন হলে তার সেই আকাঙ্ক্ষা স্ফুলিঙ্গের মতো স্তমিত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি স্বাধীন দেশে সাধারণ নাগরিকের মর্যাদা প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। তাই স্ত্রী-কন্যার গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে বাক্কা মিয়ার আত্মদহন নাট্যবিষয়কে করুণ করে তুলেছে। বস্তুত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার জীবনে সমাজ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের এই অবহেলা '৭১-এর বীরযোদ্ধাদের প্রতি অবহেলার চালচিত্রকে উন্মোচিত করেছে। এ নাটকে বাক্কা মিয়ার ক্ষোভ স্বপ্রতারিত সংলাপের মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবহেলার এমন চিত্র পাওয়া যায় :

> আসল মুক্তিবাহিনী? অই শালা বেক্কল, আমি যদি আসল মুক্তিবাহিনী হই তাইলে দ্যাশে জাগা পাই না ক্যান? ঘর নাই ক্যান? বাড়ি নাই ক্যান? বাপদাদার ভিটা গ্যালো কই? একখান ঠ্যাং লইয়া গলাচিপা বস্তির মইদ্যে ঘাউয়া কুত্তার মতন কাইমাই করতাছি।[৬৫]

মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ারা জীবিকার তাগিদে অবজ্ঞা-অবহেলায় সমাজের আস্তাকুঁড়ে হয়ে বস্তির এক কোণে বসবাস করলেও স্বাধীনতা বিরোধী কাজী আবদুল মালেকরা সমাজের বস্তি থেকে 'ভদ্রপল্লি'

পর্যন্ত সর্বত্র তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছেন। অর্থ-বিত্ত, যশ-খ্যাতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ভোগ-বিলাস, নারীর সম্ভ্রমহানি সর্বক্ষেত্রে তাদের একচ্ছত্র রাজত্ব। কাজী আবদুল মালেকের মতো দেশবিরোধীরা গলাচিপা বস্তিবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তহুরন-মর্জিনাদের কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে রাতের আঁধারে ঘরছাড়া করেন। তারপর তাদের বিদেশে পাচার করে দেন কিংবা মর্জিনার মতো সরলমনা দরিদ্র মেয়েদের ড্যান্স পার্টিতে কাজের লোভ দেখিয়ে সমগ্র রাতভর সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে আবর্জনার মতো গলাচিপা বস্তিতে ছুঁড়ে মারেন। আলবদর কাজী আবদুল মালেকদের দৌরাত্ম্যে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশে মানুষ মুক্তভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখলেও পাননি তাদের মৌলিক স্বাধীনতা। কাজীর মতো দেশবিরোধীরা স্বাধীন দেশের মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মানুষকে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করেন। *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার মেয়ে মর্জিনাকে কাজের কথা বলে রাতে ডেকে নিয়ে রাজাকার কাজী আবদুল মালেকের দ্বারা সম্ভ্রম লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে এ নাটকের বিষয় আরো বিষাদগ্রস্ত হয়েছে। মর্জিনার সংলাপে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষদের ওপর স্বাধীনতা বিরোধীদের এমন আধিপত্যের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে এভাবে :

> বাবাগো, অরা আমারে নষ্ট কইরা দিছে। আমি পইচ্যা গেছি। আমি বেহুশ হইয়া গেছিলাম। অরা আমারে- [...] বাবাগো হারাডা রাইত অরা আমারে- ...আমি এত চিক্কুর দিলাম, বাবাগো, কেউ হুনলো না–[৬৬]

যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতা বিরোধী দুর্নীতিবাজ, লুঠেরা-লুণ্ঠনকারীরা এই সমাজে এমন এক শৃঙ্খল রচনা করে, যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাক্কা মিয়া-কান্দুনি-মর্জিনারা ঝলমলে আলোর নিচে অন্ধকার বস্তিতে অসহায় জীবন-যাপন করেন। একটু পেটপুরে খাওয়ার জন্য কান্দুনি কাজের সুযোগে বাড়িওয়ালার খাবার চুরি করেন। আবার প্রচণ্ড আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বাক্কা মিয়া ভিক্ষা করতে সম্মত না হলেও একটু খাবার কিনে খাওয়ার জন্য স্ত্রীর জমানো টাকাগুলো ঘরের খুঁটি কেটে চুরি করেন। বাক্কা মিয়ার অর্থ চুরির এই ঘটনা যুদ্ধোত্তরকালে নব্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ডামাডোলে নিষ্পেষিত অসহায়–দারিদ্র্য আর পারিবারিক ভাঙনের চিত্র উন্মোচিত করেছে। কান্দুনি ও বাক্কা মিয়ার সংলাপ এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> বাক্কা : হ হ লইছি– লইছি আমি তর টেকা। হইছে কি? হইছে কি? টেকার লিগা তুই সোয়ামীরে– সোয়ামী বর না টেকা বর?
>
> কান্দুনি : টেকা টেকা। আমার কাছে টেকাই বর?
>
> বাক্কা : কি? কি কইলি? সোয়ামীর থিকা টেকা বর? যাঃ শালা– তরে আমি তালাক দিলাম।[৬৭]

অর্থের টানাপড়েনে পড়েই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট বাক্কা মিয়ার দাম্পত্য জীবনে ভাঙন ধরে। একদিকে অর্থনৈতিক একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দের আশায় কর্মক্ষম হারেস আলীর সঙ্গে কান্দুনির সম্পর্ক, অন্যদিকে স্ত্রী কান্দুনির প্রতি সন্দেহ ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বাক্কা মিয়া স্ত্রীকে তালাক দেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নজনিত-হতাশা থেকে সঞ্চারিত ক্ষোভ ও স্ত্রী-কন্যা সংসার সবকিছু হারানো একজন নিঃস্ব পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার জীবনের মর্মান্তিক দৃশ্য অঙ্কনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের বিষয় হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। নাট্য কাহিনির শুরুতে মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়া যে দারিদ্র্য-পীড়ন-ক্ষুধার জ্বালা বুকে নিয়ে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন– পরিশেষেও তাকে সেই যন্ত্রণা নিয়ে রাজাকার কাজী আবদুল মালেকের ভাড়াটে চেলার গুলিতে জীবনদান করতে হয়েছে। বাক্কা মিয়ার জীবনের এই করুণ পরিণতি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও স্বাধীনতা বিরোধী নব্য ধনিকশ্রেণির উত্থানজনিত প্রভাবে সংঘটিত হয়েছে। বস্তুত নাট্যকার স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের দারিদ্র্য-দৈন্যজনিত কারণে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার অসহায় জীবনচিত্র এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অবমূল্যায়নের চিত্রকে *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের মুখ্য বিষয়রূপে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ নাটকের শেষ দৃশ্যে গুলিবিদ্ধ বাক্কা মিয়ার চিৎকারে '৭১-এর বীরযোদ্ধাদের অবহেলিত জীবনচিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে :

> বারে বারে কি আমিই গুল্লি খামুরে? একবার ঠ্যাং-এ, একবার সিনায়? একবার মারবো খানেরা, একবার মারবি তরা? এই খেইল কবে ফুরাইবো? কবে?
>
> [...]
>
> চা দে– টোস বিস্কুট দে– আমি চায়ের মইদ্যে চুবাইয়া চুবাইয়া খামু–[৬৮]

বস্তুত বাক্কা মিয়াদের আত্মত্যাগের ফলে দেশ স্বাধীন হলেও বাক্কা মিয়ারা এর সুফল পাননি। কারণ, 'মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতি যে স্বপ্ন লালন করেছিল, মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সে স্বপ্নে দেখা দেয় নতুন সঙ্কট। অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন উত্তরকালে ক্রমশ ম্লান হতে থাকে। পরাধীনতার এক শেকল ভাঙার পর জনগণ লক্ষ্য করে তারা অন্য এক শেকলে ক্রমশ বাঁধা পড়ে যাচ্ছে।'[৬৯] এই শেকল হচ্ছে স্বাধীনতা বিরোধীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার। এর ফলে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে নব্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ট

একজন অবহেলিত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার সহায় সম্বলহীন-দারিদ্র্য-পীড়িত, করুণ-ক্লেদাক্ত জীবনযাত্রাকে মূল বিষয় হিসেবে উপজীব্য করেছেন।

তোমরাই

মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে নব-জাগরিত স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির অশুভ ষড়যন্ত্রে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের বিপদগামী তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবনে আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই*[৭০] নাটক এক অনন্য সৃষ্টি। এ নাটকে যুদ্ধের দিনগুলোর উত্তাপ যুদ্ধোত্তর কালেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির মধ্যে বিরাজমান। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানপন্থি যে অপশক্তি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছে, দেশ স্বাধীনের পর তারাই রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে ক্ষমতাবানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের আধিপত্য বিরাজ করেছেন। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষ নিগৃহীত-বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেছেন। 'এ নাটকটিতে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন-মুক্তিযুদ্ধোত্তর তরুণ প্রজন্ম কিভাবে স্বাধীনতা বিরোধী অশুভ শক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে, বিপথগামী হচ্ছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। নাট্যকার একই সঙ্গে স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের উত্থান, প্রতিষ্ঠা এবং এদের কূট কৌশলে নতুন প্রজন্মের মন থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অবলুপ্তির হীন প্রচেষ্টা বেশ চমৎকার ভাবেই তুলে ধরেছেন।'[৭১]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতা বিরোধী পরাজিত শত্রুরা অর্থনৈতিক সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে এক অদৃশ্য শক্তির ইশারায় আমাদের তরুণ প্রজন্মকে 'ব্রেন ওয়াশ' করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে তোলেন। ফলে এ নাটকের যুবক রঞ্জুরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি-নৈতিকতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে শুধু অর্থ উপার্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মুক্তিযুদ্ধকে আপাত অর্থহীন মেনে নিয়ে হাইজ্যাক, রাহাজানি, দখলদারি, বোমাবাজি, গুম-খুন ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত হন। রঞ্জুদের দৌরাত্ম্যে প্রকারান্তরে রাজাকার-আলবদরদের ষড়যন্ত্রে যুদ্ধোত্তর সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অবিশ্বাস ও অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সঙ্কট সৃষ্টি হলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সুবচন নির্বাসনে*, *এবার ধরা দাও*, *এখনও ক্রীতদাস* প্রভৃতি নাটকেও যুদ্ধোত্তর সমাজের এই সঙ্কটের চিত্র পাওয়া গেলেও *তোমরাই* নাটকে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান রঞ্জুর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে অবিশ্বাস তা বাঙালির জাতীয় জীবনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তবে রঞ্জুরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে স্বল্প সময়ের জন্য সমাজজীবনকে দুর্বিষহ করে তুললেও মুক্তিযুদ্ধের শাণিত চেতনায় তাদের ফিরে আসতেই হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই* নাটকটি প্রযোজনাকালে 'থিয়েটার' স্মরণিকায় প্রকাশিত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

সুকৌশলে নানান ছলে যারা আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে কদর্য করছে তাদের চিহ্নিত করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি অত্যাবশ্যক ভবিষ্যৎ বংশধরদের শোণিতে গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সদা প্রবহমান রাখা। একথা ভুলে গেলে চলবে না, রঞ্জুরা আমাদেরই সন্তান। একজন রঞ্জু একজন মুক্তিযোদ্ধারই উত্তরসূরি, রাজাকার, আল-বদরের নয়।[৭২]

আবদুল্লাহ আল-মামুন *তোমরাই* নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানপ্রেমি রাজাকারদের ঔদ্ধত্য ও দৌরাত্ম্য দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এ নাটকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শত্রু হায়দার আলী স্বাধীনতা উত্তরকালেও এদেশে বসবাস করে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র করেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সুযোগে স্বাধীনতাকে অর্থহীন করতে এদেশের রঞ্জুদের মতো কর্ম-উদ্যমী যুব-সমাজের একাংশকে দাবার গুটির মতো ব্যবহার করে দেশবিরোধী অপকর্ম চালান। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করতে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার অপকর্মের জন্য তিনি সামান্যতম অনুতপ্ত নন, বরং যুদ্ধকালের ঘাতক দালালদের নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার খবর শুনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ঘাতক দালালদের প্রতিনিধি হায়দার আলীর সংলাপে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এই কটাক্ষ প্রণিধানযোগ্য :

বাজারে কি বেরিয়েছে? একখানা বই? কি নাম? একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়? বাঃ চমৎকার নাম। সেখানে আমার নামও আছে? বাঃ বাঃ বড়ই দুর্লভ সম্মান। না না লজ্জা হবে কেন? ইতিহাসে আমার নাম থাকছে? এ কি কম কথা?[৭৩]

নাট্যকার *তোমরাই* নাটকে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা এবং আকাঙ্ক্ষাজনিত হতাশার কথা চিত্রিত করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জী, মা, আকবর প্রত্যেকেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার জন্য জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছেন। অথচ স্বাধীনতা উত্তরকালে তারা রাষ্ট্র কিংবা সমাজ থেকে কাঙ্ক্ষিত মূল্যায়ন পাননি। হায়দার আলীর মতো রাজাকারেরা সমাজ, রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করলেও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা দুঃখ-কষ্টকে নিত্যসঙ্গী করে অবহেলিত জীবনযাপন করছেন। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে মুক্তিযোদ্ধাদের একদিকে অবহেলিত জীবন যাপন, অন্যদিকে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রভাব-আধিপত্য মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। ননীদার নিকট কান্তা অর্থাৎ মা-এর আবেগজড়িত সংলাপে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাজনিত হতাশার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় :

স্বাধীন দেশে আছ কেমন ননীদা? নিজের পাওনা বুঝে পেয়েছ? আমার দিকে তাকাও। স্বাধীন দেশ আমাকে আমার পাওনা পাই পাই বুঝিয়ে দিয়েছে। পুরো তিনটে মাস স্বামীকে ক্যান্টনমেন্টে আটকে

রেখে পাগল বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ঘর জ্বালিয়েছে। ছেলে মেয়ে নিয়ে আমি পাগলের মত এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়িয়েছি। দেশ তো স্বাধীন হয়েছে সেই কবে ননীদা। আমাদের কমিটমেন্ট কি আমরা রাখতে পেরেছি? আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা কি স্বাধীনতার মানে বোঝাতে পেরেছি?[৭৪]

অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা আর মূল্যের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হলেও রাষ্ট্র যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন করতে পারেনি, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আগলে রাখতে পারেনি। এ কারণে হায়দার আলীর মতো স্বাধীনতা বিরোধী নরপিশাচরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান রঞ্জুর মতো শিক্ষিত বেকার যুবকদের হতাশা আর ক্ষোভকে পুঁজি করে বিপদগামী করেছে। কারণ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিধাবিভক্ত জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বাংলাদেশ বিরোধী আন্তর্জাতিক মহলের চক্রান্ত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পাকিস্তানপন্থি স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থান সহজ করে তোলে। এই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ক্রমে একদিকে মুক্তিযুদ্ধের লেবাস পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবানদের সঙ্গে হাত মেলান, অন্যদিকে তরুণদের বেকারত্বকে পুঁজি করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে যান। ফলে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি স্বাধীনতা বিরোধীরাও দিনেদিনে তরুণ প্রজন্মের নিকট স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে তুলেছে। এ নাটকে হায়দার আলীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ সংলাপে স্বাধীনতা উত্তরকালের এই রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্কটের সুযোগে তরুণ প্রজন্মের বিপদগামিতা স্পষ্ট হয়ে উঠে :

স্বাধীনতার পর যারাই ক্ষমতায় এসেছে তারাই একটার পর একটা ভুল করেছে। সবার অলক্ষ্যে সেই ফাঁকটা আরো বেড়েছে। আর আমরা তো বরাবর তাকে তাকেই ছিলাম। ক্রমশ ঐ ফাঁকে আমরা আমাদের জায়গা করে নিয়েছি। একাত্তরের অপমানের প্রতিশোধ তো নিতে হবে মোবারক আলী। এবার তাই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাই। রঞ্জুদের জেনারেশনটার কাছে এই স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে তুলতেই হবে। এই লাইনে সাকসেসও আসতে শুরু করছে। ওদের কাছে স্বাধীনতার কোনো মানে নেই। রঞ্জুরা স্বাধীনতার গপ্পোটা পর্যন্ত শুনতে চায় না।[৭৫]

রাজাকার হায়দার আলীরা যুদ্ধোত্তর কালে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে লেলিয়ে দেন। *তোমরাই* নাটকে মুক্তিযোদ্ধা কান্তা ও কবিরের ছেলে রঞ্জু দাবার গুটির মতো হায়দার আলীর নির্দেশে 'এনিমি প্রোপার্টি'তে গড়ে ওঠা আরেক মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জীর গার্মেন্টস কাপড়ের দোকান উচ্ছেদ করতে গেলে মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জী শক্ত হাতে প্রতিহত করতে অগ্রসর হন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-স্নাত শোষণহীন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র

পুনর্গঠনের নিমিত্তে পথভ্রষ্ট রঞ্জুদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পুনর্জাগ্রত করতে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছেন। ননী ব্যানার্জী আপাত রঞ্জুর প্রতিরোধে থমকে দাঁড়ালেও মুক্তিযুদ্ধের ধারালো চেতনা জাগানিয়া ভাষণে হায়দার আলীদের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে রঞ্জুদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে রঞ্জুর প্রতি ননী ব্যানার্জীর সংলাপ প্রণিধানযোগ্য :

> তুমি কবিরের ছেলে, কান্তার ছেলে। কে এই কবির? কে এই কান্তা? এরা হচ্ছে সেই কবির, সেই কান্তা যারা এই অভাগা দেশটার জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছে সারাটা জীবন। [...] জানো তোমার বাবা মা-র উপর কত অত্যাচার হয়েছে? হাজতে আর জেলখানায় কেটেছে কত মাস? কত বছর? একটাবারও কি তোমার মনে প্রশ্ন জাগে না, কেন তোমার বাবা আজ অসুস্থ? কেন তোমার মা আজ এত নীরব? [...] স্বাধীনতা সংগ্রাম তোমাদের পুরো পরিবারটাকে ধ্বসিয়ে দিয়ে গেছে। সেই পরিবারেরই ছেলে তুমি।[৭৬]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই* নাটকে মুক্তিযুদ্ধের জাগ্রত চেতনা আগামী প্রজন্মের নিকট সঞ্চারিত করে যুদ্ধোত্তর কালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জয় নিশ্চিত করতে অতিনাটকীয় হলেও মা (কান্তা) ও ননী ব্যানার্জীর মধ্য দিয়ে আরেকটা চেতনাজাত লড়াইয়ের জন্য রঞ্জুদের তৈরি করেন। তারা দুজনে যেমন রঞ্জুদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেছেন, তেমনি তাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ফেরাতে তাদের নিকট '৭১-এর বাস্তবানুগ ইতিহাস, হায়দার আলীদের অপকর্ম তুলে ধরেছেন। রঞ্জুদের স্বাধীনতার চেতনায় ফেরাতে এবং পাকিস্তানিদের দোসর রাজাকার হায়দার আলীদের এদেশের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন। *তোমরাই* নাটকে রঞ্জুর মা ও ননী ব্যানার্জীর সংলাপে রঞ্জুদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার এই অগ্নিমন্ত্র উদ্‌গিরিত হয়েছে :

> মা : ননীদা, সাতচল্লিশ, বাহান্না, উনসত্তর, একাত্তর। তারপরও আমাদের ছেলেদের পালিয়ে বেড়াতে হয়? কেন?
>
> ননী : ওটা আমাদেরই ব্যর্থতা। আমরা ওদের অবহেলা করছি। আমাদের কোনো ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ওরা পায়নি। ওরা তাই দিশেহারা, দিকভ্রান্ত। আর এই সুযোগটাই লুফে নিয়েছে হায়দার আলীরা। হায়দার আলীদের এদেশের মাটি থেকে উৎখাত করতেই হবে। একমাত্র পথ। অন্য কোনো বিকল্প নেই।[৭৭]

ফলে রঞ্জুরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বাস্তব পটভূমিতে ফিরে এসেছেন। একারণে মুক্তিযুদ্ধের শাণিত চেতনায় ঋদ্ধ রঞ্জু তার সত্তাকে বুঝতে পেরে একজন হায়দার আলীর নিকট মুক্তিযুদ্ধকালের সব অপকর্মের জবাব চান। তখন মা, বাবা, ননী ব্যানার্জী, বাবলু, টোকন সবাই হায়দার আলীকে ঘিরে

ফেলেন। হায়দার আলী পরাজয়ের গ্লানিজনিত অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে মায়ের গালে থাপ্পড় দিলে সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জু গুলি করে একাত্তরের শত্রুকে নিস্তব্ধ করে দেন। মুক্তিযুদ্ধের নবজাগরিত চেতনার নিকট একাত্তরের পুনর্জাগরিত শত্রু এই হায়দার আলীদের এ পরাজয়কে স্বাগত জানিয়েছেন মা। তিনি উচ্চাশা পোষণ করেছেন যে, মুক্তিযোদ্ধাদের শাণিত চেতনা আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারলে পাকিস্তানের দোসররা একদিন স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হবেই। এ প্রসঙ্গে মায়ের সংলাপ প্রণিধানযোগ্য :

> রঞ্জুরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। এই ফাঁকটা লুটে নিচ্ছে। স্বাধীনতার শত্রুরা, অদৃশ্য শক্তি যাদেরকে পুনর্বাসিত করছে একের পর এক। এই নতুন চক্রান্তকে অঙ্কুরেই বিনাশ করুন। আকবরের হাতে ছিল যে স্বাধীনতার পতাকা, আসুন আমরা আজ সেই পতাকা তুলে দিই রঞ্জুদের হাতে।[৭৮]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই* নাটকে মা এবং ননী ব্যানার্জীর রোপিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বীজ স্বাধীনতার পর প্রায় অর্ধশত বছর ধরে বৃক্ষ থেকে শাখায় বিস্তার করেছেন। ততোদিনে স্বাধীনতার শত্রুরা আমাদের প্রচলিত রাজনীতির ব্যর্থতার সুযোগে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব নিয়ে জাতীয় পতাকাকে কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন, কিন্তু ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শাহবাগের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-স্নাত তরুণ প্রজন্মের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি দোসরদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে। বস্তুত 'স্বাধীনতার অব্যবহিত পর মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধানজনিত কারণে সৃষ্ট হতাশা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবক্ষয়, স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির উত্থানজনিত কারণে স্বপক্ষ শক্তির মনের অন্তর্বেদনা, ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের দাবি, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের অসহায়তা, নির্যাতিত নারীদের যন্ত্রণা প্রভৃতি বিষয় তাঁর নাটকে উঠে এসেছে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে।'[৭৯] মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে গণতান্ত্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, তরুণ প্রজন্মের নিকট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার উজ্জীবনে নাট্যকার *তোমরাই* নাটকে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

তৃতীয় পুরুষ

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অন্যান্য নাটকের মতো আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তৃতীয় পুরুষ*[৮০] নাটকে 'মুক্তিযুদ্ধে স্বামীহারা নারীদের যাপিত জীবনের যন্ত্রণা, সামাজিক অবহেলা, তাদের নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্ত'[৮১] প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। মুক্তিযুদ্ধোত্তর দশকে স্বাধীনতা অর্জন মানুষের মনে স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে উদ্ভাসিত হলেও স্বাধীনতালাভের পরপরই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির মতো মুক্তিযুদ্ধের সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মহলের হীন তৎপরতায় স্বাধীনতার স্বাদ ব্যক্তি জীবনে

ম্লান হয়ে আসে। একারণে যুদ্ধের বেদনাময় আঘাত, ক্ষয়ক্ষতি, যন্ত্রণা, যুদ্ধে পরম আত্মীয়কে হারানোর অন্তর্দাহ *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে লায়লার ব্যক্তিজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুন এ নাটকে মুক্তিযুদ্ধে স্বামী হারানো লায়লার ব্যক্তি জীবনকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা উত্তরকালের স্বাধীনতার সুবিধাভোগীদের নির্মমতায় নিষ্পেষিত সমাজচিত্রকে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যজন রামেন্দু মজুমদারের মন্তব্য :

> *তৃতীয় পুরুষ* নাটকের প্রেক্ষাপটও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল মহল কর্তৃক সৃষ্ট নানা প্রকার বিভ্রান্তি ও দুরভিসন্ধিকে ঘিরে আবর্তিত। এই নাটকে লেখক অত্যন্ত দরদী লেখনীতে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া চিত্রিত করেছেন।[৮২]

তৃতীয় পুরুষ নাটকের কেন্দ্রাতিক বিষয় মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাতে স্বামী হারানো লায়লার অসহায় জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। লায়লা তার স্বজন হারানোর দুঃসহ বেদনাময় জীবনের অভিজ্ঞতা ভুলে থাকতে চাইলেও, অন্যদিকে মুখোশধারী মুক্তিযোদ্ধা জাফরের নানা ষড়যন্ত্রে লায়লার যাপিত জীবনের স্বাদ বারবার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। কারণ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরপরই পরাজিত হানাদার বাহিনীর দোসর ও স্বাধীনতার সুবিধাভোগীরা স্বাধীন দেশে নতুন করে চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি রচনা করেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে এই স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপকর্মের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। কারণ স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের শহিদ অধ্যাপক জাফরদের নিয়ে স্বাধীনতার সুবিধাভোগীরা চেতনার ব্যবসায় মেতে উঠেছেন। তারা মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণে সভা-সেমিনার-আলোচনা, শহিদদের স্মৃতি রক্ষায় পাঠাগার স্থাপন প্রভৃতির নাম করে সরকার থেকে অর্থ খালাস, 'এনিমি প্রোপার্টি' দখল করে নিজেদের নামে দলিল করে অল্পদিনের মধ্যে অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে যান। তারপর এক সময় শহিদদের নামও ভুলতে বসেন। *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে লায়লার সংলাপে মুক্তিযুদ্ধের সুবিধাভোগী এই স্বার্থান্বেষী মহলের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। যেমন :

> শহিদ অধ্যাপকের স্ত্রীকে বসায় উঁচু মঞ্চে। যন্ত্রচালিত মানুষের মত আমি বসি ঐ মঞ্চে, ঠিক মাঝখানের চেয়ারটিতে। শুরু হয় জাফরের গুণ কীর্তন। বক্তাদের আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে একে একে উন্মোচিত হয় আমার স্বামীর চরিত্রের অজানা অচেনা দিক। আমি অবাক হয়ে শুনি আর ভাবি, এ কোন জাফরের কথা বলছে এরা? [...] বন্ধ কর...বন্ধ কর ঐ হাত তালি। মিথ্যেবাদী, প্রবঞ্চকের দল। দেখাও আমাকে, এদেশের স্বাধীনতার কোন ইতিহাসে আমার স্বামীর নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে?[৮৩]

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শাণিত চেতনায় উদ্ভাসিত শহিদ জাফরের স্ত্রী লায়লা মুক্তিযুদ্ধের সুবিধাভোগীদের অপকর্মকে ঘৃণা করেন। মিথ্যাবাদী মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমামদের মিথ্যা আশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে ঢাকা ছেড়ে সুদূরে কক্সবাজারে নিঃসঙ্গ জীবনকে বেছে নিয়ে সৎভাবে বাঁচতে চান। কিন্তু সেখানে গিয়েও উপদ্রব শুরু করলে লায়লা উপাধিধারী মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম যুদ্ধে অংশগ্রহণের নামে যে ছলনার আশ্রয় নেন, তা উন্মোচন করেন। দেশ স্বাধীনের পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার ধ্বজাধারী যে মিথ্যাবাদী মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমামরা রাতারাতি বড়লোক হয়ে যান, তাদের অপকর্মের প্রতিবাদ জানান। কেননা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারাই দেশ স্বাধীনের পর স্বাধীনতার আওয়াজ তুলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মদানকারী জাফরদের ত্যাগের মহিমা অর্থহীন করে তুলেছেন। ফলে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ মানুষের নিকট নিস্ফল– ম্লান হয়ে যাচ্ছে। স্বার্থান্বেষী মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমামের প্রতি লায়লার তীব্র প্রতিবাদী সংলাপে মুক্তিযুদ্ধের সুবিধাবাদীদের অপকর্ম ও মুখোশ উন্মোচিত হয় :

> তুমি কেন সাতাশে মার্চ একা, জাফরকে সঙ্গে না নিয়ে ঢাকা ছেড়েছিলে ইমাম? [...] তুমিও কম স্বার্থপর নও। [...] আজ তুমি বেঁচে আছো বলে গালভরা যুক্তি দিয়ে সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা কোরো না। এদেশের স্বাধীনতার কত অর্থই তো তোমরা করলে। স্বাধীনতার পতাকাকে সমুন্নত রাখবার জন্যে কতজনই তো দরদী সেজে এল আর গেল। তুমিও তো খারাপ নেই। আজ তোমরা যা করে বেড়াচ্ছো, তাই যদি হবার কথা ছিল, তাহলে আমার স্বামীকে কেন মরতে হ'ল? ওর মৃত্যুটাকে এত অর্থহীন করে তুললে তোমরা?[৮৪]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে সুবিধাভোগী আলী ইমামের মতো ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সীমাহীন ঔদ্ধত্যের চিত্রও অঙ্কন করেছেন। 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। উচ্চাভিলাসী একদল মুক্তিযোদ্ধা ক্ষমতার লোভ ও সম্পদ লুটপাটে ব্যস্ত, অন্য মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলায় বিক্ষুব্ধ এবং স্বাধীনতা বিরোধীরা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার মুখোশ পড়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সামাজিক অবক্ষয়জনিত কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংকট সৃষ্টি হয়।'[৮৫] কারণ মুক্তিযুদ্ধের নাম ভাঙিয়ে আলী ইমামরা যেমন 'এনিমি প্রোপার্টি' দখল, ব্যাংক লুট ইত্যাদি অপকর্ম করে প্রচুর অর্থ বিত্তের মালিক হয়েছেন, তেমনি স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হানাদার বাহিনীর দোসর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ রুদ্ধ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা উপাধিধারী স্বার্থান্ধ আলী ইমামরা অর্থ-সম্পদ, গাড়ি-বাড়ি, ব্যবসায়ের সব লাইসেন্স নিজেদের হাতের মুঠোয় পুরে মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাতে অসহায় জনগণের জীবনে মুক্তিযুদ্ধকে অর্থহীন করে তুলতে সদা

তৎপরতা চালিয়েছেন। লায়লা ও ইমামের কথোপকথনে স্বাধীনতা বিরোধীদের এই রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

লায়লা : স্বাধীনতার যুদ্ধটা যদি সত্যি হয়, আমার স্বামীর মত আরো লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ যদি নিরর্থক না হয়, তাহলে তোমরা পার পাবে না। একদিন তোমাদের বিচার হবেই।'

ইমাম : বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা, এই গানটা এক সময় আমরা খুব গাইতাম। হাঃ হাঃ হাঃ– জনতা– কোথায় সেই জনতা? এই জনতাকে আমরা ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। জনতা ভুলে গেছে সংগ্রাম। জনতার কণ্ঠে আজ চাল ডালের হিসেব।[৮৬]

স্বাধীনতা শহিদ মুক্তিযোদ্ধা জাফরের স্ত্রীর জীবনে বয়ে এনেছে দুঃষহ যন্ত্রণা, একাকিত্ব, অসহায়ত্ব; আর স্বার্থান্ধ আলী ইমামের জীবনে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হয়ে এসেছে। এর প্রকৃত কারণ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে একটা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সরকারের দেশ গঠনে নেতৃত্বের অদক্ষতা। আর এই নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে সুবিধাভোগীরা মিথ্যাকে আশ্রয় করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার হয়ে উঠেছেন। তারা ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাষ্ট্রীয় সকল সুবিধা আদায় করেছেন। অথচ স্বাধীনতার সুবিধাবাদী আলী ইমামদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অর্থ 'পুরনো কাসুন্দি' হলেও স্বার্থের বেলায় 'আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ'। আবদুল্লাহ আল-মামুন *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে আলী ইমামদের এই দৌরাত্ম্যের চিত্র উন্মোচন করেছেন। এ নাটকে আলী ইমামের স্বগোতোক্তিতে তার সুবিধাভোগী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন :

স্বাধীনতা নামের সেই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ একদিন আমার সামনে তুমিই ফেলে দিয়েছিলে। আমি দেখলাম ঝকঝকে এক প্রদীপ শূন্য থেকে আমার হাতের আওতার মধ্যে এসে পড়লো। প্রদীপে ঘসা দিতেই সামনে এসে দাঁড়ালো বংশবদ দৈত্য। আমি শুনতে পেলাম দৈত্যটা মাথা নীচু করে বলছে, বান্দা হাজির, হুকুম মালিক। অথচ স্বাধীতার আগে আমি কি ছিলাম?[৮৭]

তৃতীয় পুরুষ নাটকে নামধারী মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমামের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা অপ্রাপ্তির হতাশাজনিত কারণে প্রেম ও কামে বশীভূত হয়েছে। একারণে বন্ধু জাফরের মৃত্যু ও দেশ স্বাধীনের পর লায়লাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আলী ইমাম ঢাকা থেকে কক্সবাজারে আসেন। দীর্ঘজীবনের সুপ্ত কামনা চরিতার্থ করতে আলী ইমাম লায়লাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা জাফরের আদর্শের প্রতীক লায়লা স্বামীর চেতনাকে ধারণ করে স্বাধীনতার শত্রু ইমামকে শাস্তি দেয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি বিবাহের আয়োজনের উদ্দেশে বান্ধবীর বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের শত্রু ইমামকে

পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন। এর মধ্য দিয়ে শহিদ জাফরদের আত্মত্যাগের মহিমাকে স্বাধীন বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে লায়লা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণের আগে আলী ইমামের সংলাপে এই সত্য প্রকাশিত হয় :

> আমি একটার পর একটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। বন্ধু, দেশ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সবার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। [...] আমার আজকের এই পরাজয় প্রমাণ করে দিল, জাফরের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। এদেশ জাফরের, ইমামের নয়।[৮৮]

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতার অর্জন স্বপক্ষের শক্তির নিকট জাতীয় জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি বয়ে আনে, অন্যদিকে স্বাধীনতা বিরোধীদের নিকট এ প্রাপ্তি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা উত্তর দশকে মুক্তিযুদ্ধের শত্রুরা পুনর্বাসিত হয়ে পরবর্তী দুই দশকব্যাপী নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে নানা ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা চালান। ফলে মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন-ভঙ্গজনিত কারণে মানুষের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার-পরিজন ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাপিত জীবনে আপাত সঙ্কট সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধের শাণিত চেতনার উজ্জীবনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি বিজয়ী হয়। একারণে 'মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর প্রতি অবিচল একনিষ্ঠতা; স্বপ্ন, স্বপ্ন ভঙ্গ; সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিবৃত্ত নিয়ে একটি সহজ সম্পাদ্যের নাটক *তৃতীয় পুরুষ*।'[৮৯]। স্বাধীনতা উত্তরকালের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনবাস্তবতায় নাট্যকার নানা অনুষঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই উজ্জ্বল করে তুলেছেন এ নাটকে।

মেহেরজান আরেকবার

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির অবিমৃষ্যকারি পরিবেশে সামরিক স্বৈর-শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় বিকশিত একাত্তরের পরাজিত রাজনৈতিক দোসরদের নবজাগরিত সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় মৌলবাদী আগ্রাসনে জর্জরিত মানুষের জীবনচিত্র নিয়ে আবদুল্লাহ আল-মামুন রচনা করেছেন *মেহেরজান আরেকবার*[৯০] নাটক। নাট্যকার এ নাটকের বীজ সংগ্রহ করেছেন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় তিরিশ বছর অতিক্রম করলেও এর ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত দেশের সাধারণ মানুষ এবং মুক্তিযোদ্ধারা এখনো তাদের মাথা গোজার ঠাঁই স্থির করতে পারেননি। অথচ সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের হাত ধরে, বিশেষত ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মধ্য দিয়ে 'বহুদলীয় গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নাম করে এদেশে একাত্তরের আলবদর-রাজাকাররা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে অবৈধপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে প্রভূত অর্থ-সম্পদের মালিকানা অর্জন

করেছেন। তারা এদেশের মানুষের জনজীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় মৌলবাদী চেতনার উত্থান এবং তজ্জনিত কারণে স্বাধীনতা উত্তরকালে জনজীবনের এই দৈন্য-দশাকে চিত্রিত করে তুলেছেন।

মেহেরজান আরেকবার নাটকের পটভূমি গড়ে উঠেছে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিনাশী প্রতিবেশে খাদ্যের অন্বেষণে সোনার বাংলা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে কর্মরত একদল অসহায় মানুষের জীবনে রাজাকার-আলবদর বাহিনীর আধিপত্য বিস্তার এবং নির্মম অত্যাচারের অবর্ণনীয় চালচিত্রকে কেন্দ্র করে। এ নাটকে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় সবকিছু হারানো মেহেরজান সোনার বাংলা হোটেলে আশ্রয় পেলেও আলবদরদের অত্যাচারে 'সোনার বাংলা'র স্বাধীনতার সুখ পাননি। বস্তুত নাট্যকার এ হোটেলের নামটি প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। হোটেল 'সোনার বাংলা'র হতশ্রী অবস্থা এবং মালিক-কর্মচারীদের দৈন্য-দশার মাধ্যমে নাট্যকার যেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের দৈন্যদশাকেই মূর্ত করে তুলতে চান।[৯১] কেননা এ সময় স্বাধীনতার স্বপক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর উত্থানে মেহেরজানের মতো মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্বিষহ যন্ত্রণা নেমে আসে। ফলে মেহেরজান স্বাধীনতা বিরোধীদের শোষণ-নিপীড়ন-যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে পুঞ্জিত ক্ষোভ থেকে বিক্ষোভ-প্রতিবাদের আগুনে জ্বলে উঠলে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ প্রসেঙ্গ *মেহেরজান আরেকবার* নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন :

> ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের চক্রান্ত বেড়ে চলেছে। কোনোভাবেই যেন এদের ঠেকানো যাচ্ছে না। অথচ এই বাংলাদেশে তারা যে অপকর্ম ও কলঙ্কের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, অনেক আগেই তার শাস্তি বিধান করা জাতিগতভাবে প্রয়োজন ছিল। মেহেরজান বাংলাদেশের ভাগ্যাহত অসহায় একটা বিশাল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। আমি নাট্যকার হিসেবে তার মধ্যে কিছু আশার আলো দেখতে পেয়েছি। তাই তাকেই আরেকবার জেগে ওঠার আমন্ত্রণ জানিয়েছি।[৯২]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে যুদ্ধবিধ্বস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা বিরোধীদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ বাংলাদেশের একটি পরিবারের অনিকেত জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। 'যুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশে সক্রিয় হয়ে ওঠে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি। একই তাঁবুর নিচে জন্ম নেয় ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তি। সামরিক শক্তি ক্ষমতায় এলে

শক্তিধরেরা রং বদল করে হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান। বিকৃত পুঁজিবাদের উত্থান ঘটে।'[৯৩] শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র স্বাধীনতা বিরোধী সুবিধাবাদী গোষ্ঠী সমাজ, রাজনীতি, সরকারি চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। একারণে *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে মুক্তিযোদ্ধা শিকদারকে আলবদর হাজী সাহেবের ট্রাক চালাতে হয়। গ্রামের জোতদারের ষড়যন্ত্রের জালে ঘর-বাড়ি-জমি সবকিছু হারিয়ে মেহেরজান বিদেশ-ভূইয়ে হয়ে হোটেলে রান্নার কাজ করেন। বাবার বাড়ির বরাই খাওয়ার ইচ্ছায় উন্মুখ পুত্রবধূ সখিনার কথার জবাবে মেহেরজানের সংলাপে যুদ্ধোত্তর কালের সাধারণ মানুষের জীবনের এই করুণচিত্র উন্মোচিত হয়। যেমন :

> অহনতরি বাপের বারীর সাধ তুমার যায় নাই বউ? কবেই তো বারি ঘর জমি জিরাত জোতদারগো প্যাটে ঢুইক্যা গেছে। কিন্তু কি করতে পেরেছে তোমার বাবা ভাইয়ে? উল্টা জোতদারেরা ত্যাগো মাডার কেসে ফাসাইয়া যাবজ্জীবন জ্যালে হান্দাইয়া দিছে।[৯৪]

বাংলাদেশে একাত্তর সালে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ছিল বিদেশি শাসনমুক্ত, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও বহির্বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণ করা। এই লক্ষ্যে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহায়তাদান করে। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী চক্র একাত্তর থেকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে ভারত কিংবা হিন্দুদের চক্রান্ত বলে অপপ্রচার চালান। এমনকি স্বাধীনতা উত্তরকালে আলবদর হাজী সাহেবরা হিন্দু তথা ভারত বিরোধিতার নামে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেন। *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন পাকিস্তানপন্থি এই ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িক চেতনার ভয়ানক রূপ তুলে ধরেছেন। এ নাটকে ভারতীয় এক কোম্পানির সেল্‌সম্যান কানু ঘোষকে সোনার বাংলা হোটেলে দেখে স্বাধীনতা বিরোধী হাজী সাহেবের সংলাপে সাম্প্রদায়িক চেতনার এই জঘন্য রূপ উদ্‌গিরিত হয়েছে। যথা :

> এই মিয়া ক্যামনে ঢুকল? তবে তো আমাদের হিসাবে কোনো ভুল নাই। বাংলাদেশ তো ঠিকই ইন্ডিয়ার প্যাটে ঢুকতেছে। আমার এলাকার মইদ্যে হোটেল। সেই হোটেলে ভারতীয়, সেই ভারতীয় রান্দাঘরে মেয়েছেলেদের সঙ্গে– উঃ খেদাও হরমুজ আলী। এই জিনিস খেদাও।[৯৫]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে ধর্মীয় আদর্শের নামে স্বদেশচেতনা বিচ্যুত কিছু মানুষ পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন। পরবর্তী সময় দেশ স্বাধীনের পর পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে স্বদেশচেতনা বিচ্যুত এই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ধর্মীয়-মৌলবাদী চেতনা-বিস্তারসহ নানা

রকম দেশবিরোধী তৎপরতা চালান। এদেশের গণতান্ত্রিক বিকাশে ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে সামরিক শাসকদের হাত ধরে এই মৌলবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্র পর্যন্ত তাদের শেকড় স্থাপন করেন। ফলে বাঙালির রক্তে অর্জিত ১৯৭২ সালে রচিত মূল সংবিধান পরিবর্তন করে সামরিক শাসক এরশাদের নির্দেশে, অষ্টম সংশোধনীতে ২ক নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি এবং অন্যান্য ধর্ম সমমর্যাদায় পালন করার কথা বলা হয়।'[৯৬] এ সুযোগে ধর্মীয় রাজনীতি চর্চার দ্বার উন্মোচিত হলে হাজী সাহেবের মতো কুচক্রী মৌলবাদীরা মুখে ধর্মের আদর্শের বুলি আওড়ালেও সমাজে চোরাচালান, অস্ত্র-ব্যবসাসহ নানা রকম অপকর্ম করে সাধারণ মানুষের জীবনকে অস্থির করে তোলেন। অথচ মৌলবাদী হাজী সাহেবরা স্বাধীন বাংলাদেশকে আবারও পাকিস্তান বানানোর দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠেন। *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে মুক্তিযোদ্ধা শিকদার আলবদর নেতা হাজী সাহেবের চেলাদের প্রতিহত করলে– হাজী সাহেব তার মৌলবাদী রাজনৈতিক হুঙ্কার ছুঁড়ে দিয়েছেন। হাজী সাহেবের সংলাপে এই মৌলবাদী পাকিস্তানপন্থি রাজনীতির দাপট প্রণিধানযোগ্য :

> যখন আমাদের পালে বাতাস যখন ইসলাম ফির জিন্দা, যখন দ্যাশের বর ছোট পাট্টিগুলি বেদিশা হইয়া তওবা পরতাছে, আমাগো ইসলামী তাম্বুর তলে একাট্টা হইতাছে, তহন তুই ফুটা বেলুন হইয়া দম ছাইরা দিলি বেকুব?[৯৭]

মেহেরজান আরেকবার নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন স্বাধীনতা বিরোধীদের আস্ফালনের বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বদেশপ্রেম মুখ্য করে তুলেছেন। এ নাটকে মুক্তিযোদ্ধা শিকদার আলবদর হাজী সাহেবের ট্রাক চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও হাজীর অন্যায়কে প্রতিহত করতে থাপ্পড় দিয়ে দাঁত তুলে ফেলেছেন। আবার মুক্তিযুদ্ধকালে সবকিছু হারানো এবং পরবর্তী সময়ে মৌলবাদীদের ফতোয়ায় ভিটেমাটি ছাড়া হলেও মেহেরজান দেশকে ভুলে যাননি। মেহেরজান 'সোনার বাংলা' হোটেলকেই সমগ্র স্বাধীন বাংলাদেশের ভূমি মনে করেন। একারণে মৌলবাদী রাজনীতিক হাজী সাহেবের ভয়ে হরমুজ হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বললেও মেহেরজান রাজি হননি। এই 'সোনার বাংলা' হোটেলই মেহেরজানের বাংলাদেশ, বাঁচতে হলে দেশের বুকেই বেঁচে থাকবেন। মেহেরজানের সংলাপে এই স্বদেশপ্রেম উৎসারিত হয় :

> পায়ের তলে আমার এই যে মাটি, এই যে হোটেল সোনার বাংলা, এই যে রান্দাঘর, এইগুলিই আমার বাংলাদেশ। আমি অন্য কোনো বাংলাদেশ চিনি না, বুঝি না। এই বাংলাদেশ আমি ছারমু না। নগদ যা আছে, যতটুকু আছে তাই ঠাইসা ধরুম। জাগা যদি ছাড়তে হয়, পলাইতে হয়, তাইলে এই মাটি, এই হোটেল, এই রান্দাঘর ব্যাবাক নিজের হাতে নষ্ট কইরা জ্বালাইয়া পোরাইয়া তবে শ্যাষ কথা।[৯৮]

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতটাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে, সোনার বাংলা হোটেলের মালিক হরমুজ এবং মুক্তিযোদ্ধা শিকদারকে স্বাধীনতার অনেক বছর পরে আলবদর নেতা হাজীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। হাজীর তালেবান বাহিনীর হাতে অসহায় নির্যাতিত মেহেরজানের মেয়ে ও বিধবা পুত্রবধূ সম্ভ্রমহানির মুখোমুখি হয়েছেন। হাজী সাহেব মেহেরজানকে মেয়েসহ উলঙ্গ করে নাচাতে চেয়েছেন। প্রতিবাদী মেহেরজান মৌলবাদী রাজনীতিক হাজী সাহেবের বীভৎস নোংরামির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হিটলারের দেয়া স্টেনগান দিয়ে স্বাধীনতার শত্রু আলবদর হাজী সাহেবকে নিস্তেজ করে দিয়েছেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে মেহেরজানের এই প্রতিবাদী রূপ চিত্রিত করে মৌলবাদী রাজনীতি ও স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিহত করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঋদ্ধ শক্তির জাগরণকে প্রতীকায়িত করেছেন। মেহেরজানের সংলাপে স্বাধীনতা বিরোধীদের নির্মূল করার এই আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যেমন :

> হাজীবাবা হাজীবাবা করস? স্বাধীন দেশে বদর বাহিনীর জানোয়ারের পাও চাটস? এইনি এই দেশের তোরা ভরসা? কোনো দরকার নাই। তরা পইচ্যা গ্যাছস। বাঁইচ্যা থাকলে তরা পুরা দ্যাশ পচাইবি। কোনো দরকার নাই।[৯৯]

নব্বইয়ের দশকে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পুনর্জাগরিত হয়ে জনগণ এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে স্বাধীনতা বিরোধী আলবদর নেতা হাজী সাহেব ও তার তালেবান বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেহেরজানের প্রতিবাদের চিত্র অঙ্কন করে, এ সময়ের স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিহত করার আন্দোলনকে চিত্রিত করেছেন। নাট্যকার নাটকটি শহিদ জননী জাহানারা ইমামকে উৎসর্গ করেছেন। একারণে *মেহেরজান আরেকবার* নাটক নব্বইয়ের দশকে নবোত্থিত স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের এবং নির্মূল করার এক প্রামাণ্য দলিল।

গ. সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি নির্ভর :

আবদুল্লাহ আল-মামুন সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন *শপথ* (প্রকাশিত ১৯৭৮), *কুরসী* (১৯৯১) ও *মাইক মাস্টার* (১৯৯৭) নাটক। পচাত্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিমর্মভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে নানারকম উত্থান-পতন ও পরিবর্তন সাধিত হয়। বঙ্গবন্ধু উত্তরকালে রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্যতার সুযোগে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যেমন নানারকম পরিবর্তন সাধিত হয়, তেমনি সামরিক শাসকদের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে নানা

সংঘাত সৃষ্টি হয়। এ সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলি আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কুরসী* ও *মাইক মাস্টার* নাটক দুটিতে বিধৃত হয়েছে। তবে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে পাকিস্তানি আমলে যুদ্ধ বিরোধী চেতনাকে ধারণ করে রচিত হলেও আইয়ুব শাসনামলের ভিতে আঘাত হানতে তাঁর *শপথ* নাটকটি সমকালের রাজনীতিকে স্পর্শ করেছে। এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি নির্ভর *কুরসী* ও *মাইক মাস্টার* নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য আলোচনা করা হলো :

কুরসী

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কুরসী*[১০০] নাটকটি আশির দশকে সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক সঙ্কটকে কেন্দ্র করে রচিত। এ নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন ক্ষমতালোভী সামরিক স্বৈরশাসকদের কুরসী বা ক্ষমতা দখলের অন্তরালে রাজনৈতিক ক্ষমতা লিপ্সার চিত্র উন্মোচন করেছেন। সঙ্গত কারণে নাটকটি যেহেতু রাজনীতিকে কেন্দ্র করে রচিত, সেহেতু নাট্যকার তীরন্দাজ ছদ্মনামে রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, 'সে সময় লেখক হিসাবে আমার আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কারণটা পুরোপুরি রাজনৈতিক। তৎকালীন বিরাজমান স্বৈরশাসনের রক্ত চক্ষুকে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই আমার পক্ষে প্রকাশ্যে আসা সম্ভবপর হয়নি।'[১০১] তাছাড়া তিনি সরকারি চাকরি করতেন। একজন সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে আবদুল্লাহ আল-মামুন রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যেমন সম্যক জ্ঞানলাভ করেছিলেন, তেমনি স্বৈরশাসনে নিষ্পেষিত মানুষের জীবনের দৈনন্দিন শোষণ-বঞ্চনা, দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে সমব্যথিত হয়েছিলেন। একারণে *কুরসী* নাটকে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন 'স্বৈরশাসক এরশাদ এবং তাঁর শাসন-শোষণ-নির্যাতনের চিত্র তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।'[১০২]

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর ষড়যন্ত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেই সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে শফিউল্লাহকে বিদায় দিয়ে জিয়াউর রহমানকে নিয়োগ দেন। একই সঙ্গে সামরিক সমর্থনে সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিচার রহিত করেন। এদিকে ৩রা নভেম্বর বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও সাফাত জামিলের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান গৃহবন্দী হয়ে পড়েন। কিন্তু ৭ই নভেম্বর কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বে 'বিপ্লবী সেনা সংস্থা'র পাল্টা অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান মুক্ত হয়ে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি আবু সাদাত

মোহাম্মদ সায়েম-এর নেতৃত্বে গঠিত সরকারে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ ফিরে পান। অনতিবিলম্বে জিয়াউর রহমান সামরিক কূটজাল বিস্তার করে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন। কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বে ৭ই নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান মুক্ত হলেও, কৃতঘ্নের মতো কর্ণেল তাহেরকে বিনা বিচারে ২১শে জুলাই ১৯৭৬ সালে নির্মমভাবে ফাঁসিতে দেন এবং ২১শে এপ্রিল ১৯৭৭ সালে বিচারপতি সায়েমকে অপসারিত করে নিজেই রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরপর জিয়াউর রহমান সামরিক উর্দি ছেড়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু তার বিস্তৃত সামরিক ষড়যন্ত্রের জাল এত বিস্তারিত হয় যে, সেই জালে আটকে পড়ে একদল সামরিক বাহিনীর হাতে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে তিনি নিহত হলেন। এরপর কিছুদিনের জন্য বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হলেও ২৪শে মার্চ, ১৯৮২ সালে সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের ষড়যন্ত্রে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। অর্থাৎ কুরসী নাটকে হুজুরবেশধারী সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদ কুরসী তথা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে গণতন্ত্রমনস্ক জনতা ও রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামরিক শাসনের কবল থেকে মুক্ত করতে উদ্যত হলে– ক্ষমতালোভী হুজুরবেশধারী স্বৈরশাসক এরশাদ যেকোনো মূল্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। হুজুরের সংলাপে স্বৈরশাসক এরশাদের এই ক্ষমতা লিপ্সা প্রতিবিধানযোগ্য :

> পেতেই হবে। ঐ কুরসী আমি বহু কৌশলে নিতম্বগত করেছি। গামলা গামলা ঘাম বেরিয়ে গেছে আমার দেহ থেকে। এত কষ্টের পর ঐ কুরসীতে বসতে না বসতেই ওরা আমাকে–ওদের হৃদয়ে কি কোনো দয়া নেই?[১০৩]

স্বৈরশাসক এরশাদ কুরসী তথা রাষ্ট্রক্ষমতার মোহে এতটাই অন্ধ হয়ে যান যে, আর ক্ষমতা থেকে নামতে চান না। তিনি নামমাত্র নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতাকে 'জগদ্দল পাথরের' মতো আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। দেশের জনগণ সামরিক শাসনের শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *কুরসী* নাটকে আশির দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী এই গণ-আন্দোলনকে উন্মোচন করেছেন। দীর্ঘকাল ব্যাপী সামরিক শাসকদের শাসন-শোষণ-নিপীড়নে নিষ্পেষিত জনগণ একসময় রাষ্ট্রীয় মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। প্রথম দফায় ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের শাসনামল এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত স্বৈরশাসক এরশাদের প্রথম পর্যায়ের শাসনামলে অধিকার বঞ্চিত জনগণের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়। এ সময় অধিকার

সচেতন জনগণ স্বৈরশাসক এরশাদের করতল থেকে কুরসী তথা রাষ্ট্রক্ষমতাকে মুক্ত করার জন্য জেগে ওঠেন। কুরসীর সংলাপে আশির দশকের এই গণ-জাগরণ প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

> মেলাদিন ত হুজুরে আমার উপুরে বইসা নিশ্চিন্তে রাজত্বি করতাছিলো। এরি মইদ্যে কিছুদিন আগে হুনলাম, রাইজ্যে গোলমাল লাইগ্যা গ্যাছে। প্রজারা আওয়াজ তুলছে। এলা নামেন হুজুর, কুরসী থিকা নামেন। ব্যস, হুজুরের চান্দি লগে লগে গরম হইয়া গেল। ঘইটা গেল বিষম এক কাণ্ড।[১০৪]

বঙ্গবন্ধু উত্তরকালে রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্যতার সুযোগে সামরিক জেনারেলগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন। এ সময় গণতন্ত্র ও রাজনীতি স্বৈরশাসকদের ক্ষমতার কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। একারণে স্বৈরশাসক এরশাদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেই নামসর্বস্ব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে কুরসী তথা রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন। সামরিক পোশাক খুলে রাজনৈতিক বেশধারী এরশাদ কুরসীতে আসীন হওয়ার পরপরই রাষ্ট্রক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে নানান কৌশল ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। ফলে জনজীবনে স্বৈরশাসনের পৈশাচিক নির্যাতন-নিপীড়ন আরো বেড়ে যায়। এ সময় জনগণ একটু নড়েচড়ে বসলে অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তুললে ১৯৮৮ সালে স্বৈরশাসক এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার উপক্রম হন। এ নাটকে জ্যোতিষ স্বৈরাচার এরশাদের শাসনামলে রাজনীতি এবং জনগণের জাগরণ অনুধাবন করে কুরসীর মাতা তথা দেশমাতাকে জানান :

> এই অর্বাচীন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন কুরসীপাগল বিশেষ করিয়া ১৯৮৭ সালের শেষাশেষি সময় হইতে এমন কুদাকুদি করিবে যে, তোমার কুরসীর দফারফা হইয়া যাইবে। সে ত্রাহী ত্রাহী রব ছাড়িয়া পলায়নের পথ পাইবে না। অতএব মাতঃ তুমি সেইদিনের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হইয়া যাও।[১০৫]

কিন্তু ক্ষমতালোভী এরশাদ কোনোক্রমেই কুরসী তথা রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়তে চান না। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুবিধাবাদী নেতা এবং কতিপয় আমলাদের দলে ভিড়িয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে নামমাত্র নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা গ্রহণ করলেও গণতন্ত্র বিকাশে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ভুলে যান। তিনি গণদাবী উপেক্ষা করে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে তোষামুদে মন্ত্রী ও পরিষদ দ্বারা নতুন করে ক্ষমতা লাভের জন্য নীলনকশা রচনা করেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় দফায় তার শাসনামলে জনজীবনে মন্ত্রী ও পরিষদ কর্তৃক অমানবিক নির্যাতন-উৎপীড়ন শুরু হয়। ফলে নিষ্পেষিত-নিপীড়িত মানুষ একসময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। দিনেদিনে চারদিকে এরশাদ বিরোধী গণ-আন্দোলন জোরালো হতে থাকে। আবদুল্লাহ আল-মামুন আশির দশকের শেষে এরশাদ বিরোধী এই গণ-

আন্দোলনকে কুরসী নাটকে চিত্রিত করেছেন। এ নাটকে জ্যোতিষ চরিত্রের সংলাপে বিদ্রোহী জনতার প্রতিবাদ ও গণ-আন্দোলন প্রণিধানযোগ্য :

> না। এখনও পরাজয় হয় নাই। এখনও সময় আছে। প্রস্তুত হও সব। কুরসীকে ওদের কবল হইতে উদ্ধার করিতেই হইবে। এই হুজুরকে আর কুরসীতে উপবেশন করিতে দেওয়া যাইবে না। স্মরণ রাখিও, এই হুজুর আবারও যদি কুরসীতে ঠাসিয়া উপবেশন করিতে পারে, তাহা হইলে রাজ্যের সর্বনাশ হইবে। এমনিতে অনেক সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। চৈতন্য ফিরাইয়া আনো সবে। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনার দিন শেষ। এইবার শুধু এক লক্ষ্য। কুরসী হইতে এই হুজুরকে হঠাও।[১০৬]

জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে স্বৈরশাসক এরশাদের ক্ষমতার ভিত নড়ে যায়। আশির দশকের শেষে বিশেষত ১৯৮৮ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এতটাই জোরালো হয় যে, সমগ্র দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করে। জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজপথে নেমে আসেন। এরপর ১৯৯০ সালে এরশাদ বিরোধী এই আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিলে স্বৈরশাসক এরশাদ কুরসী তথা রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। ফলশ্রুতিতে গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হয়। নাট্যকার *কুরসী* নাটকে নিপুণভাবে স্বৈরশাসক এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ নাটকে কুরসী তথা রাষ্ট্রক্ষমতাকে স্বৈরশাসকের কবল থেকে উদ্ধারের পর মায়ের সংলাপে গণতন্ত্রের শাশ্বত মুক্তির বাণী প্রতিধ্বনিত হয় :

> না। আর কুরসী না। এই কুরসী এক ভয়ংকর নিশা। কুরসীতে বইসা মানুষ আর মানুষ থাকে না। রাজা হয়, বাদশা হয়। এই দ্যাশে আবার কিয়ের রাজা? কিয়ের বাদশা? সব সমান। কুনো উচা নীচা নাই।'[১০৭]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন কুরসী নাটকে নব্য-স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সামরিক শাসনামলের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। বিশেষত স্বৈরশাসক এরশাদ আমলের রাজনৈতিক বাস্তবতা, নিষ্পেষিত জনজীবন, শিল্প-সাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামকে তিনি এ নাটকে চিত্রিত করেছেন। কেননা সামরিক শাসকদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারে জনজীবন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয়। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন কুরসী 'নাটকে মূলত দেশে সামরিক-বাহিনীর সদস্যদের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে পাঠক-দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।'[১০৮] সঙ্গত কারণে *কুরসী* নাটকটি আশির দশকের রাজনৈতিক বাস্তবতায় সামরিক শাসকদের রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সার প্রামাণ্য দলিল।

মাইক মাস্টার

বাংলাদেশের রাজনীতির উত্থান-প্রতিষ্ঠা ও বিকাশযাত্রায় একজন নীতিবান আদর্শ রাজনৈতিক কর্মীর– রাজনীতির নীতিহীনতায় শোষিত-বঞ্চিত জীবনের চালচিত্র আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মাইক মাস্টার*[১০৯] নাটকে অঙ্কিত হয়েছে। এ নাটকে নাট্যকার একজন আদর্শবান বাম রাজনৈতিক কর্মীর সাম্যবাদী সমাজগড়ার ভূলুণ্ঠিত স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনাজনিত পরাজিত জীবনের দুঃখ-গাথা তুলে ধরেছেন। অথচ এদেশের রাজনীতির রয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত সোনালি অতীত। কেননা 'পাকিস্তানি শাসকদের নানারকম লুটপাটের ডামাডোলে যখন বাঙালির জাতিসত্তাই বিলীন হয়ে যেতে বসেছিল, তখনই বাঙালি আঘাত হেনেছে। তখনই পিতা ঘোষণা দিয়েছেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। মুক্তির লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আমাদেরকে দিয়েছে স্বাধীন একটি বাসভূমি। আর স্বাধীন বাসভূমি দিয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার অধিকার।'[১১০] কিন্তু মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে রাজনৈতিক বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা-তিরোহিত জাতির একাংশ বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করলে রাজনীতির নীতি যেন নির্বাসনে যায়। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে নেতৃত্বের সঙ্কটকালে রাজনীতিকদের নীতিহীন গালভরা বক্তৃতা সভা-সমিতিতে সাধারণ মানুষকে মুখিয়ে রাখলেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ-কষ্ট লাঘবে ব্যর্থ হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন *মাইক মাস্টার* নাটকে বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী হজরত আলীর কৈশোর-যৌবনের সোনালি দিনগুলোর ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে মলিন হওয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতির স্তিমিত অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। হজরত আলী যৌবনের উত্তাল পর্বে এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের উচ্চাশায় নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেন। কিন্তু নীতিকে তিনি বিসর্জন দিতে পারেননি বিধায় আজও কর্মীই রয়েছেন। অথচ যে মতলুবরা হাতের লেখাটাও ভালো করে লিখতে পারেন না, তারাই পলিটিক্যাল পার্টির দপ্তর সম্পাদক হন। 'মতলুব হাওলাদার ছাড়া পার্টি একদিনও চলবে না।'[১১১] কারণ এই মতলুব হাওলাদাররা উপরতলার নীতিহীন রাজনীতির নেতৃবৃন্দের অপকর্মের সহায়ক। মতলুব হাওলাদাররা পার্টিকে ক্ষমতায় আনতে নীতিহীনতার কোনো অংশেরই অবশিষ্ট রাখেন না। পার্টি নীতিহীনভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে মেধাহীন মতলুব হাওলাদাররাও ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেন। হজরত আলীর সংলাপে বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু-উত্তর রাজনীতির এমন বাস্তবতা স্পষ্ট হয়েছে। যেমন :

> মতলুব শালা পাবে হাফ মন্ত্রীর পোর্টফোলিও। দৃশ্যটা চিন্তা করলেও আমার পেটে মোচড় দেয়। পেটে এক ফোঁটা বিদ্যে নেই, পার্টি অফিসে বসে পার্টির কোনো কাজ করে না, টাউট-বাটপারদের নিয়ে কমিশন মারার ফিকির করে, পার্টি অফিসের টেলিফোনে এক বসায় শতেক খানেক ফোন করে, ও যদি হয় মন্ত্রী তবেই হয়েছে। যদিও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এরাই, এ ধরনের মতলুব আলীরাই দেশের মন্ত্রী হয়, হচ্ছে এবং হবেও।[১১২]

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ একটি দেশ-মানচিত্র ও তাদের মৌলিক অধিকার অর্জন করে। কিন্তু 'মানুষের মনুষ্যত্বকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে, মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্যে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো তা অবলুণ্ঠিত হয়।[১১৩] কারণ বঙ্গবন্ধু-উত্তর রাজনৈতিক সঙ্কটকালে বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে প্রথমে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন। পরে সামরিক সমর্থনে রাষ্ট্রক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার কৌশল হিসেবে মুজিব সৃষ্ট কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগকে বাতিল ঘোষণা করেন। কিন্তু পর্দার অন্তরালে সামরিক প্রধানেরা ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠলে রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। *মাইক মাস্টার* নাটকে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন সমকালীন রাজনীতি ও জনগণের মধ্যকার এই বিস্তর ব্যবধান তুলে ধরেছেন। কারণ রাজনীতিবিদরা মুখে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তারা এদেশের মানুষের সুখ-দুঃখের কথা একটুও ভাবেন না। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে সমাজ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা আবেগ-উচ্ছ্বাস আর নেতৃবৃন্দের সভা-সেমিনার-বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে রাজনীতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হজরত আলীর হতাশাজনিত সংলাপে নীতিহীন রাজনীতির এই অন্তঃসারশূন্যতা চিত্রিত হয় :

> আমি সেই কবে দেশ উদ্ধারের সংকল্পে ভিটেমাটি ত্যাগ করে নেতা আর পার্টির ল্যাজে ঝুলে আছি। কিন্তু এরা তো কেউ দেশের কথা বলে না। দেশের মানুষের সুখ দুঃখের কথা ভাবে না। রুটিন বাঁধা মিটিং মিছিল ঘেরাও পেটাও হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু সামনে লক্ষ্য কি? [...] আমাদের এই পোড়াকপাল ভূখণ্ডের একটাই সমস্যা, রাজনীতি। মাঝে মাঝে আমি ধোঁকায় পড়ে যাই। এই মালটার নাম রাজনীতি হলো কেন? যার সঙ্গে নীতির কোনো সম্পর্কই নেই, নীতি নামক বস্তুর সংমিশ্রণে যার পয়দাই অসম্ভব, সেটা রাজনীতি হয় কি করে?[১১৪]

বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে বিভীষিকাময় অন্ধকার নেমে আসে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরপরই। কতিপয় রাজনৈতিক নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতা, হঠকারি মানসিকতা, ক্ষমতার লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের এতটাই অন্ধ করে যে, এ সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী দেশি ও বিদেশি শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে এদেশের রাজনীতিকে ধ্বংস করার নীলনকশা রচনা করে। ফলে পঁচাত্তরে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রবাদ পুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশের রাজনীতিতে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *মাইক মাস্টার* নাটকে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতির বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা ও জিঘাংশার চিত্র মাইক মাস্টারের

দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বটবৃক্ষের মতো প্রত্যক্ষ সাক্ষী মাইক মাস্টার স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী রাজনীতির নিষ্ঠুর বাস্তবতা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে :

> বিচিত্র রকম দুর্ভাগা এই দেশ। স্বাধীন হবার উদগ্র বাসনায়, মুক্তির জন্যে তীব্র উন্মাদনায় নেতাকে পিতা বানায়। পিতার হাতে ধরিয়ে দেয় বিপজ্জনক পতাকা। পিতা সারি সারি কামান বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জীবন বাজি রেখে একদিন পিতা পুত্রকে এনে দেন মুক্তি, স্বাধীনতা। বিনিময়ে পুত্র সাজে জন্মদাতা পিতার কুৎসিত ঘাতক।[১১৫]

বস্তুত জাতির পিতার বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের পর এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতা যেমন রাজনীতিকে মলিন করে, তেমনি জনসাধারণও তাদের গৌরবোজ্জ্বল রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং জাতির জনকের অবদান ভুলে যান। কর্মী থেকে নেতা পর্যন্ত একজন আরেকজনের তোষামোদ করে 'কন্ট্রাকটরি হাতাবে? বারিধারায় বাড়ি তুলবে?'[১১৬] অথচ হজরত আলীর মতো সৎ রাজনীতিক কর্মীগণ আজীবন কর্মীই থাকবেন? জাতির পিতার বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদে যাবে? নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন বাংলাদেশের এই অন্তঃসারশূন্য নীতিহীন নেতৃত্বের স্বরূপ মাইক মাস্টার হজরত আলীর হতাশাজনিত-ক্ষুব্ধ সংলাপে উন্মোচন করেছেন। যেমন :

> পলিটিক্সের নামে তোমরা কি কি কর সব ফাঁস করে দেব আমি। শালা, তুমি এক সাইনবোর্ড সর্বস্ব পার্টির ওয়ার্কার হয়ে গাড়ি হাঁকাও? বাড়ি হাঁকাও? সিঙ্গাপুরে বউ নিয়ে মার্কেটিংয়ে যাও? তোমার ছেলেকে আমেরিকায় পড়াও? শালা তুমি কি জমিদারের পুত? সব ব্যাটার চাঁদাবাজি আর ডাণ্ডাবাজির খবর চোঙা ফুঁকে আমি দেশবাসীকে জানিয়ে দেবো।[১১৭]

স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের শূন্যতায় এদেশের কতিপয় রাজনীতিকগণ এতটাই নিচুতলায় নামেন যে, একজন নেতা হয়েও আরেকজন নেতা বা কর্মীর ন্যায় বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন না। এক্ষেত্রে একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের গম চুরির বিরুদ্ধে হজরত আলীর নাতির প্রতিবাদ আশা জাগালেও নীতিহীন রাজনীতির প্রতিহিংসাবশত তাকে খুন করা হয়। হজরত আলী নাতির খুনের বিচার চেয়েছেন, কিন্তু নেতৃস্থানীয় নেতাদের অবহেলা আর বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। কেননা যে নেতারা জাতির পিতার খুনীদের বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে পারেননি; তাদের নিকট হজরত আলীর মতো একজন রাজনৈতিক কর্মীর নাতির হত্যাকাণ্ড 'সামাইন্য ইস্যু' মনে হয়েছে। একারণে মাইক মাস্টার হজরত আলীর বিচার প্রার্থনায় সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের আদর্শ শূন্যতা

আর বিচার ব্যবস্থার অবক্ষয়ের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। যেমন হজরত আলীর সংলাপে এই অবক্ষয় প্রণিধানযোগ্য :

> তোমরা তো কত কিছুই করতে পারো। প্রাইম মিনিস্টারকে কিংবা হোম মিনিস্টারকে একটা ফোন– হ্যাহ্ কি যে আপনে কন মিয়া– এই সামাইন্য ইস্যুতে অত উপুড়ে ফোন কইরা পার্টির ইজ্জত মারতে কন?[১১৮]

আবদুল্লাহ আল-মামুন *মাইক মাস্টার* নাটকে নিষ্ঠাবান সৎ রাজনৈতিক কর্মী হজরত আলীর রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতন ও শোষণ-বঞ্চনা-লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে এদেশের বঙ্গবন্ধু উত্তরকালের নেতাদের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও নেতৃত্ব শূন্যতাকে তুলে ধরেছেন। এ নাটকে হজরত আলী দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কলেজ জীবনেই রাজনীতিতে যোগ দেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু উত্তরকালে নেতাদের নীতিহীন রাজনীতির দরুণ হজরত আলীর মতো সৎ রাজনৈতিক কর্মী বা নেতাদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে। হজরত আলীর মতো সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীরা অযোগ্য পদলেহনকারী অত্যাচারী নেতাদের জুলুম নির্যাতন নিরবে-নিশ্চুপে মেনে নিয়েছেন। তবুও মাইক মাস্টার হজরত আলী আশা ছাড়তে পারেন না। কেননা, 'দেশবাসীর উদ্ধার তো রাজনীতি ছাড়া হয় না। রাজনীতিতে আস্থা হারালেই বন্দুকের নল জায়গা দখল করে।'[১১৯] তাই হজরত আলীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রচলিত রাজনীতি নয়, বিপ্লবী রাজনীতিই একদিন সকল শোষণ-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা দূর করে দেশকে সাধারণ মানুষের বসবাসের উপযোগী করবে। হজরত আলীর সংলাপে নাট্যকার সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও উচ্চাশা :

> এক স্বর্ণালী সময়ে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মাইক মাস্টার বাংলাদেশের হজরত আলীর উদ্যোগে এক বিরাট বিশ্বসভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বিশ্বসভায় বক্তৃতা করিবেন বাংলার বঙ্গবন্ধু, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, চিলির আলেন্দে, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা ও যুক্তরাষ্ট্রের আব্রাহাম লিংকন। [...] শ্রী চৈতন্য দেব, শ্রীকৃষ্ণ, বাঙালির বুকে আবার তোমরা বাসা বাঁধ। প্রেম দাও। বাঙালি যেমন ভালোবাসে জনক জননীকে, বধূকে, পুত্র-কন্যাকে তেমনি তাদের ভালোবাসতে শেখাও তাদের পরিবেশকে, তাদের বাসস্থানকে, কর্মস্থলকে, জাতিকে, দেশকে, দেশবাসীকে।[১২০]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *মাইক মাস্টার* নাটকে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের রাজনীতির নিরিখে মাইক মাস্টারের জীবনবাস্তবতা অবলম্বন করে রাজনীতির এক বিশুদ্ধ সত্তার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। যে রাজনীতি একদিন এদেশের মানুষকে সকল শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী মহাসংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে দেশ এবং জাতিকে বিশ্ব দরবারে স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রকৃতপক্ষে

সেই বিপ্লবী চেতনায় শাণিত নীতির রাজনীতি ফিরে আসলে একদিন হজরত আলীর মতো শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জীবনে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঘ. শ্রেণিসংগ্রাম ভিত্তিক :

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পটভূমিতে আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত শ্রেণিসংগ্রাম ভিত্তিক নাটক হচ্ছে *সেনাপতি* (১৯৮০) ও *দূরপাল্লা* (১৯৮৮)। স্বাধীনতা উত্তরকালে নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির শোষণযন্ত্রে নিষ্পেষিত শ্রমিকশ্রেণির নিপীড়িত জীবনের চালচিত্র নিয়ে গঠিত হয়েছে আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সেনাপতি* নাটক। তাঁর *দূরপাল্লা* নাটকে মালিক ও শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম সরাসরি উপস্থাপিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত *সেনাপতি* নাটকটির বিষয়বৈচিত্র্য বিশ্লেষণে সচেষ্ট থাকব।

সেনাপতি

আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত *সেনাপতি*[১২১] নাটকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার নিষ্পেষণে নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণির জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও তজ্জনিত কারণে শ্রমিকশ্রেণির অধিকার সচেতনতা অঙ্কিত হয়েছে। এ নাটকে-পুঁজিবাদের মূর্ত প্রতীক 'আব্বাস আলী তালুকদার পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার শোষণের ভয়াবহ কূটবৃত্তে বন্দী কারখানার নিরীহ শ্রমিকদের ওপর জোর-জুলুম-অত্যাচার ও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।'[১২২] ফলে শ্রমিক শ্রেণি তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়ে উঠলে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। আবদুল্লাহ আল-মামুন নব্য পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার বিকাশকালে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের শ্রেণিচেতনাজাত এ দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে শ্রমজীবী মানুষের শোষিত-বঞ্চিত জীবনচিত্রকে এ নাটকে মূল বিষয় হিসাবে উপজীব্য করেছেন।

তবে *সেনাপতি* নাটকে শিল্পপতির মধ্যে পুঁজিবাদী কোনো শ্রেণিচেতনা উপস্থিত নেই। এ নাটকে পুঁজিবাদী সত্তা আত্মপ্রতিষ্ঠায় মগ্ন এম. এ. পাশ বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত বেকার যুবক আব্বাস আলী তালুকদারের জ্ঞানের-চেতনাজাত। শিক্ষিত বেকার যুবক আব্বাস আলী তালুকদার স্বাধীনতা উত্তরকালে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রতিবেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বঞ্চিত হয়ে তার মেধাকে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করেন। 'কেননা এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাই জন্ম দেয় স্বার্থান্ধ, বিশ্বাসঘাতক ও হন্তারক একেকজন আব্বাস আলী তালুকদারকে। যারা বিবেক বিসর্জন দিয়ে পরধন আত্মসাতের লোভে মত্ত হয়ে অবশেষে মানবতার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।'[১২৩] ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের দরুণ সমাজের একটা শ্রেণির মানুষ প্রভূত অর্থসম্পদের মালিকানা অর্জন করেন, অন্যদিকে সমাজের বৃহৎ অংশ চরম দারিদ্র্যসীমার

নিচে জীবনযাপন করেন। ফলে শিক্ষিত নিম্নবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণি কর্মসংস্থানের অভাবে আর্থিক সংকট ও টানাপড়েনে ঠিকমতো বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করতে পারেন না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই প্রভাব *সেনাপতি* নাটকের তালুকদার-মেরী পরিবারের সঙ্গে বাড়িওয়ালার মধ্যে দ্বন্দ্বমুখর হয়েছে। তালুকদার-মেরী শিক্ষিত বেকার। জীবনযাপনের উপযোগী সামান্য উপার্জনের জন্য তন্ন তন্ন করে একটা চাকরি খুঁজছেন। অন্যদিকে বাড়িওয়ালা প্রভূত সম্পদের মালিক হয়েও সামান্য ভাড়ার জন্য তালুকদার-মেরীর বিবাহ বার্ষিকীকে উপহার পাওয়া সামান্য ফুলদানিটা নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছেন। বাড়িওয়ালার সংলাপে এই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সঙ্কটের চিত্র অনুধাবন করা যায় :

> লজ্জা করে না আপনার? বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন না, বাড়িতে থাকেন? বউকে খাওয়াতে পারেন না, বউ রাখেন, উঁ উঁ– বিবাহ বার্ষিকী। ফুলদানি! কচু। বেশরম আহাম্মক, পাজী, নপুংসক।[১২৪]

বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে বিকাশমান নব্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সমাজে মালিক ও শ্রমিক দুটি পৃথক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। মালিক শ্রেণি উৎপাদনের জন্য সর্বদা শ্রমিক শ্রেণির সর্বোচ্চ শক্তিটুকুও ব্যবহার করেন। অথচ মালিকপক্ষ শ্রমিক শ্রেণির সন্তানদের স্বাস্থ্য, আবাসিক সুবিধা প্রদান তো দূরের কথা তাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরিও পরিশোধ করেন না। শ্রমিক শ্রেণি উৎপাদন শক্তির জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মূলধন হিসাবে লভ্যাংশের ভাগিদার হওয়ার কথা হলেও তারা প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হন– অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হন। আব্বাস আলী তালুকদারের সংলাপে শ্রমিক শ্রেণির বঞ্চনার এই চিত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য। যেমন :

> আপনারা শ্রমিক– ঐ যে চিমনি, ঐ চিমনির ধোঁয়া কী দিয়ে তৈরি হয় জানেন? আপনারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মিলের চাকা ঘোরান–আপনারা পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হন–আপনাদের অস্থি থেকে, মজ্জা থেকে, হৃদয় থেকে উঠে আসে ধোঁয়া, ঐ নীল আকাশের সঙ্গে মিশে যায়–আর তারপরই তৈরি হয় আকাশচুম্বী দালান কোঠা। আমেরিকা, জাপান, জার্মানি আর ইংল্যান্ড থেকে আসে হাওয়া গাড়ি। কাদের? ঐসব মালিকদের, যারা আপনাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, আপনাদের বেতন বাড়ায় না, আপনাদের ঘাম শুকোবার আগে আপনাদের পাওনা মেটায় না, অথচ আমাদের ধর্মে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। ধর্মের নির্দেশও এরা মানে না।[১২৫]

সেনাপতি নাটকে আব্বাস আলী তালুকদার তার চেতনায় নিজেও পুঁজিপতি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি একজন সজ্জন-নির্লোভ মিল মালিকের কাঁধে বসে তোষামোদ করে সমস্ত মিল নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন। তার জ্ঞান-দক্ষতাকে পুঁজিতে রূপান্তর করে একদিকে মিল মালিককে 'সিস্টেম' ও এস্টাবলিশমেন্ট'-এর দোহাই দিয়ে কারখানায় শৃঙ্খলা ফেরানো ও উৎপাদন বৃদ্ধির আশ্বাস দেন,

অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণির অন্তপ্রাণ হয়ে শ্রমিক-স্বার্থ ও কল্যাণের আশ্বাস দিলেও গভীরে শোষণের নীলনকশা রচনা করেন। ফলে মালিক শোষকে এবং শ্রমিক শোষিতে পরিণত হলে শ্রেণিদ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু আব্বাস আলী তালুকদার মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণি থেকে উঠে এসে নিজেকে সুবিধাভোগী পুঁজিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেও তার ভূমিকা সমাজতন্ত্রের চেতনা নিয়ন্ত্রিত নয়। কারণ বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনে শ্রেণিসংগ্রামের এ বিষয়টি মার্কসীয় দর্শনের প্রত্যক্ষজাত নয়। 'মার্কসবাদ সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা করে বা ভালোভাবে জেনে নাট্যকর্মীরা এ পথে আসেনি। বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে শ্রেণিসংগ্রামের চিন্তাটি তাই কোনো সুপরিকল্পিত চিন্তা নয়। মার্কসবাদী চিন্তা থেকে যেমন এর জন্ম নয়, তেমনভাবে কোনো মার্কসবাদী দলও এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলো না।'[১২৬] তবে *সেনাপতি* নাটকে 'সিস্টেম' ও 'এস্টাবলিশমেন্ট' হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণের যন্ত্র। তালুকদারের সংলাপে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার এই ভয়ানক শোষণ যন্ত্রের স্বরূপ প্রণিধানযোগ্য :

> কে বলেছে আপনি মালিক? মালিক তো হচ্ছে সিস্টেম। এস্টাবলিশমেন্ট। আপনি তো একটা সিস্টেমের আন্ডারে কাজ করছেন, একটা এস্টাবলিশমেন্ট টিকিয়ে রেখেছেন–কেননা একজন লয়াল সিটিজেন হিসাবে আপনি সিস্টেম এবং এস্টাবলিশমেন্টের বিরোধিতা করতে পারেন না।[১২৭]

কিন্তু তালুকদার স্বাধীনতা উত্তরকালে বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকার যুবক। দুবেলা খাবার জোটাতে তাকে কর্মসংস্থানের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে। তাকে সমাজের তাচ্ছিল্য, স্ত্রীর অপমান সহ্য করতে হয়েছে দিনের পর দিন। বস্তুত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সম্পদ গুটিকয়েক সমাজপতি ও শিল্পপতির হাতে কুক্ষিগত হলেও জনগণের বৃহৎ অংশ বেকারত্ব আর ক্ষুধার জ্বালায় তাদের পেছন পেছন ঘুরেও ন্যূনতম জীবনযাপনে উপার্জনের জন্য কাজ পান না। জীবনের প্রতিটি পদে পদে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হতে হয় নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী বেকার মানুষকে। তালুকদারের অতীত জীবনের বর্ণনায় পুঁজিবাদী সমাজের এমন বাস্তব চিত্র দৃশ্যমান হয়। তালুকদারের ভাষায় :

> সারা জীবন নিজে অপমানিত হয়েছি। আমার চারপাশে এমন কেউ আছে, যে সুযোগ পেয়ে একবার অন্তত আমার গায়ে থু থু দেয় নি। মাথা ভর্তি দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি বেশ্যার দালালের মতো ভদ্রলোকদের পাঞ্জাবির আস্তিন ধরে টানাটানি করেছি। পেট ভর্তি ক্ষুধা নিয়ে নেড়ী কুত্তার মতো ডাস্টবিনের চারপাশে চক্কর মেরেছি। শালার সিভিলাইজেশন! আমার পাছায় লাথি দিয়ে বুঝিয়েছে আমি একটা মিসফিট, উল্লুক, ভ্যাগাবন্ড।[১২৮]

শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের অন্যতম কৌশল। আবদুল্লাহ আল-মামুন *সেনাপতি* নাটকে শ্রমিক শ্রেণির মাঝে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবজাত এ বিভেদ সৃষ্টির দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। এ নাটকে শ্রমিক নেতা সিধু ভাইয়ের নেতৃত্বে সর্দার, ১ম শ্রমিক, ৪র্থ শ্রমিক প্রমুখ একদিকে আর তালুকদারের কূটকৌশলে দ্বিতীয় শ্রমিক, ৩য় শ্রমিক প্রমুখ অন্যদলে ভাগ হয়ে যান। শ্রমিকদের এই বিভেদ নিজেদের মধ্যে যতই বৃদ্ধি পায় মালিকপক্ষ ততই লাভবান হন। *সেনাপতি* নাটকে পুঁজিবাদের প্রতীক 'সিস্টেম ও এস্টাবলিশমেন্ট'-এর নিয়ন্ত্রক আব্বাস আলী তালুকদারের প্ররোচনায় শুধু শুধু শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া–হানাহানিতে উদ্যত হন। মিল মালিকের কন্যার নিকট সর্দার ছুটে এসে শ্রমিকদের মারপিটের কথা বললে, শ্রমিক-বিভেদ স্পষ্ট হয়। যেমন :

> সব শেষ কইরা ফ্যালাইলো আপা। ওয়ার্কারদের মইদ্যে ডিভিশন করছে। খানিক আগে দুই দলে মাইরপিট হইলো। জখমও হইছে কয়েকজন। আমি সব দেইখ্যা ছুইটা আসলাম স্যারের কাছে। আপা আপ্‌নে স্যারেরে বলেন তালুকদার তার সর্বনাশ করব।[১২৯]

সেনাপতি নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। এ নাটকে পুঁজিবাদী সমাজে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত, শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে আন্দোলনের ডাক দেন। কিন্তু পুঁজিবাদের রক্ষক সেনাপতি আব্বাস আলী তালুকদার কূটকৌশলে স্বার্থান্বেষী শ্রমিকদের একাংশকে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর লেলিয়ে দেন। ফলে শ্রমিক বিভেদ থেকে শ্রমিকদের মধ্যে মারামারি হলে রহিম মোল্লা মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু পুঁজিবাদের মূর্ত প্রতীক আব্বাস আলী তালুকদার রাতের আঁধারে রহিম মোল্লার লাশ গুম করেন। এমনকি আন্দোলনের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলতে মিল-কারখানা থেকে সমস্ত রক্তের দাগ মুছে ফেলেন। তালুকদারের সংলাপে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করার এমন বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় :

> চেঁচাবেন না। রহিম মোল্লার রক্তের দাগ অনেক আগেই তুলে ফেলা হয়েছে। শুধু রহিম মোল্লারই নয়, আরো যারা জখম হয়েছিল, তাদের রক্তের চিহ্নও কোথাও রাখা হয় নি। আমার স্যার জানেন, কোথাও কোনো গোলমাল হয় নি, সব ঠিক ঠাক। এখন তিনি ঘুমাচ্ছেন, পীসফুলী। অতএব চেঁচাবেন না।[১৩০]

কিন্তু বাস্তবে শ্রমিক আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। রহিম মোল্লার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের বিভাজন দূর হয়েছে। শ্রমিকরা আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তারা আব্বাস আলী তালুকদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু আব্বাস আলী তালুকদার কোনো ব্যক্তি নন,

'সিস্টেম' অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। কেননা শ্রমিক শ্রেণিকে অধিকার বঞ্চিত করতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একপথ দিয়ে বের হয়ে অন্য পথ দিয়ে প্রবেশ করে। আবদুল্লাহ আল-মামুন *সেনাপতি* নাটকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার স্বরূপ আব্বাস আলী তালুকদারের মৃত্যু পূর্বে তার সংলাপে ব্যক্ত করেছেন। যেমন :

> আমার পথের খোঁজ খবর আপনারা রাখেন না। আমি এ পথ দিয়ে ঢুকে ঐ পথ দিয়ে বেরুবো। সর্বত্রই আমার পথ–অসংখ্য, অগুণতি।[১৩১]

সেনাপতি নাটকের শ্রেণিসংগ্রাম সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করলেও সমাজতত্ত্ব অনুসৃত কোনো শ্রেণিসংগ্রাম নয়, কারণ এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাট্যচেতনা কোনো সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক চেতনা কিংবা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক চিন্তা থেকে উৎসারিত হয়নি। তবে *সেনাপতি* নাটকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জাগরিত সাম্যবাদী চেতনা ক্লিফোর্ড ওডেটস-এর *ওয়েটিং ফর লেফটি*-এর মতোই ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে সাম্যবাদী চেতনার সদর্থক। কারণ মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রতিবেশে ধন-বৈষম্যের বিপরীতে 'শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নিম্নমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-শিল্পীদের যে-অংশ নিজেদের শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানুষের বঞ্চনা দারিদ্র্য ও মুক্তির লড়াইকে নাটকের উপজীব্য করে তুলতে চান, কোনো সন্দেহ নেই তাঁরা একটি নতুন আন্দোলনের স্রষ্টা এবং তাদের এই প্রচেষ্টারও একটি গুরুত্ব আছে।[১৩২] এই অর্থে সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় উচ্চাভিলাসী নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *সেনাপতি* নাটকে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার সচেতনা জাগিয়ে তুলেছেন। এ নাটকে 'সিস্টেম' এবং 'এস্টাবলিশমেন্ট'-এর ধারক আব্বাস আলী তালুকদারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ পরিবর্তন করে নাট্যকার সাম্য রচনা করেছেন।

সর্বোপরি, আমরা বলতে পারি যে, আবদুল্লাহ আল-মামুন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের সমাজবাস্তবতায় যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির প্রতিবেশে এদেশের মানুষের যাপিত জীবনের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক টানাপড়েন, তজ্জনিত কারণে সামাজিক নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, কালোবাজারি-মজুতদার শ্রেণির দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষের উৎপীড়িত জীবনের অভাব-দারিদ্র্য, সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্যতার অভাবে সৃষ্ট রাজনৈতিক সঙ্কটে সামরিক শাসকদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালিপ্সা, স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী শক্তির রাজনীতিতে পুনর্বাসন ও আধিপত্য বিস্তারের কারণে জর্জরিত ধর্মীয় জীবনবোধ ও আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি, নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব এবং শ্রমিক শ্রেণির সংঘবদ্ধ প্রয়াস গভীর মনোনিবেশসহ পর্যবেক্ষণ করেছেন।

একারণে 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অশুভ শক্তির উত্থান, ক্ষয়িষ্ণু আদর্শবাদ, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নভঙ্গ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবক্ষয়, নারীদের চিরাচরিত অবরুদ্ধ-নিষ্পেষিত রূপ প্রাধান্য পেয়েছে। গভীর জীবনবোধ থেকে উদ্ভূত শিল্প প্রতিভায় তিনি মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত সমাজের ক্ষোভ-সংক্ষুব্ধ নিচুস্তরের মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে শ্রেণিস্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা এবং নব্য-পুঁজিবাদী সমাজের মুখোশ উন্মোচনে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।'[১৩৩]

প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের মূলচেতনায় আস্থাশীল একজন আবেগপ্রবণ, পর দুঃখ-কাতর, গণ-অধিকার সচেতন নাট্যকার। একারণে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বৈনাশিকতার পটভূমিতে তাঁর রচিত নাটকগুলোতে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-বঞ্চনা, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের আধিপত্য, সামরিক স্বৈরশাসন, অধিকারহীনতা, নারীর অবমূল্যায়ন, শ্রমিক শ্রেণির অধিকার সচেতনতা উজ্জ্বল রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ বিকাশে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলো এই বিষয়বৈচিত্র্যের মহিমায় সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সঙ্গত কারণে বাংলা নাটকের ধারায় আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলোর বিষয়বৈচিত্র্য তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১. মো. জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭), পৃ. ১৬৫।

২. সৈয়দ শামসুল হক, 'বিশাল বাংলার নাট্যপ্রাণ পুরুষ', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, (ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১১), পৃ. ১২।

৩. বোরহান বুলবুল, *বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪), পৃ. ৫৮।

৪. *সুবচন নির্বাসনে* নাটক ডিসেম্বর, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মুক্তধারা। থিয়েটার-এর প্রযোজনা ও আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় এ নাটকটি ১৯৭৪ সালের ১৯ এপ্রিল মহিলা সমিতি মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

৫. সোলায়মান কবীর, *আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয় ও পরিচর্যা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৪), পৃ. ৫২।

৬. সৌমিত্র শেখর, 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে সমসময়', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৭. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'সুবচন নির্বাসনে', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

১৫. সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৮), পৃ. ৭২।

১৬. *এখন দুঃসময়* মাত্র দশ দিনের মাথায় রচিত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ হয় থিয়েটার-এর প্রযোজনায়। পরে ১৯৭৫ সালে মুক্তধারা থেকে এ নাটক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৭. মো. জাকিরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।

১৮. হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক : বিষয়-চেতনা*, (ঢাকা : অবসর, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২), পৃ. ১৮৬-১৮৭।

১৯. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এখন দুঃসময়', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

২০. পূর্বোক্ত পৃ. ৬৭।

২১. পূর্বোক্ত পৃ. ৭২।

২২. পূর্বোক্ত পৃ. ৭৪।

২৩. পূর্বোক্ত পৃ. ৮২।

২৪. পূর্বোক্ত পৃ. ৮৬।

২৫. সোলায়মান কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

২৬. মো. জাকিরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭।

২৭. *কোকিলারা* নাটক আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত। নাটকটি নাট্যকারের নির্দেশনা এবং থিয়েটার-এর ১৯তম প্রযোজনায় ১৯ জানুয়ারি, ১৯৮৯ সালে গাইড হাউসে প্রথম মঞ্চায়িত হয়। পরে ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সালে মুক্তধারা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

২৮. মো. জাকিরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।

২৯. মালেকা বেগম, 'আবদুল্লাহ আল-মামুন ও কোকিলারা', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।

৩০. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'কোকিলারা', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮।

৩৬. মঞ্জু দাশগুপ্ত, উদ্ধৃত, মো. জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।

৩৭. *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকটি আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত। নাটকটি ২০ মে, ১৯৯৫ সালে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে থিয়েটার-এর মঞ্চ প্রযোজনা এবং নাট্যকারের নির্দেশনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। পরে সাহিত্য প্রকাশ থেকে এপ্রিল ১৯৯৭ সালে প্রথম এ নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৩৮. রাহমান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৩।

৩৯. বাবুল বিশ্বাস, 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকে সমাজ ও নারী', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.) *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, ৪৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৫), পৃ. ১৭৯।

৪০. আবদুল্লাহ আল-মামুন, *মেরাজ ফকিরের মা*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭), পৃ. ৬।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

৪৬. *এবার ধরা দাও* সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সালে মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই অবসর-এর মঞ্চ প্রযোজনায় শিল্পকলা একাডেমিতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি নির্দেশনা দেন সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন।

৪৭. সৌমিত্র শেখর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৪৮. বোরহান বুলবুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।

৪৯. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এবার ধরা দাও' *নাটক সমগ্র* ১, (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, একুশের বইমেলা ২০০০), পৃ. ১০১।

৫০. সোলায়মান কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

৫১. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এবার ধরা দাও' *নাটক সমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।

৫৩. অনুপম হাসান, 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের নাটক', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, ৩৯তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১০), পৃ. ১৫০।

৫৪. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এবার ধরা দাও' *নাটক সমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

৫৫. ইউসুফ ইকবাল, 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ : স্বপ্নভঙ্গজনিত বেদনার ভাষাচিত্র', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, ৩৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫), পৃ. ১৩৮।

৫৬. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এবার ধরা দাও' *নাটক সমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮।

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪।

৫৮. অনুপম হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।

৫৯. আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখনও ক্রীতদাস* নাটকটি ১৯৮৪ সালে মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ নাটকটি আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় ও থিয়েটার-এর মঞ্চ প্রযোজনায় ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

৬০. অনুপম হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩।

৬২. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এখনও ক্রীতদাস', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

৬৩. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *কথা ও কবিতা*, (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮১), পৃ. ১৩৬।

৬৪. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এখনও ক্রীতদাস', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০।

৬৯. ইউসুফ ইকবাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২।

৭০. আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই* নাটকটি থিয়েটার-এর প্রযোজনায় এবং আবদুল্লাহ আল-মামুনের স্বীয় নির্দেশনায় ১৯৮৭ সালের ১৫ জুলাই প্রথম মঞ্চস্থ হয়। পরে জানুয়ারি ১৯৮৮ সালে মুক্তধারা ঢাকা এ নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।

৭১. মো. জাকিরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১।

৭২. থিয়েটার প্রযোজনায় স্মরণিকা দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লিখিত নয়।

৭৩. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'তোমরাই', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫।

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪।

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০।

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯।

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২।

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮।

৭৯. ইউসুফ ইকবাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

৮০. *তৃতীয় পুরুষ*, আবদুল্লাহ আল-মামুন কর্তৃক রচিত। কথন প্রকাশনী থেকে আগস্ট ১৯৮৮ সালে এ নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

৮১. ইউসুফ ইকবাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

৮২. আবদুল্লাহ আল-মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র*, (ঢাকা : অনন্যা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৩), ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

৮৩. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'তৃতীয় পুরুষ', *মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪।

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০।

৮৫. 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত অসাম্প্রদায়িক শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত পদদলিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একদল মুক্তিযোদ্ধা সরকারদলীয় সাইনবোর্ড গলায় ঝুলিয়ে লুটপাটে ব্যস্ত, অপর মুক্তিযোদ্ধারা চরম অবহেলায় বিক্ষুব্ধ, স্বাধীনতা বিরোধীরা হঠাৎ দেশপ্রেমিক সেজে মুক্তিযোদ্ধার মুখোশ পড়ে সামাজিক অনাচারে মেতে উঠেছে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, [...] স্বাধীনতা বিরোধীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় উত্থান, মুক্তিযোদ্ধাদের অবজ্ঞা, অবহেলা, নির্যাতন, নির্বাসন, হত্যা প্রভৃতি সঙ্কট অনেক যুদ্ধফেরত বিক্ষুব্ধ তরুণ নাট্যকারদের আন্দোলিত করলো নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে।'

–মো. জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬।

৮৬. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'তৃতীয় পুরুষ', *মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫।

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪।

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১০।

৮৯. সেলিম মোজাহার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৯০. আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত *মেহেরজান আরেকবার* নাটকটি ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে পাবলিক লাইব্রেরিতে থিয়েটার-এর মঞ্চ প্রযোজনা এবং ফেরদৌসী মজুমদারের নির্দেশনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। পরে ১৯৮৯ সালে থিয়েটার পত্রিকার একবিংশতি বর্ষ ১-২ সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়।

৯১. অনুপম হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০।

৯২. আবদুল্লাহ আল-মামুন, ১৯৯৮ সালে থিয়েটার পত্রিকায় একবিংশতি বর্ষ ১-২ সংখ্যায় প্রকাশিত *মেহেরজান আরেকবার* নাটকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৯৩. মো. হারুনুর রশীদ, 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয়ভাবনা ও শিল্পশৈলী', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, ৪৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৫), পৃ. ১৭০।

৯৪. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'মেহেরজান আরেকবার', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৩।

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১-৪৬২।

৯৬. 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্ম ও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে [...]'

–দ্রষ্টব্য : বাংলাদেশের সংবিধান, প্রথম ভাগ, ২ক নম্বর অনুচ্ছেদ [অষ্টাদশ সংশোধনী পর্যন্ত সংশোধিত]।

৯৭. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'মেহেরজান আরেকবার', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০।

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৬।

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২।

১০০. আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত *কুরসী* নাটকটি ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে নাট্যকারের নির্দেশনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি তীরন্দাজ ছদ্মনামে থিয়েটার পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষ; ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, মে ১৯৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে *তিনটি পথ নাটক : উজান পবন/বিবিসাব/কুরসী* শিরোনামে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১০১. আবদুল্লাহ আল-মামুন, *তিনটি পথনাটক* (ঢাকা : মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১), প্রসঙ্গ কথা দ্রষ্টব্য।

১০২. সোলায়মান কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।

১০৩. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'কুরসী', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, চতুর্দশ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, মে ১৯৮৮), পৃ. ৯০।

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

১০৮. সোলায়মান কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

১০৯. আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত *মাইক মাস্টার* নাটকটি সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে থিয়েটার পত্রিকার বিংশতিবর্ষপূর্তি সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটি ফরহাদ জামান পলাশের নির্দেশনায় ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ সালে থিয়েটার-এর প্রযোজনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

১১০. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার ও আমাদের নাটক', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, (ঢাকা : মুক্তধারা, তৃতীয় সংস্করণ, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭), পৃ. ২৩১।

১১১. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'মাইক মাস্টার', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৮।

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৮।

১১৩. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ, রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭-২০০০*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১), পৃ. ৩৫১।

১১৪. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'মাইক মাস্টার' পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০১।

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৩।

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬।

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬।

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮।

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১১।

১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২।

১২১. *সেনাপতি* আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত নাটক। নাটকটি সংস্কৃতি সংসদ-এর প্রযোজনা ও নাট্যকারের স্বীয় নির্দেশনায় ২মার্চ, ১৯৭৯ সালে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তী সময়ে মুক্তধারা কর্তৃক জুলাই ১৯৮০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১২২. ‘এ নাটকের আব্বাস আলী তালুকদার এবং স্যার (শিল্পপতি) প্রতীকী চরিত্র। স্যারের অর্থ-সম্পদের রক্ষক সেনাপতিরূপী আব্বাস আলী তালুকদার প্রথমে দরিদ্র ও বেকার ছিল। পুঁজিবাদী এই সমাজ তাকে শুধুই সে-সময় ঘৃণা আর অবহেলা করেছে। নিজের এই গ্লানি দূর করতে আব্বাস আলী তালুকদার মোসাহেবি করে শিল্পপতি স্যারের প্রথমে আস্থা অর্জন করে; পরে নিজেই পুঁজিবাদের কূটবৃত্তে স্বীয়সত্তা বিসর্জন দিয়েছে। [...] তাকে অবচেতনে গ্রাস করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিত্ত-সম্পদের ভয়াবহ লোভ। এজন্যেই সে নিরীহ কারখানা-শ্রমিকদের ওপরে শাসন-শোষণ-অত্যাচার করতে পারে নির্বিকারচিত্তে।’

–সোলায়মান কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯ দ্রষ্টব্য।

১২৩. মো. জাকিরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩।

১২৪. আবদুল্লাহ আল-মামুন, ‘সেনাপতি’, *নাটক সমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১।

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪।

১২৬. রাহমান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪।

১২৭. আবদুল্লাহ আল-মামুন, ‘সেনাপতি’, *নাটক সমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯।

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫।

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬।

১৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮।

১৩২. রাহমান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫।

১৩৩. মো. হারুনুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।

চতুর্থ অধ্যায়

আবদুল্লাহ্ আল-মামুনের নাটক : রূপ-রীতি

নাটক মানবজীবনের প্রবহমান চালচিত্রের পূর্ণাঙ্গ ছবি। যা রঙ্গমঞ্চে গতিমান বৃত্তে বিচিত্র রূপ-রীতিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের মধ্যে আবেগ-উত্তাপ, উদ্দীপনা-উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল সৃষ্টি করে জীবনচিত্র রূপে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সঙ্গত কারণে জীবনের চালচিত্রের পরিপূর্ণ রূপ প্রস্ফূটনে সুচারু রূপ ও রীতিতে রচিত হলেই নাটক কাব্যিক মূল্য লাভ করে। আর 'কোনো নাটকে কাব্যিক মূল্যে উৎকৃষ্ট বলতে আমরা তার সঙ্গতিপূর্ণ চরিত্রচিত্রণ, চরিত্রচিত্রণে সম্ভাব্য বাস্তবতা, চরিত্রোপযোগী সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাণময় সংলাপ, বৃত্তে ঘটনা-সন্নিবেশ যতদূর সম্ভব কার্যকারণযোগ, ঘটনাবস্তুর আকর্ষণ– সব কিছুই বুঝে থাকি।'[১] অর্থাৎ নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে তার রূপ-রীতি কিংবা প্রাকরণিক দিক বিবেচ্য বিষয়। একজন নাট্যকার তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতায় মানবজীবনের কৌতূহলময় চালচিত্রকে ধারণ করে নাটকে লিখিত দৃশ্যরূপ দেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ প্রযোজকের নির্দেশনায় রঙ্গমঞ্চে দর্শকের সামনে নাট্যকারের কল্পিত দৃশ্যকে বাস্তবে চিত্রিত করে নাটককে সফল করে তোলেন। এছাড়া রঙ্গমঞ্চের আকৃতি, সজ্জা ও ক্লাসিক-রোমান্টিক প্রভৃতি রূপ-রীতিও নাট্য-সফলতার নির্ণায়ক। সুতরাং নাট্যমূল্য বিচারে নাটকের রূপ-রীতি অর্থাৎ নাটক যে আদর্শে রচিত, যে উপাদানগুলো নিয়ে নাটক গঠিত হয়েছে, রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনের জন্য কতটা উপযোগী, দর্শকের আগ্রহ বা কৌতূহল ধরে রাখতে রসবিচার, জীবনের চিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সরব উপস্থিতি, অভিনয় উপযোগী বিভিন্ন উপাদান, সংলাপ প্রভৃতি দিকগুলো বিবেচনা করতে হয়।

নাট্য বিচারে প্রথমেই আসে নাটকীয়তা বা নাটকের লক্ষণগুলোর কথা। নাটকীয় লক্ষণ বিচারে অ্যারিস্টটল যাকে 'Action' বলেছেন, তাকেই দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়[২] 'নাট্যক্রিয়া' বলে চিহ্নিত করেছেন। অজিতকুমার ঘোষ[৩] তাকেই 'গতিবেগ' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ নাটকের বিষয়কে একটা গতি প্রবাহের ধারায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রাকরণিক ও বাচনিক ভঙ্গির মধ্য দিয়ে পাত্রপাত্রীগণ দর্শকের হৃদয়াঙ্গম করান। নাট্যক্রিয়া, নাট্যদ্বন্দ্ব বা নাট্যসংঘাতের মধ্য দিয়ে নাটককে রসবোধ্য করে তোলেন। একারণে নাট্যদ্বন্দ্ব বা নাট্যসংঘাত নাটক বিচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের দার্শনিক

হেগেল এই দ্বন্দ্ববাদের প্রবক্তা। নাটকে এই দ্বন্দ্ব মানুষের সাথে দৈবশক্তির, কখনো সমাজের সাথে ব্যক্তির, কখনো বা এক শ্রেণির সঙ্গে অন্য শ্রেণির মধ্যে মুখরিত হয়ে ওঠে।

নাট্যোৎকণ্ঠা ও প্রচ্ছন্নতা নাটকের বিশেষ লক্ষণ। নাটকের কাহিনির পরিণতিতে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে পরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে দর্শকের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়, তখন নাটকের প্রতি দর্শকের এক ধরনের মায়া বাড়ে। একে নাট্যোৎকণ্ঠা বলে। নাট্যোৎকণ্ঠা থেকে নাট্যমায়া আসে।

আকস্মিকতার মধ্য দিয়ে নাট্যশ্লেষ (Dramatic Irony) সৃষ্টি করা নাটকের অন্যতম লক্ষণ। সাধারণত 'একটি পরিচিত পরিস্থিতির মধ্যে নূতন উপাদান এনে তাকে পরিবর্তিত করার নামই হল আকস্মিকতা (Surprise)'[৪]। নাটকে ঘটনার সঙ্গে পাত্র পাত্রীদের বচনের ভিন্ন অর্থ দর্শকের মনে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করলে নাট্যশ্লেষ বা Dramatic Irony সৃষ্টি হয়। এছাড়া দৃশ্যধর্মিতাকে আচার্য ভরত নাটকের বিশেষ লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন। নাটকে অবশ্যই দৃশ্যধর্মিতা থাকবে। অর্থাৎ নাটক হবে দেখার ও শোনার উপযোগী মানবজীবনের ছবি। এছাড়া নাটকে সঙ্গীতধর্মিতা ও আবেগধর্মিতা, ঘটনার ঘটমানতা ও চমক প্রভৃতি গুণও থাকবে।

নাটক মানবজীবন প্রবাহের প্রতিচ্ছবি। জীবনের এই প্রতিচ্ছবি ঘটনা পরম্পরায় সুনির্দিষ্ট কাহিনির মধ্য দিয়ে নাটকে উপস্থাপিত হয়। নাটকের কাহিনির এই ঘটনাসমূহকে পরস্পরের সঙ্গে যে সূত্রে একত্রিত করা হয় তাকেই নাটকের বৃত্ত বা plot বলে। সাধনকুমার ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'অন্বয়যুক্ত ঘটনাপরম্পরা তথা দেশকালে সমাস্তৃত ঘটনারাজিকে নাট্যের শরীর, ইতিবৃত্ত বা কাহিনি, ইংরেজিতে যাকে plot বলা হয়।'[৫] অর্থাৎ নাট্যবৃত্ত হচ্ছে নাটকের কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে Anatomical method বা নাটকের শরীর সংস্থান নীতি। এ বৃত্ত বা শরীর সংস্থান নীতি হচ্ছে– সন্ধি বিভাগ, অঙ্ক বিভাগ, ঐক্য, অগ্রগতি, ক্রম, ঔৎসুক্য, আবেগিত্ব (আবেগ-উদ্দীপন) ও উপকরণ সংযোজন প্রভৃতি। আচার্য ভরত নাটকের বৃত্তকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, ও উপসংহৃতি। অ্যারিস্টটল নাটকের এই বৃত্তের তিনটি অবস্থার কথা বলেছেন। যথা- 'a beginning, middle and end.'[৬] তবে নাট্যবৃত্তের পাঁচটি পর্যায়ের প্রসিদ্ধ মতামত দিয়েছেন গুস্তাফ ফ্রেতাগ। তাঁর মতে, a. Exposition b. Rising c. Climax d. Falling Action e. Catastrophe. এ প্রসঙ্গে নাটকের বৃত্ত সংস্থানের পর্যায় সম্পর্কে সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মতামত প্রণিধানযোগ্য :

এই গঠন-সূত্র অনুসারে নাটকের গঠন হয় 'পিড়ামিডের' মত। আরম্ভ থেকে কার্য উর্ধ্বগতিতে একটা অবস্থায় বা চূড়ায় (Climax) পৌঁছায় এবং সেখান থেকে বিশেষ একটা পরিণতির অভিমুখে নামতে থাকে। প্রথম দিকের কৌতূহল থাকে চূড়ার দিকে উঠার সমস্যাকে কেন্দ্র করে, আর শেষ দিকের কৌতূহল থাকে চূড়া থেকে শেষ পরিণতির দিকে নেমে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। মোট কথা এই গঠনসূত্র অনুসারে নাটকীয় গঠন হবে উত্থান-পতন সমন্বিত।[৭]

নাটকের এই বৃত্ত বা Plot-এর পঞ্চ সন্ধির ধারণা থেকে নাটককে পঞ্চাঙ্ক বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাট্যকাহিনিতে সন্ধি বিভাগের মতো অঙ্ক বিভাগের– প্রথম অঙ্কে নাটকের বীজ স্থাপন, দ্বিতীয় অঙ্কে তা চূড়ামুখী হয়, তৃতীয় অঙ্কে ঘটনা চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হবে। চতুর্থ অঙ্কে ঘটনা নিম্নমুখী হয়ে পঞ্চম অঙ্কে ঘটনার অনিবার্য ফলপ্রাপ্তি ঘটে। তবে আধুনিক নাট্যকারগণ এ যুগের জীবনপ্রবাহ অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ, শোষণ-নিপীড়ন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মানবতার অবক্ষয়, রাজনৈতিক-সামাজিক বিশৃঙ্খলা, ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণা-টানাপড়েন ইত্যাদি বিষয়কে নাটকের উপজীব্য করে তুলতে গিয়ে প্রাচীন নাট্যবৃত্ত মানছেন না। একারণে প্রাচীন পঞ্চাঙ্ক রীতি ও দৃশ্যবিভাগের প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে তিন, চার, এক অঙ্ক বিশিষ্ট কিংবা কিছু দৃশ্যের সমন্বয়ে জীবনের কোনো রূপকে নাটকে রূপায়িত করছেন।

নাট্যবৃত্তে ঐক্যনীতি নাটকের বিশেষ উপাদান। নাট্যকাহিনিতে ঘটনা, কাল এবং স্থানের ঐক্য নাটককে সুললিত করে। অ্যারিস্টটল প্রথম নাটকের তিন ঐক্য নীতির কথা বলেছেন। নাটকে ঘটনার ঐক্য বলতে বোঝায়, মানবজীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ হয়ে ঐ জীবনের পূর্ণাঙ্গ একটি ঘটনা সৃষ্টি করবে। কালগত ঐক্য হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটনা ঘটা সম্ভব– তা উপস্থাপন করতে হবে। আর স্থানের ঐক্য হচ্ছে কোনো ঘটনার সঙ্গে এমন সব স্থানকে গ্রথিত করতে হবে যেন নির্দিষ্ট স্থানে ঘটনাগুলো ঘটা সম্ভব হয়। এছাড়া ফরাসি নাট্য সমালোচক ফ্রান্সিস সার্সি প্রথম ভাবগত ঐক্য (unity of impression) নামে এক ঐক্যের কথা বলেছেন।

তবে নাটককে একটি নাটক হিসেবে বিচার করতে শুধু তার রসতাত্ত্বিক বিবেচনায় অন্তর্গঠন নয়, বহিরাবরণও বিচার করতে হয়। এজন্য নাটকে অনিবার্য কিছু উপাদান সংযুক্ত করে নাটকের শরীর গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় নাটকের শরীর বা বৃত্তের বাহ্যিক উপাদানগুলো লক্ষ্যণীয় যে, 'Every tragedy, therefore must have six parts; namely: Plot, Character, Diction, Thought, Spectacle and Song'।[৮] অর্থাৎ অ্যারিস্টটলীয় রীতি

অনুসারে কাহিনি, চরিত্র, বাগরীতি বা ভনিতা, ভাবনা, দৃশ্য ও গান এই ছয়টি নাটকের বাহ্যিক উপাদান।

কাহিনি হচ্ছে নাটকের ঘটনা (Plot) যা মানবজীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যেহেতু নাটক মানবজীবনের ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে, সেহেতু নাটক মাত্রই কাহিনি থাকবে। নাটকের দ্বিতীয় প্রধান উপাদান হচ্ছে চরিত্র। নাটক যেহেতু জীবনের ঘটনা কেন্দ্রিক, সেহেতু ঘটনাকে ফুটিয়ে তুলতে চরিত্রের আবশ্যক। 'যদি কোনো ঘটনা বা তার অন্তর্গত ভাবকে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হয়, তাহলে একটি স্বাধীন মানবীয় ব্যক্তিত্ব দরকার। ঐ ঘটনার চালক-শক্তিই হল চরিত্র।'[৯] অ্যারিস্টটল চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায়– চরিত্রকে সৎ, ঔচিত্যপূর্ণ, বাস্তব ও চরিত্রের সঙ্গতির প্রতি জোর দিয়েছেন। সাধনকুমার ভট্টাচার্য চরিত্রের কর্ম ও ভাবপ্রবণতার রূপটিকেই অভিহিত করেছেন। আবার আচার্য ভরত উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণির চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে নাট্যকারকে অবশ্যই চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাহিনির বাস্তবানুগ হতে হবে।

সংলাপ নাটকের তৃতীয় ও অপরিহার্য উপাদান। নাটকের কাহিনি ও চরিত্র সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সংলাপ অবশ্যই সহজবোধ্য, ভাবানুগ, চরিত্রানুগ ও সংক্ষিপ্ত হবে।

সংলাপের পরে নাটকের প্রধান উপাদান হিসেবে ভাবনার কথা আসে। জর্জ বার্নাড শ ভাবনাকে নাটকের আত্মা বলেছেন। কেননা ভাবনা ছাড়া নাটকের কাহিনি কিংবা চরিত্র বিকশিত হতে পারে না। নাটকের ভাবনা চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'দৃশ্য' নাটকের অন্যতম প্রধান উপাদান। নাটকের ভাবকে দৃশ্যের মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলা হয়। সাধনকুমার ভট্টাচার্য[১০] দৃশ্যকে– প্রথমত দৃশ্য ঘটনার পটভূমি, দ্বিতীয়ত আহার্য বা পরিচ্ছদাদির রূপে অবস্থার ব্যঞ্জনা এবং তৃতীয়ত ক্রিয়ার বা ঘটনার রূপ বা মানসিক অবস্থার সংকেত বলে অভিহিত করেছেন। ভরতও রঙ্গমঞ্চে আলোকসজ্জার জন্য দৃশ্যের ওপর জোর দিয়েছেন।

নাটকের শেষ উপাদান 'সঙ্গীত'। প্রাচীন নাটকে সঙ্গীতের বহুল প্রচলন থাকলেও আধুনিক নাটকে পরিমিত। দর্শকের মনের একঘেয়েমি দূর করতে সঙ্গীতের প্রচলন নাটককে প্রাণবন্ত করে তোলে। তবে আধুনিক নাটকে সঙ্গীত কখনো কখনো নাটকের কাহিনিকে গতি দান করে। আধুনিক নাটকে সঙ্গীতের

প্রচলন ছাড়াও উপমা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার নাট্য কাহিনিকে যেমন গতিশীল করে, তেমনি নাটককে অর্থবহ করে তোলে।

যা হোক উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে নাটকের নানা লক্ষণ, উপাদান ও রূপ পরিদৃষ্ট হয়। এ অধ্যায়ে বিষয়বৈচিত্রের ওপর নির্ভর করে চারটি ভাগে বিভক্ত আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলোর রূপ-রীতি উপরিল্লিখিত নাট্যবৈশিষ্ট্যের আলোকে প্রকাশের কালক্রম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আলোচনায় সচেষ্ট থাকব।

ক. স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়ভিত্তিক :

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সুবচন নির্বাসনে*, *এখন দুঃসময়*, *কোকিলারা*, ও *মেরাজ ফকিরের মা* প্রভৃতি নাটক যুদ্ধোত্তর সামাজিক অবক্ষয়ের পটভূমিতে রচিত। এ পর্যায়ে তাঁর রচিত স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়ভিত্তিক এ চারটি নাটকের রূপ-রীতি ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষিত হলো :

সুবচন নির্বাসনে

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে দৈহিক ও বাচনিক নাট্যক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন সৃষ্টি হয়। '*সুবচন নির্বাসনে* যখন তপন বাবার বন্ধুকে পিস্তল দিয়ে গুলি করতে চায় তখন অ্যাকশন এবং পুলিশের কাছে তপনকে ধরিয়ে দেয়া ঘটনাটি রিঅ্যাকশন হয়।'[১১] এ নাটকে আদর্শ শিক্ষক বাবার সন্তানেরা চিরাচরিত মূল্যবোধগুলোর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে জনতার আদালতে বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে নাট্যদ্বন্দ্ব শুরু হয়। বাবার সন্তানদের এমন বিরুদ্ধাচারণ মূলত সমগ্র সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে মানবিকতার সঙ্কটময় দ্বন্দ্ব। *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে ঘটনার বহুমাত্রিক ঘাত-প্রতিঘাত দর্শকদের মাঝে নাট্যোৎকণ্ঠা তৈরি করেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে বাবার সন্তান খোকন ও তপনের জেলে যাওয়া, মেয়ে রানুর স্বামীর সংসার ছেড়ে বাবার গৃহে প্রত্যাবর্তন ঘটলে দুষ্কৃতিকারী বস এবং কেরানির অজানা শেষ পরিণতি নাট্যশ্লেষ তৈরি করে।

সুবচন নির্বাসনে নাটকের কাহিনি ঘটনার পরস্পর সংযুক্তকরণ করে একটি সরল বৃত্তে (Plot) রচিত হয়েছে। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *সুবচন নির্বাসনে* নাটক রচনায় গুস্তাফ ফ্লেতাগ বা ভরত নাট্য কিংবা অ্যারিস্টটলের Anatomical method বা শরীর সংস্থান নীতিও তিনি অনুসরণ করেননি। তবুও *সুবচন নির্বাসনে* নাটকের ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে উৎকণ্ঠাকে কখনো শিথিল করে না। এ নাটকে

দৃশ্য বিভাজন নেই। কেবল মঞ্চে আলোকসম্পাতের মধ্য দিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে ঘটনা পরম্পরায় কাহিনি গতিশীল হয়েছে। *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে অঙ্ক বিভাজন নেই, তবে স্কুল শিক্ষক বাবার তিন সন্তানের জীবন থেকে নীতিবোধগুলো তিরোহিত হওয়ার ঘটনা আধুনিক তৃতীয়াঙ্ক নাটকের মতো চিত্রিত হয়েছে। আর নেপথ্যে বিচারক সংস্কৃত নাটকের সূত্রধরের মতো সামাজিককে মূল কাহিনির সঙ্গে নিবিড় করে তুলেছেন। এ নাটকে কোনো ঐক্য নীতি মানা হয়নি।

সুবচন নির্বাসনে নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে সমকালীন সামাজিক বিনষ্টের পটভূমিতে চিরাচরিত মূল্যবোধে বিশ্বস্ত একজন আদর্শ স্কুল শিক্ষক বাবার পারিবারিক জীবনচিত্রকে কেন্দ্র করে তিনটি অংশে। এ প্রসঙ্গে রামেন্দু মজুমদার বলেন, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে আবদুল্লাহ আল-মামুন *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪) নাটকটি রচনা করেন।'[১২] এ নাটকের কাহিনির প্রথম অংশের শুরুতে আদালতের কাঠগড়ায় পিতা-পুত্রের যুক্তিতর্কের মাঝে মঞ্চে আলোকসম্পাতের মধ্য দিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে দৃশ্য পরম্পরায় উঠে আসে যুদ্ধোত্তর এক সমাজসত্য। আমরা মঞ্চে দেখতে পাই, খোকনের বি.এ ফলাফল শুনে তার শিক্ষক বাবা চিন্তিত, কারণ ছেলের এম.এ টা পাশ করতে হলে একটা পার্টটাইম চাকরি প্রয়োজন। আর খোকন ছোটবেলা থেকেই বাবার মুখে 'অভাব নেই' শুনে শুনে এতটাই অভ্যস্থ যে, হঠাৎ বাবার মুখে চাকরির কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাবার সততার বাণীর নিকট ক্রমে তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়। তবে তিনি চাকরি পাওয়ার জন্য ফার্স্ট ডিভিশনকেই উত্তম মনে করেন। যেমন :

খোকন : ফার্স্ট ডিভিশনটা পেলে চাকরি পাওয়া একটু সহজ হত।

বাবা : নিজের চেষ্টায় যা পেয়েছিস তার দাম দেবার মত লোক কি নেই ভেবেছিস? লোকে যতটা বলাবলি করে সংসারটা এখনও ততখানি রসাতলে যায়নি।[১৩]

কিন্তু সমাজ-সংসার বাস্তবে এতটাই রসাতলে গিয়েছিল যে, খোকন বাবার লেখা সুপারিশকৃত চিঠি নিয়ে জনৈক বস নামক তার বাবার এক বন্ধুর নিকট চাকরির জন্য গিয়ে বিফল হয়েছেন। অথচ খোকন বাড়িতে ফিরে এসে জানতে পারেন ঐ চাকরি তার থার্ড ডিভিশন পাওয়া বন্ধুর হয়েছে। একারণে খোকন প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আর কাহিনির দ্বিতীয় অংশে স্কুল শিক্ষক বাবার ছোট ছেলে তপন সমাজের অন্যায়-অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হতাশাজনিত কারণে বিদ্রোহে জ্বলে ওঠেন। প্রতিবাদী তপন সমাজের প্রচলিত নিয়ম ভেঙে পিস্তল উঁচিয়ে 'বস' নামক সমাজপতিদের টাকার ব্রিফকেস নিয়ে উধাও হয়েছেন। অভাবী জীবনের কষ্ট দূর করতে অনিয়মের মধ্য দিয়ে উপার্জিত টাকাগুলো তার বাবাকে দিয়ে

চিরন্তন সুবচনগুলোর প্রতি কটাক্ষ করেছেন। একারণে ক্রোধে জ্বলে ওঠেন চিরায়ত আদর্শের প্রতীক বাবা। কিন্তু সেই আদর্শের ভারে চাপাপড়া প্রকৃত সমাজসত্য তপনের অন্তর্দাহ সংলাপ থেকে স্পষ্ট ওঠে। যেমন :

> বাবা, তোমার বড় ছেলে জেলে গেছে। বড় ভালো ছেলে ছিল– সবাই জানত। কিন্তু জেল হলো কেন? লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই– ভাইয়া কি গাড়ি চড়েছে রে আপা? কি মডেলের গাড়ি? টু ডোর না ফোর ডোর? অ্যাঁ?[১৪]

তৃতীয়াঙ্ক নাটকের মতো *সুবচন নির্বাসনে* নাটকের কাহিনির তৃতীয় অংশে নববধূ রানু সমকালীন পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার প্রচলিত প্রথানুসারে স্বামীর সংসারে সংসারধর্ম শুরু করেন। কিন্তু রানুর ছাপোষা কেরানি স্বামী একদিন গৃহে ফিরে বসকে আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে চাকরি রক্ষার নিশ্চয়তার দায়িত্ব কৌশলে স্ত্রী রানুকে অর্পণ করেন। রানু স্বামীর চাকরি রক্ষায় বসকে পরম আদরে গৃহে গ্রহণ করেন। কিন্তু রানু জানতেন না যে, স্বামীর চাকরি রক্ষায় বসকে তার দেহ উৎসর্গ করতে হবে। আর যখন আপ্যায়নের অর্থ বুঝতে পারলেন তখন ভণ্ড বসের করাল বাহুগ্রাস থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রবল আত্মসম্মানী রানু ধিক্কার জানান :

> আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান। ভেবেছেন স্বামীকে চাকরি দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছেন? আপনি ভালয় ভালয় চলে যান বলছি। আমার স্বামী এসে পড়লে–[১৫]

এমন সময় কেরানি মদের বোতল নিয়ে বাড়িতে ফিরে মদ ঢেলে বসকে অশালীন আপ্যায়নের ইঙ্গিত দিলে রানু বাবার শেখানো সুবচনগুলো পদদলিত করে ঘর-সংসার ছেড়ে বাবার বিরুদ্ধে গণ-আদালতে ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করেছেন। আর একজন আদর্শের প্রতিভূ বাবা সমকালীন সমাজজীবনে চিরায়ত সুবচনগুলোর প্রতিফলন দেখতে না পেয়ে বিচারকের কাছে বিচার চাইছেন। তখন বিচারক রায় ঘোষণার ভার জনতাকে অর্পণের মধ্য দিয়ে এ নাটকের কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

সুবচন নির্বাসনে নাটকে নেপথ্যে বিচারক, বন্ধু ও ভঙ্গিসর্বস্ব পুলিশ ইন্সপেক্টরসহ মোট চরিত্র সংখ্যা নয়টি। তবে 'নাটকের চরিত্রগুলি রূপকাশ্রয়ী, সংলাপ তীক্ষ্ম, বক্তব্য ইঙ্গিতময়। সমকালীন দুর্নীতিগ্রস্ত বিপন্ন সমাজকে নানা দিক থেকে প্রতিনিধিত্ব করছে এ চরিত্রগুলি।'[১৬] এ নাটকের প্রধান চরিত্র বাবা। ব্যক্তিজীবনে তিনি শাশ্বত মূল্যবোধে আস্থাশীল একজন আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষক। বাবা প্রধান চরিত্র হলেও দৃশ্যত তিনি নাট্য-কাহিনির পটপরিবর্তন কিংবা ঘটনার সংশ্লেষণে মুখ্য নন। বাবাকে কেন্দ্র করেই নাটকের সমগ্র বিষয়বস্তু বিস্তৃত হয়েছে। তিনি ছোটবেলা থেকেই তার তিন সন্তানকে শাশ্বত

মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শের 'সুবচন' শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সমাজবাস্তবতার সঙ্গে সেই আদর্শের খাপ খাওয়াতে না পেরে তার সন্তানরা তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। বাবা তাতে সামান্য পরিমাণে বিচলিত হননি। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে শাশ্বত সত্য সুবচন আদালতেও উচ্চারণ করেছেন। বাবার সংলাপে :

> আমি সারাজীবন ধরে যা সত্য বলে জেনেছি, তাই শিখিয়েছি আমার সন্তানদের।[১৭]

আদর্শ স্কুল শিক্ষক বাবা সারাজীবন তার সন্তানদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন। বড় ছেলে খোকন বি. এ সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করে, ফার্স্ট ডিভিশনের প্রত্যাশা করলে বাবা তাকে নিজের অর্জন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলেছেন। ছোট ছেলে তপনের চঞ্চল গতিবিধি দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছেন। পিতৃত্বের দায় থেকেই কন্যা রানুর বিবাহের কথা পাকা করে এসেছেন। ঐদিনে সন্ত্রাসী ছেলে তপন বাড়িতে ফিরলে মেয়ের মঙ্গলের কথা ভেবে বাবা তাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বলেছেন। হতভাগা তপন টাকার তাড়া বের করলেও আদর্শ বাবাকে তার সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি অসৎগামী তপনকে পুলিশের হাতে সোর্পদ করেছেন। বাবার এই পদক্ষেপ একজন আদর্শের প্রতিভূ স্কুল শিক্ষকের প্রকৃত চরিত্র। কিন্তু সন্তানদের জীবনের ব্যর্থতায় বাবা অপমানিত হননি, অপমানিত হয়েছে শাশ্বত সত্যগুলো। বাবার সংলাপে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যেমন :

> আসলে ওরা কেউ তো অপমানিত হয়নি। অপমানিত হয়েছি আমি। অপমানিত হয়েছে সেই সত্য যে সত্য যুগের পর যুগ পেরিয়ে আমার এই বুকে বাসা বেঁধেছিল। প্রমাণ হয়েছে আমি অপরাধী। আমাকে শাস্তি দিন। প্রমাণ করুন সত্য অচল হয়ে গেছে।[১৮]

খোকন *সুবচন নির্বাসনে* নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র। তিনি বি.এ পাশ, সৎ ও শিক্ষিত যুবক। তিনি বাবার শেখানো 'সততাই মহৎ গুণ' -এই নীতিশিক্ষার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। বি.এ পাশ করলেও এম.এ-টা পাশ করার ইচ্ছা এই মধ্যবিত্ত যুবকের। স্কুল মাস্টার বাবার অভাবের সংসারে এম.এ পড়তে হলে তাকে অবশ্য একটা পার্টটাইম চাকরি করতে হবে। আর পার্ট টাইম চাকরি করতে খোকনের আপত্তি নেই, কিন্তু 'সংসারে অভাব নেই'; শুনে শুনে অভ্যস্ত খোকন বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হয়ে অনেকটা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। একারণে বাবাকে তিনি বলেন :

> চাকরি না হয় করব, আমার মত কত ছেলেই তো পার্ট টাইম চাকরি করে লেখাপড়া করছে। কিন্তু একটা কথা বাবা, বুদ্ধিশুদ্ধি হবার পর থেকেই তোমার মুখ থেকে একটা কথা বিরামহীনভাবে শুনে আসছি। অভাব– নেই, কেন? তোমার অভাব কেন? নেই কেন? তুমি আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর শিখিয়েছ। কিন্তু এসবের উত্তর শেখাওনি।[১৯]

খোকনের হৃদয়ে ক্ষোভ থাকলেও বাবার প্রতি বীতশ্রদ্ধ নন। তিনি অভাবী সংসারে পড়ালেখার ব্যয় সংকুলানের জন্য বস নামে উচ্চ পদস্থ এক কর্মকর্তার নিকট বাবার চিঠি নিয়ে যান। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে বন্ধুপুত্র হয়েও বসের কেরানি 'ক্যাশ ঢালো' অর্থাৎ ঘুষের প্রস্তাব দিলে বাবার আদর্শের ব্রতী সত্যবাদী খোকন তা প্রত্যাখান করেন। একারণে খোকন প্রতিবাদ করে জেল খাটলেও তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তাকে এ নাটকে প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল করেছে।

সুবচন নির্বাসনে নাটকে তপন প্রতিবাদে প্রখর শক্তিশালী একটি চরিত্র। বড় ভাই খোকন জেলে যাবার পর থেকে তপন যেন কেমন অস্থির সময় কাটান। একটা প্রতিশোধের আগুন বুকে ধারণ করে খোকন বাবার শেখানো আদর্শের সুবচনগুলোর প্রতি আস্থা হারিয়ে ছিনতাই-ডাকাতি কিংবা সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেন। আদর্শের রক্ষক বাবা এর প্রতিবাদ জানালে তপন সেই আদর্শকে ধিক্কার জানান। তপনের সংলাপে তার ব্যক্তি হৃদয়ের প্রতিধ্বনিত ক্ষোভ-দ্রোহ হচ্ছে :

> হ্যাঁ, বলতে চাই, তোমার বাড়ির এ পরিবেশ মিথ্যা– এ আশ্রয় দুর্বল– লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই– ফুঃ – গাড়ি চড়বে থার্ড ডিভিশন পাওয়া ভাইয়ার বন্ধুরা, গাড়ি চড়ব আমরা–[২০]

তপন লেখাপড়া না করেও গাড়িতে চড়তে ছুটতে থাকেন। হাতে তুলে নেন অস্ত্র। তপনের এ প্রতিবাদ–বিদ্রোহ মূলত বাবার শেখানো ভাবসত্যের সঙ্গে সমাজবাস্তবতার অসঙ্গতি থেকে উৎসারিত হয়েছে। নির্দোষ বড় ভাই খোকন জেলে যাবার পর থেকে তপন প্রচলিত সমাজের নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। বস চরিত্রের মতো দুষ্ট মানুষরা যখন সমাজ শৃঙ্খলাকে দুর্নীতির বৃত্তে আবদ্ধ করেন তখন তপনরা উচিত-অনুচিত বিচারে অনুচিতকেই ধারণ করেন। প্রতিদিন ব্যাংক-অফিস ডাকাতি করা তপনের বৃত্তি হয়ে ওঠে। তাই তপনের সংলাপে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অনিয়মগুলোর প্রতি প্রতিবাদী-বিদ্রোহ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যথা:

> আমার বড় ভাই আপনার কাছে চাকরি চেয়েছিল। স্কুল-মাস্টার খন্দকার সাহেবের বড় ছেলে। এই টাকার জন্যই চাকরি চেয়েছিল। আপনি সেটা দেননি। সে জন্য আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আপনি আপনার নিয়মে কাজ করেছেন। আমিও আমার নিয়মে কাজ করছি।[২১]

একসময় দুর্দমনীয় তপন নিজেই নিজের বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। বাবার শেখানো আদর্শ, পিতৃভক্তি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা মোছানোর মতো হৃদয় থেকে মুছে ফেলেন। বাস্তবে এ চরিত্র আমাদের বড্ড বেশি চেনা। কারণ 'স্বাধীনতা উত্তর নষ্ট সময়ের ভ্রান্ত মূল্যবোধের শিকার এক তরুণ। নষ্ট সমাজের নির্মম বাস্তবতা বিদ্রোহী করে তোলে তপনকে।'[২২]

এ নাটকে একমাত্র নারী চরিত্র রানু সহোদর খোকন ও তপনের মতো শিক্ষক বাবার আদর্শ শিক্ষায় বিশ্বস্ত। তিনি বাবাকে কথা দেন, 'তুমি দেখো বাবা তোমার প্রতিটি কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব'। একারণে সংসারব্রত, পতিপরায়ণা রানু কেরানি স্বামী অফিস থেকে ফিরলে জুতা খোলার জন্য এগিয়ে আসেন। কেরানি স্বামীর বসকে আপ্যায়নে রানু সরল মনে একজন বাঙালি নারী হিসেবে অতিথি সেবার সমস্ত আয়োজন করেন। কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের অন্তরালে বসকে দেহ বিনিময়ে কেরানি স্বামীর চাকরি রক্ষার অর্থ উদ্ধার করতে পেরে রানু আত্মমর্যাদায় মহীয়ান হয়ে ওঠেন। রানু যখন জোর করে দুষ্ট বসের ছোবল থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভালয় ভালয় বেরিয়ে যেতে বলেন, তখন তার ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য তাকে মহিমান্বিত করেছে। বসের প্রতি রানুর প্রতিবাদী কণ্ঠে এই আত্মমর্যাদা প্রতিবিধানযোগ্য :

> এই লোকটা– এই বাজে লোকটা আমার হাত ধরেছিল। জানো ও আমাকে অপমান করেছে। ও বলে কি, তুমি অপদার্থ– তোমার নাকি কোনো যোগ্যতা নেই– তোমার এফিসিয়েন্সির চেয়ে আমার– আমার– শোন, এ রকম একটা জঘন্য চরিত্রের লোকের চাকরি করার কোনো দরকার নেই।[২৩]

এরপর ব্যক্তিত্বহীন ছাপোষা কেরানির ঘর ছেড়ে রানু বাবার সংসারে পা বাড়ান। রানু চরিত্রের এই প্রতিবাদী চেতনা প্রখর, কিন্তু পরিণত নয়। কারণ তার প্রতিবাদ সমকালীন সমাজবাস্তবতার বিরুদ্ধে উচ্চারণ মাত্র, এ পরিবর্তন প্রভাবী নয়।

সুবচন নির্বাসনে নাটকের বস চরিত্রটি সমকালীন অবক্ষয়িত সমাজের বিমূর্ত প্রতীক– এক ধরনের 'টাইপ' চরিত্র। বস সামাজিক নীতি-নৈতিকতা, আদর্শবোধ-সততা সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নারীর মর্যাদাহানি প্রভৃতি অপকর্মের উৎসবে মেতে ওঠেন। অধীনস্ত কর্মচারী এমনকি কর্মচারীর স্ত্রী পর্যন্ত তার নিকট নিরাপদ ছিলেন না। তিনি এতটাই নিচু চরিত্রের ছিলেন যে চাকরির নিরাপত্তার হুমকি দিয়ে কেরানির স্ত্রী সন্তানতুল্য বন্ধু-কন্যা রানুর দিকে লাম্পট্যের হাত বাড়াতে তার সংকোচে বাঁধেনি। নানাভাবে তিনি রানুর চেহারার সৌন্দর্য নিয়ে প্রশংসা করে মন গলাতে চেয়েছেন। কিন্তু রানু এর প্রতিবাদ জানালে লম্পট বসের সংলাপে তার চরিত্রের কদর্য রূপ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন :

> কিন্তু তোমার বেলায় আমি যদি বলি, তোমার স্বামীর এফিসিয়েন্সির চেয়ে তোমার সৌন্দর্যকেই আমি বেশি কনসিডার করি, তা হলে?[২৪]

বস্তুত বস চরিত্র কদর্যে ভরা, নিম্নব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ।

এ নাটকে কেরানি অর্থনৈতিক বিবেচনায় একজন নিম্নবর্গীয় মেরুদণ্ডহীন মানুষ। কেরানি সবসময় নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় বসের সকল অপকর্ম সম্পাদনে বিশস্ত হিসেবে কাজ করেন। কেরানি চরিত্রের মূল রহস্য সমকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বসের কেরানি হিসেবে চাকরিটাই ছিল তার জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। একারণে জীবন বাঁচার তাগিদে চাকরি রক্ষায় বসের যৌন-লালসা চরিতার্থ করতে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে তুলে দিতে তিনি দ্বিধান্বিত হননি। কিন্তু সতী স্ত্রী এর প্রতিবাদ করলেও মেরুদণ্ডহীন কেরানি বলেছেন :

> তাতে কি হয়েছে? চাকরি হারানো চলবে না। জানো গাঁটের পয়সা খরচ করে এ– দু'টো বোতল আমি কিনে এনেছিলাম ওই বাজে লোকটার জন্যই। আমার আশা ছিল, তুমি নিজ হাতে এখান থেকে মদ ঢেলে দেবে। তাতে কিচ্ছু যাবে আসবে না। কিন্তু তাতে আমার চাকরি পাকা হবে।[২৫]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সুবচন নির্বাসনে* নাটকের বিষয়, কাহিনি ও চরিত্র চিত্রণে সংলাপগুলো ক্ষুরধার-শিল্পবোধসম্পন্ন হয়েছে। এ নাটকের সংলাপগুলো পাত্র-পাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা থেকে সংগৃহীত, সংক্ষিপ্ত অথচ বাস্তবানুগ। যেমন :

> রানু : ওর চাকরির সঙ্গে আমার হাত ধরার সম্পর্ক কি? ছাড়ুন–
>
> বস : চাকরি থাকবে না।
>
> রানু : না থাকুক।
>
> বস : না খেয়ে থাকবে।
>
> রানু : থাকব।[২৬]

সুবচন নির্বাসনে নাটকের 'ভাবনা' কালের অবক্ষয়ের পটে সমাজজীবন থেকে চিরাচরিত সত্যগুলো হারিয়ে যাওয়ার বৈনাশিকতা থেকে উৎসারিত হয়েছে। এ নাটকের ভাবনা স্কুল শিক্ষক বাবা ও তার সন্তানদের চরিত্রে ও সংলাপের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এ নাটকের 'দৃশ্য' সজ্জা অসাধারণ। নাটকের ঘটনার পটভূমি, আহার্য বা পাত্র-পাত্রীদের পরিচ্ছদাদির রূপে ও ক্রিয়াকলাপে সমাজের অবক্ষয় সুপরিকল্পিতভাবে ফুটে ইঠেছে। *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে সঙ্গীতের কোনো উপাদান নেই।

এ নাটকে রূপক-উপমা, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারও লক্ষণীয়। যেমন : 'সততাই মহৎ গুণ', 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে', 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই', 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' ইত্যাদি। কিন্তু এ নাটকে মানবজীবনের পরিপূর্ণ কোনো চিত্র নেই। তবুও 'গভীর জীবনবোধ বা চরিত্রের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এ নাটকে তেমনভাবে লক্ষ্য করা না গেলেও

ঘটনা বিন্যাসের সাবলীলতায়, চরিত্রের তীক্ষ্ম তীব্র সংলাপ উচ্চারণে স্বাধীনতা উত্তর সময়ে রচিত নাট্য ধারায় *সুবচন নির্বাসনে* এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।'[২৭] নাট্যকার আবদুল্লাহ-মামুন এ নাটকে প্রকারান্তরে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধগুলো শাশ্বত রূপদানে উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন।

এখন দুঃসময়

এ নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন চুয়াত্তর সালের বন্যাকবলিত মানুষের জীবনবাস্তবতাকে আঙ্গিক বা বাচনিক নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত করেছেন। *এখন দুঃসময়* নাটকে মুন্সি বন্যায় আক্রান্ত অনাহারি জরিনাকে ভাতের জন্য 'এক জায়গায়' যাওয়ার আহ্বান জানালে পূর্ণাঙ্গ নাট্যক্রিয়া শুরু হয়। আবার একদিকে জরিনার জন্য প্রেমিক সোনার হৃদয়-কাতরতা, অন্যদিকে দেহপোজীবিনী হওয়ায় জরিনাকে গ্রহণ করতে সোনার অস্বীকৃতি কিংবা শোষক-প্রতারক বেপারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নাট্যদ্বন্দ্বকে প্রকট করে তোলে। সোনা ও বেপারির সংলাপে চিত্রিত এ নাট্যদ্বন্দ্ব প্রণিধানযোগ্য :

সোনা : বেপারি বন্যার পানিতে মানুষ যখন না খাইয়া মরে– তুমি তখন ক্ষেত খামার কিনতে চাও, না?

বেপারি : ঠিক আছে, এই ল' টেকার থলি। পুরা সাত হাজার টেকা আছে। যা লইয়া আয় ডিঙি। শিগগির যা হালার পো।'[২৮]

কিন্তু সোনা বেপারিকে বাঁচানোর প্রস্তাবে রাজি না হলে নাট্যদ্বন্দ্ব উত্তুঙ্গে বিরাজ করে। বস্তুত এ দ্বন্দ্ব *এখন দুঃসময়* নাটকের সমগ্রে দর্শক চিত্তে একটার পর একটা ঘটনার জন্য উৎকণ্ঠা বা নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে। যেমন: সোনা জরিনার পূর্ব-পরিচয় সম্পর্কে বেপারির জেনে ফেলা, বানভাসি মানুষকে দেখতে স্বেচ্ছাসেবক দলের আগমন, নেপথ্যে জনতার বিদ্রোহ, সোনা-বেপারির বাক-বিতণ্ডা ইত্যাদি ঘটনা।

এখন দুঃসময় নাটকে নাট্যশ্লেষ লক্ষণীয়। যেমন: বেপারি তার আস্তানায় মুন্সিকে নিয়ে মদ্য পান করতে চান। কিন্তু মুন্সি মদ পানে অস্বীকৃতি জানালে দর্শক মনে নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি করে। আবার নাটক শেষে বেপারি তার পাহারাদার সোনাকে গুলি করলে ঘটনার আকস্মিকতা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এ ঘটনা অতিনাটকীয়তার জন্ম দেয়।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখন দুঃসময়* নাটকের বিষয়বস্তু বা প্লট নির্মাণে অভিনবত্ব নেই। 'বন্যা দুর্গত মানুষের অসহায়ত্ব, দুর্বৃত্ত লম্পট মজুতদার-কালোবাজারিদের আনন্দ উল্লাস ও সর্বশেষে এই অন্যায়কারীর চরম শাস্তি এই নিয়ে হল নাট্য প্লট।'[২৯] নাট্যকার এ নাটকের আখ্যান ভাগ আধুনিক রীতিতে দৃশ্যান্তর ঘটিয়ে পঞ্চাঙ্ক নাটকের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ করেছেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখন দুঃসময়* এক অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক হলেও সময়, স্থান ও ঘটনা এই তিন ঐক্যনীতি সরলভাবে মেনে চলা হয়েছে। এ নাটকে বন্যা পরিস্থিতির মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেপারি, সোনা, জরিনা, মুন্সি কিংবা অন্যান্য প্রত্যেকটা চরিত্র নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমায় নির্দিষ্ট সময়ে এক অখণ্ড জীবনরূপকে নাট্যঘটনায় মূর্ত করে তুলেছে।

এখন দুঃসময় নাটকের কাহিনিভাগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত বাংলাদেশের বন্যাকে পুঁজি করে বন্যার্ত ও মজুতদার শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রলয়ংকরী বন্যার দুর্যোগমুহূর্তে কালোবাজারি-আড়তদার প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুত বাড়িয়ে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছেন। নাগরিক জীবনে পণ্যের বাজারের এই অস্থিরতা একদিকে শহরে দ্রব্যমূল্যের বাজারে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে মাচার ওপরে আশ্রিত ক্ষুধার্ত জরিনার জীবনকে কেন্দ্র করে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। তাই ক্ষুধার্ত জরিনাকে গ্রাম্য টাউট মুন্সি খাবারের সন্ধান দিলে কাতর জরিনা যেন স্বপ্নোত্থিত হয়ে মুন্সির পথ ধরে চলেছেন :

> যামু চাচা যামু। তুমি আমারে পথ দেখাও। খইয়ের মতন ফুটতাছে। হাজারে হাজারে– লাখে লাখে একবার হুন চাচা, আমাগো বাড়িতে বাবায় ব্যাপার দিছিল– ভাতের ডেকচি বইছিল এক দুই তিন চাইর– পাঁচ– ছয়– সাত–[৩০]

এরপর জরিনা মুন্সির পথ ধরে মজুতদার দুর্বৃত্ত বেপারির আস্তানায় আশ্রয় নেন। সেখানে সোনা ধন-সম্পদ ও জরিনার পাহারা দেন। বেপারি বন্যার পানি বাড়া-কমার সঙ্গে তার মজুতদারি ব্যবসায়ের হিসাব কষতে থাকেন। এমন সময় বেপারির আস্তানায় মুন্সি প্রবেশ করে মজুতদারি ব্যবসায়ের হিসাবে নতুন মাত্রা যোগ করেন। বেপারি মুন্সিকে 'বিজিনেসম্যানগো'র 'মওকা' বুঝিয়ে অসহায় মানুষের জমি-জমা, সম্পদ লুণ্ঠনের পরিকল্পনা করেন। এদিকে জরিনার ঘুম ভেঙে গেলে আবার হাসতে থাকেন। 'বেহায়া বেশরম' বলে সোনা তর্জন-গর্জন শুরু করেন– 'আস্তা বাজাইরা' বলে জরিনাকে গালি দেন। জরিনা আবার সংসার গড়ার সাধের কথা জানালে ফ্ল্যাশব্যাকে তাদের অতীত প্রেমের এই করুণ পরিণতি উন্মোচিত হয়েছে। এদিকে বেপারি টাকা গোনেন আর সোনার কাছে মালের নৌকার খবর নিয়ে জরিনাকে গঞ্জে দোতালা দালান বাড়িতে টাকার গদির মধ্যে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। কারণ আগেকার দিনের রাজা-বাদশাহদের মতো বেপারির একজন 'বান্দা মানুষ' রাখার ইচ্ছা। কিন্তু জরিনার মন গলাতে না পেরে প্রেম নিবেদন করেন। আর জরিনা বেপারির প্রেমে অস্বীকৃতি জানান। জরিনা ও বেপারির সংলাপে এই অসম প্রেমের পরিণতি হচ্ছে :

জরিনা : দ্যাহ্ মিয়া, বুরা মাইনষের মুখে পিরিতের কতা হুনতে এট্টুও বালো লাগে না। গতরে ঝাটার বাড়ি পড়ে।

বেপারি : পিরিত করতে আবার বয়স লাগেনি রে পাগলি। তরে আমি গঞ্জে লইয়া যামুই যামু। খালি মালের নৌকাটা লাগদে দে।[৩১]

বান বাড়ে কিন্তু বেপারির মালের নৌকা আসে না। আসে মুন্সির– গ্রামের বন্যার্ত মানুষের সোনা-দানা, জমি-জমার খবর নিয়ে। এমন সময় একদল ত্রাণকর্মী এসে বেপারি, মুন্সি, সোনা ও জরিনাকে বন্যার্ত মনে করে ছবি তুলে– বন্যার্তদের অভিজ্ঞতা নিয়ে চলে যান। এদিকে জরিনা ও সোনার কথোপকথনে– জরিনার অতীত সংসার-জীবনের দুঃখময় স্মৃতি ভেসে ওঠে। চারদিক দিয়ে ধেয়ে আসা কালনাগিনীর ফণার মতো বানের জল আর জনতা যেন থিবির রাজা ইডিপাস কিংবা *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে মাতবরের মতো বেপারিকে ঘিরে ফেলেছেন। কিন্তু পাবলিক 'চষানো' পাবলিক চতুর বেপারি নিজেকে রক্ষার্থে জনগণের পক্ষ নিয়ে মুন্সিকে ধাওয়া করেন। জনতার রোষানলে মুন্সি নিস্তেজ হয়ে পড়লে বেপারি 'মালের নৌকার আশা বাদ' দিয়ে গঞ্জে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। বেপারি প্রাণে বাঁচার তাগিদে বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ– দুইশ, তিনশ, চারশ এভাবে সমস্ত টাকার থলি ও জরিনাকে দিয়ে সোনাকে গ্রাম থেকে একখানা ডিঙি আনতে অনুনয় করেন। কিন্তু সোনা 'না' বলে প্রতিবাদে জ্বলে উঠলে ক্ষুব্ধ বেপারি সোনার ওপর গুলি চালান। সোনাও গুলিবিদ্ধ বুকে হাত চেপে ধরে বেপারিকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বন্যার পানিতে ফেলে চুবিয়ে মারেন। সোনার দ্রোহ থেকে বন্যার্ত জরিনাদের জন্য রচিত হয় সমতা। সোনার সংলাপে নাট্যকাহিনির পরিসমাপ্তিতে এ সমতা রচিত হয় যেমন :

জরিনা– বেপারি আমারে গুলি কইরা মারল। আর আমি বেপারিরে বানের পানিতে ডুবাইয়া মারলাম। সমানে সমান তাই না রে।[৩২]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখন দুঃসময়* নাটকে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো প্রধান চরিত্র নির্ণয় করা যায় না। এ নাটকের মোট চরিত্র সংখ্যা এগারোজন। মুখ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে– সোনা, জরিনা, বেপারি, মুন্সি এবং গৌণ চরিত্রগুলো প্রথম নাগরিক, দ্বিতীয় নাগরিক, প্রথম বন্যার্ত, প্রথম করিতকর্মা, দ্বিতীয় করিতকর্মা, মহিলা করিতকর্মা ও দ্বিতীয় বন্যার্ত। তবে নাগরিক চরিত্র কমবেশিও হতে পারে। এছাড়া নেপথ্যকণ্ঠে জরিনার বাবাও একটা চরিত্র।

এখন দুঃসময় নাটকে একমাত্র নারী চরিত্র জরিনা। ভাগ্যাহত অসহায় এক নারী জরিনা সর্বগ্রাসী বন্যার করাল থাবায় সর্বস্ব হারিয়ে ক্ষুধা নিবারণের তাগিদে অসহায়ের মতো মুন্সির সঙ্গে বেপারির যৌন-

লালসার পথে পা বাড়ান। কিন্তু বেপারির আস্তানায় পূর্ব প্রেমিক সোনাকে দেখে সংসার জীবনের স্বাদ দেহপোজীবিনী জরিনাকে আত্ম-অধিকার ও ভোগের আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্জ্বলিত করে তোলে। কিন্তু তার এই পেশাগত জীবনের জন্য তিনি মোটেও দায়ী নন। সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা একজন গৃহলক্ষ্মী জরিনাকে জীবনের করুণ পথে টেনে এনেছে। জরিনার মনে সোনার প্রতি উদ্‌গারিত ক্ষোভ থেকে তা জানায় যায়। যেমন :

> আমার সংসার করতে সাধ যায় না? সোয়ামি আমার হাল গরু লইয়া ক্ষেতে যাইব– পোলা দিনভর আঙিনা দিয়া দৌড় পারব– আমি দুই চক্ষু ভইরা দেখমু। [...] বারে বারে কেন আমি ভাইস্যা যামু? কেন আমার গাও গতর উদাম থাকব? বানের পানি ঠেকাইতে পারস না? ক্ষেতের ধান বাঁচাইতে পারস না?[৩৩]

জগৎ-সংসারে জরিনা একজন অধিকার বঞ্চিত মানুষ। যুদ্ধোত্তর পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি পুরুষের ভোগবাদী লেলিহান শিখায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তিনি যেন এ সমাজের শুধু একজন ক্রীড়নক মাত্র। একারণে ভালোবেসেও দ্বিধান্বিত জরিনা একদিন বাবার সুরে সুর মিলিয়ে চাল-চুলোহীন সোনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। বাবার মৃত্যুর পর সতীনের ঘরে সংসার ভেঙে গেলে ক্ষুধার জ্বালায় রক্ষিতা জীবন বেছে নেন। সেখানে সোনাকে দেখে আবার তার সংসার গড়ার সাধ জাগে। বস্তুত জরিনার হৃদয় বারবার সমাজ-বদলের ঢেউ তরঙ্গে অর্থের মূল্যের মতো ওঠানামা করে। কখনো সোনাকে ভালোবেসে আকড়ে ধরে রাখতে পারেন না; কখনো বা ভাতের জন্য দেহপোজীবিনী হয়েও বেপারির প্রেমকে পদাঘাত করে প্রচণ্ড আত্মসম্মানে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। জরিনার সংলাপে তার এই করুণ জীবনচিত্র প্রণিধানযোগ্য :

> আমি দোকলা কই পামু রে। আমার কপাল তো হেই কবেই পুড়েছে। বাপ মইরা গেল। সৎমা জোর কইরা পাঠাইল সতীনের ঘরে। হেই ঘরেও আমি থাকতে পারলাম না। সোয়ামি খেদাইয়া দিল। পেটে বাচ্চা লইয়া অকূলে ভাসলাম।[৩৪]

বারবার আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত জরিনা যা কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছেন তা-ই তাকে বিমুখ করেছে। প্রেম, সংসার, সন্তান এমনকি লম্পট বেপারির নিকট সম্ভ্রম হারানোর বেদনাও জরিনাকে জর্জরিত করেছে। বস্তুত 'একদিকে সম্ভ্রম রক্ষার অবচেতন ইচ্ছা, অন্যদিকে ক্ষুধা ও হারানো সন্তানের দুর্দম শোকের দ্বন্দ্বে জরিনা চরিত্রটি অনন্য।'[৩৫]

কালু বেপারি *এখন দুঃসময়* নাটকে এক অর্থে কেন্দ্রীয় চরিত্র। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা কবলিত মানুষ যখন খাদ্য ও নিরাপত্তার জন্য রাস্তা কিংবা উঁচু জায়গায় মাচা তৈরি করে আশ্রয় নেন, তখন এক

শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী তাদের মজুতকৃত পণ্য-সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। কালু বেপারি এই শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। তবে কালু বেপারি শুধু বেপারি নামেই এ নাটকে পরিচিত। বন্যায় আক্রান্ত গ্রামবাংলায় মজুত পণ্যের পসার করতে কালোবাজারি বেপারি গঞ্জ থেকে একেবারে গ্রামে আগমন করেন। বন্যা দুর্গত মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে নগদ অর্থ উপার্জনে বেপারি শোষকের কৌশল বা ব্যবসায়ের 'টিরিক্স' অবলম্বন করেন। বেপারির সংলাপে তার মজুতদারি-কালোবাজারি ব্যবসায়ের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। যেমন :

> এই যে এইবার মাল আইতাছে নৌকায়– এর মইদ্যে টিরিকসটা কী? চাইরপাশে বানের পানি। মানুষ ডুবতাছে। বেকতেই নিজেরে বাঁচাইতে ব্যস্ত। কার ঠেকা পরছে কোন নৌকার মইদ্যে কি আইতাছে খোঁজ লইতে! অহন টিরিকসটা বুজলা রে হালার পো?[৩৬]

বেপারি বন্যার্তদের নিকট মজুত চাল-ডাল-খাবার বিক্রি করে যে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তা তাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। একারণে তিনি জরিনাকে উপ-পত্নী বা রাজদাসী করে রাখতে প্রেমিকের অভিনয় করেন। বেপারি শুধু শোষক শ্রেণির একজন প্রতিভূই নন; বরং চতুর রাজনীতিক, ধূর্ত কূটনীতির মূর্ত প্রতীক। বন্যা কবলিত এলাকার জনগণ মুন্সির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলে তিনি নিজেকে বাঁচাতে কৌশলে জনগণের পক্ষ নেন। আবার চারদিক থেকে বন্যার পানি ধেয়ে আসলে বেপারি তার সমস্ত টাকা– এমনকি সোনার পূর্ব প্রেমিকা জরিনাকে দেয়ার বিনিময়ে পাহারাদার সোনার মাধ্যমে গঞ্জে খবর পাঠানো কিংবা গ্রাম থেকে ডিঙি আনতে নিরস্ত হয়ে অন্যপথ ধরেন। তখন নিষ্ঠুর বেপারি নিজের অস্তিত্বের জানান দেন। বেপারির সংলাপে তার চরিত্রের নিষ্ঠুরতা :

> দ্যাখরে হালার পো– এইবার কিন্তু আমি অন্যপথ ধরুম। বেকায়দায় ফালাইয়া আমারে ডুবাইয়া মারবা আর আমি চক্ষু মেইল্যা দেখুম, আমারে হেই বেক্কল পাও নাই।
>
> [...]
>
> আমি তরে গুল্লি করুম।[৩৭]

অতঃপর বেপারি সোনাকে গুলি করেন। কিন্তু শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণির প্রতিনিধি সোনা ক্ষুব্ধ প্রতিশোধের দরুণ বেপারিকে বানের পানিতে চুবিয়ে মারেন।

সোনা *এখন দুঃসময়* নাটকে নায়কোচিত চরিত্র। গ্রাম্য সহজ-সরল সাধারণ এক যুবক। প্রতিবছর বন্যার সময় বেপারির আস্তানায় সোনা শুধু বিশ্বস্ত পাহারাদারের কাজ করেন। শুধু বিশ্বস্ততাই নয়– আত্মসম্মান, প্রেম, মানবিকতায় সোনা অতুলনীয়। বেপারির আস্তানায় সোনা পুরনো প্রেমিকা জরিনাকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে দেখে প্রচণ্ড ক্রোধে 'আস্তা বাজাইরা' আখ্যা দেন। আবার জরিনার

অসহায়ত্বের বর্ণনা শুনে প্রেম ও মানবিকতায় পরিপূর্ণ সোনা তাকে পালিয়ে যেতে বলেন। সোনার হৃদয়ের প্রেমের এই উচ্চারণ অকৃত্রিম। সোনার দারিদ্র্য, সামাজিক অবস্থান তার হৃদয়বৃত্তিকে ম্লান করতে পারেনি। কেননা যৌবনে জরিনাকে ভালোবেসে একদিন বিবাহ করে ঘর-সংসার করার স্বপ্ন রচনা করলেও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে জরিনার বাবা সোনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন দয়িতের নিকট সোনা তার হৃদয়ের বাসনা নিবেদন করে বলেছিলেন :

> শুন জরিনা, তর মনটা বর সাদাসিদা। আমারে ছাড়া অন্যের হাতে পড়লে তর কষ্ট অইব। চল এককাম করি, আজ রাইতে আমরা পালাইয়া যাই।[৩৮]

কিন্তু দয়িতের নিকট প্রত্যাখ্যাত হলে সোনার হৃদয় প্রেম ও দ্রোহের ক্রোধে জ্বলতে থাকে। বেপারির আস্তানায় জরিনাকে দেখে সোনার হৃদয় যেন পুরে ছারখার হয়েছে। বন্যায় সবকিছু হারিয়ে বেপারির দানা-পানি খেয়ে বাঁচলেও– বেপারির অন্যায় শোষণের প্রতিবাদে বন্যার পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোনার হৃদয় প্রতিশোধের লেলিহান শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। অসহায় মানুষের দুর্বলতাকে পুঁজি করে আড়তদার–মজুতদার, কালোবাজারি প্রমুখ লুণ্ঠনকারীকে প্রতিরোধ করতে সোনা সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। একারণে বেপারি বন্যার পানিতে ডুবে মরা থেকে বাঁচার জন্য সোনাকে অর্থের লোভ দেখালেও তিনি শোনেন না। বরং দ্রোহে জ্বলে উঠে নিষ্ঠুর বেপারির অন্যায়ের প্রতিবাদ জানান। সোনার বিদ্রোহী হৃদয়ের প্রতিধ্বনিত সংলাপ :

> বেপারি, বন্যার পানিতে মানুষের জান বাঁচে না– আর তুমি হেগো সোনাদানা লইয়া টানাটানি করো, না?[৩৯]

এমনকি বেপারির গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত সোনা প্রচণ্ড প্রতিশোধে– বেপারিকে বানের পানিতে ডুবিয়ে মারেন। সোনার এই নায়কোচিত মৃত্যুর একবিন্দুতে জরিনাকে না পাওয়ার বেদনাজনিত ক্রোধ, অন্যদিকে সমাজের মজুতদার-কালোবাজারিদের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিলিত হয়েছে।

এখন দুঃসময় নাটকে মুন্সি চরিত্র নাট্যক্রিয়া সংঘটনে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। নাট্যকারের বর্ণনায় মুন্সি 'টিপিক্যাল টাউট'। মজুতদার কালু বেপারির ব্যবসায়ের কাজে সহায়তাকারী একজন চাটুকার ব্যক্তি। বেপারির সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কিন্তু বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সর্বহারা মানুষের আক্রমণে টাউট মুন্সির পতন হয়।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখন দুঃসময়* নাটকের রসপরিণতিকে প্রাঞ্জল করে তুলতে প্রত্যেক চরিত্রের সংলাপ জীবনকেন্দ্রিক হয়েছে। যেমন: বেপারি যখন বন্যা কবলিত মানুষকে ঠকানোর জন্য মুন্সিকে ব্যবসায়ের কৌশল রচনা করতে বলেন তখন তা স্পষ্টরূপে নাটকের ভাবানুগ হয়েছে। যেমন :

> আরে মিয়া, এই বন্যার টাইমে পাবলিক জানমাল লইয়া ব্যস্ত। ওই রোজ কেয়ামতের ইয়া নাফসির অবস্থা আর কি! আমাগো বিজিনেসম্যান গো কেতাবে এইডারেই কয় মওকা। বুজলা?[৪০]

'মামুনের নাটকের মূল প্রাণ সাবলীল সংলাপ রচনার পাশাপাশি আঞ্চলিক সংলাপ নির্মাণের পারদর্শিতা। সংলাপের স্বাতন্ত্র্যই চরিত্রগুলোকে স্বতন্ত্র করেছে।'[৪১] *এখন দুঃসময়* নাটকে জরিনা, সোনা, জনৈক বন্যার্ত প্রমুখ চরিত্রের সংলাপ আঞ্চলিক এবং বাস্তবানুগ হয়েছে।

এখন দুঃসময় নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাট্য ভাবনা চুয়াত্তর সালের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে মজুতদার শ্রেণির প্রভাবে দরিদ্র মানুষের জীবনের করুণ চালচিত্রকে ধারণ করে গড়ে উঠেছে। নাট্যকার ফ্লাশব্যাকের মধ্য দিয়ে সোনা–জরিনার অতীত জীবনের প্রেম, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মজুতদারদের শোষণ চিত্র নানা আঙ্গিকে তুলে ধরে এ নাটককে শিল্পনন্দিত করেছেন।

এ নাটকে সঙ্গীতের উপাদান নেই। তবে সোনা ও জরিনা, 'হেই হেই হেই– দামড়া পোলা সাঁতার জানে না।' [...] হেই- হেই- হেই–' বলে বেপারির চারদিকে নৃত্য করতে থাকেন– তা যেন সঙ্গীতেরই নমুনা। এছাড়া আবদুল্লাহ আল-মামুন *এখন দুঃসময়* নাটকে প্রতীকী বা রূপক বিষয় ও উপমার ব্যবহার করেছেন। যেমন– 'জিলাপির প্যাচ'; 'টেকার গদ্দি হয়। টেকার পাহার অয়, সমুদ্দুর অয়।' আবার বেপারি সম্পর্কে সোনার ইঙ্গিতবাহী উক্তি– 'ও তাই তুমি এইবার এই উঁচা জায়গাটা বাইছ্যা লইছ। ভাবছ বেবাক দ্যাশ ভাইস্যা যাইব আর তুমি শুকনার মইদ্যে বইস্যা মাল গোনবা';– ইত্যাদি। বস্তুত আবদুল্লাহ আল-মামুন *এখন দুঃসময়* নাটকের চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনার-বিন্যাস, সংলাপ-রচনা ও রস পরিণতিতে প্রকরণ-স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন। একারণে *এখন দুঃসময়* মঞ্চসফল নাটক হিসেবে আজও সমাদৃত হচ্ছে।

কোকিলারা

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কোকিলারা* নাটকে তিনজন কোকিলা কিন্তু এক নারীর এক জীবনের আলেখ্য। *কোকিলারা* নাটকে প্রথম পর্বের কোকিলা গভীর রাত্রে তার সৎ বাবার দ্বারা যৌন নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে নির্যাতককে ধাক্কা দিয়ে পরের দিন শহরের দিকে রওয়ানা দিলে নাট্যক্রিয়া শুরু হয়। যেমন :

'আমি ঘুমের মইদ্যে টের পাইলাম, কেডা জানি আমার পাশে আইসা শুইল। গরম শ্বাস আমার মুখে চোখে। চিক্কুর দিয়া উঠলাম আমি। লগে লগে আমার মুখ চাইপ্যা ধরল। আমিও শরীরে যত বল আছিল তাই দিয়া ধাক্কা দিলাম। ক্যাৎ কইরা উঠল আমার মায়ের বুইরা সোয়ামি।'[৪২]

কোকিলারা নাটকে কোকিলা অর্থাৎ একজন নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কখনো পুরুষের সঙ্গে, কখনো বুর্জোয়া ভোগবাদী অর্থব্যবস্থার সঙ্গে, কখনো বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আইনের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে। অর্থাৎ সমাজজীবনে নারী পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব *কোকিলারা* নাটকে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কোকিলারা* নাটকে দুই কোকিলার নির্যাতনকারীদের ভাগ্যে কী ঘটবে– তা জানার জন্য দর্শকের মনে নাট্যোৎকণ্ঠা বা নাট্য মায়ার সৃষ্টি হয়েছে। *কোকিলারা* নাটকে প্রথম পর্বের কোকিলা গর্ভের সন্তানের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে গৃহকর্ত্রীর মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে যে রহস্যের সৃষ্টি করেছেন, তা নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি করেছে। আবার নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় নাট্যকার গণ-আদালতের রায় প্রদান সংযুক্ত করলে আকস্মিকতার সৃষ্টি হয়েছে।

কোকিলারা নাটকের নাট্যবৃত্ত সমকালীন পুঁজিবাদী সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার এবং পুরুষের অবগুণ্ঠিত কামনা-বাসনা জনিত কারণে নারীজীবনে শোষণ-নিপীড়নের চিত্রকে ধারণ করে গড়ে উঠেছে। আঙ্গিকগত দিক থেকে *কোকিলারা* অভিনব। এ নাটকের সমগ্রবৃত্তকে অ্যারিস্টটলীয় রীতির তিনটি সন্ধিতে এবং প্রতিটি পর্বকেও তিনটি নাট্য সন্ধিতে ভাগ করা যায়।

কোকিলারা নাটকের প্রথম পর্বে মাঝামাঝি অবস্থানে আনু মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে কোকিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করলে– কোকিলা তার গর্ভে সন্তান ধারণ করেছেন। এ অংশে নাটকীয় সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় পর্বে মাঝামাঝি অবস্থানে খন্দকার সাহেবের দ্বিতীয় বিবাহের খবর নিশ্চিত হলে ও তৃতীয় পর্বে আইনজ্ঞ কোকিলা দুই আসামীর বিরুদ্ধে আদালতের নিকট যুক্তি উপস্থাপন করে বিচার প্রার্থনা করলে সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। *কোকিলারা* নাটকের সময় সমকালীন, ঘটনাগুলো বাংলাদেশে ঘটেছে এবং ঘটনাগুলো একটার সঙ্গে আরেকটার সাযুজ্য বা ঐক্য রয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন *কোকিলারা* নাটকের কাহিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত-নিপীড়িত নারীর জীবনের চালচিত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন। 'নাট্যকার মূলত এ নাট্যকাহিনিতে কোকিলার (কোকিলা এখানে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী) জীবনে পুরুষ শাসিত সমাজের অত্যাচার-নির্যাতনের অকৃত্রিম বাস্তবতাকে মঞ্চে উপস্থাপন করে অত্যাচারীদের গণ-আদালতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন।'[৪৩] এ নাটকের কাহিনি তিনটি পর্বে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম পর্বের কোকিলার বাবার মৃত্যুর পর তার মা গ্রামের মাতবরকে বিবাহ করলে মায়ের সঙ্গে সৎ বাবার বাড়িতেই কোকিলাদের আশ্রয় হয়। কিন্তু এক রাতে কোকিলা সৎ বাবা কর্তৃক যৌন নির্যাতন থেকে কোনো রকমে নিজেকে রক্ষা করে পরদিন গ্রামের মিয়া বাড়ির মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে শহরে পাড়ি জমিয়েছেন। সেখানে গৃহকর্তার বড় ভাইয়ের ছেলে আনোয়ার হোসেন আনুর প্রেমের প্রলোভনে গর্ভধারণ করেন। তারপর গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী কোকিলাকে গর্ভের সন্তান নষ্ট করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কোকিলা তার হাতের কাছে আনুকে না পাওয়া পর্যন্ত গৃহকর্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। শেষে বড়লোকদের গভীর ষড়যন্ত্রে একদিন পুলিশ এসে কোকিলাকে চোর সাব্যস্ত করে হাজতে দিলেন। হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে নিরূপায় কোকিলা আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। প্রথম পর্বের কাহিনির সমাপ্তিতে কোকিলার নিদারুণ যন্ত্রণাকাতর জীবন তার সংলাপে প্রণিধানযোগ্য :

> এই দুনিয়াটা আল্লায় বানাইছে কেবল পুরুষগো লিগা। এইহানে মাইয়া মানুষের বাঁচনের পথ নাই। এই দুনিয়া পুরুষের বাচ্চার ফূর্তির জায়গা। দেশেও হেগো ফূর্তি। বিদেশেও। তাই ঠিক করলাম, বাঁচুম না। এই দুনিয়ায় বাঁইচ্যা থাকলে আমার জিন্দেগিতে আরও পুরুষ আসব। আমারে বেশ্যা বানাইয়া ছাইরা দিব। তারথন ভাল মইরা খোদার কাছে গিয়া বিচার চাই।[৪৪]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কোকিলারা* নাটকের দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষিত গৃহিণী সাধারণ কোকিলা ব্যবসায়ী পুঁজিপতি স্বামী খন্দকার সাহেবের সঙ্গে দুই কন্যাসহ পঁচিশ বছর ধরে ঘর সংসার করছেন। কিন্তু তার স্বামী খন্দকার সাহেব অফিসের 'পার্সোনাল অ্যাসিস্টটেন্ট' রীতাকে বিবাহ করলে কোকিলার সংসার, ভাগ্য ভেঙে খানখান হয়ে যায়। খন্দকার সাহেবের দুই মেয়ে তাদের মামার বাড়িতে যায় আর কোকিলা স্বামীর ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবাদ-বিদ্রোহে জ্বলে ওঠেন। তখন তার স্বামী কেবল কক্সবাজার থেকে ফিরেছেন। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য রীতাকে সঙ্গে আনেননি। কোকিলা তার পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষা, অবদানের কথা তুলে ধরে খন্দকার সাহেবের ওপর অগ্নিমূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানান। কোকিলার সংলাপে এই প্রতিবাদ-সচেতনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

> পঁচিশটি বছর ধরে আমি তোমার ভোগ লালসার আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছি। তোমার ক্ষুধার অন্ন জুগিয়েছি। দারুণ টাইফয়েডে তুমি যখন ছটফট করছ, রাত জেগে আমি তোমার সেবা করেছি। বাপের বাড়ির গহনা বন্ধক রেখে আমি তোমার ব্যবসায় মূলধন জুগিয়েছি। আমার হিসেব মিটিয়ে দাও।[৪৫]

কিন্তু পুঁজিপতি স্বামী খন্দকার সাহেব কোকিলাকে ডিভোর্স দেয়ার শর্তে রাজি হয়েই রীতাকে বিবাহ করেছেন। এ কারণে কোকিলা অক্টোপাসের মতো স্বামীকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইলেও– তার ভাগ্যে নেমে আসে সীমাহীন দুর্ভোগ, করুণ পরিণতি।

কোকিলারা নাটকে তৃতীয় পর্বের কাহিনি জাদরেল ব্যারিস্টার অসাধারণ কোকিলার আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এ পর্বে কোকিলা জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রসঙ্গ ধরে সবুজ শ্যামল অরণ্যানীঘেরা এই বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঘুষ-দুর্নীতি, নীতিহীনতা, নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক-বৈষম্যের নানা অসঙ্গতি মহামান্য আদালতের নিকট তুলে ধরেছেন। এরপর গৃহপরিচারিকা কোকিলার গর্ভধারণের পর আনুর বিদেশে পলায়ন, কোকিলার ওপর গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর নির্যাতন, সর্বশেষে চোর সাব্যস্ত করে পুলিশে সোর্পদ করার প্রসঙ্গও আদালতের দৃষ্টিতে তুলে ধরে বিচার প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে পঁচিশ বছর দাম্পত্য জীবন যাপনের পরও শুধু পুরুষের যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করতে ধর্মের দোহাই দিয়ে খন্দকার সাহেব প্রথম স্ত্রী সাধারণ কোকিলার অসম্মতিতে দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। ব্যারিস্টার কোকিলা এজন্য খন্দকার সাহেবেরও শাস্তি প্রার্থনা করেছেন। আইনজ্ঞ কোকিলার সংলাপে এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটকের তৃতীয় পর্বের কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। যেমন :

> এক, প্রথম কোকিলার গল্প– যে কোকিলা রেলের তলায় ঝাঁপ দেবার সময় তিন মাসের অন্তঃস্বত্বা ছিল। দুই, দ্বিতীয় কোকিলার গল্প– যে কোকিলা পঁচিশ বছর স্বামীকে সেবা করার পর স্বামীরই লাথি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। পরবর্তীতে যে কোকিলা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে লজ্জা ঢাকতে পারেনি। তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেছে।[৪৬]

কিন্তু বিজ্ঞ আদালত পুরুষশাসিত আইনে দুই অপরাধীর শাস্তির বিধান প্রদানে ব্যর্থ হলে ব্যারিস্টার কোকিলা গণ-আদালতের দারস্থ হয়েছেন। গণ-আদালতেও নারীর প্রতি পুরুষের বৈষম্যের দরুণ দুই অপরাধীর বেকসুর মুক্তিলাভের মধ্য দিয়ে কাহিনির সমাপ্ত হয়।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কোকিলারা* 'বাংলাদেশের প্রথম একক নারী চরিত্রাভিনীত নাটক।'[৪৭] তবে এ নাটক একক চরিত্রনির্ভর হলেও একজন নারীর চরিত্র তিন রূপে বিকশিত হয়েছে। প্রথম রূপে কোকিলা

দরিদ্র ঘরের এক অতি সাধারণ নারী। বাবার মৃত্যুর পর তার মা আবার বিবাহ করলে সৎ বাবার ঘরে কোকিলার আশ্রয় হয়। কিন্তু রিরংসু-লম্পট সৎ বাবা রাতের আঁধারে কোকিলার শরীরের ওপর ঝাপিয়ে পড়লে কোকিলা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও মর্যাদায় উজ্জীবিত হয়েছেন। প্রচণ্ড প্রতিবাদে বুড়ো সৎ বাবাকে লাথি মেরে পরদিন সকালে গ্রামের এক মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে শহরে গিয়ে গৃহপরিচারিকার কাজে যোগ দেন। সারাদিন নিপূণ হাতে বাসার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কোনো কাজেই কোকিলার অবহেলা নেই। কোকিলার সংলাপে তার কর্মব্যস্ততা প্রণিধানযোগ্য :

> প্রত্যেকটা দিন আল্লার রাইতটা পোয়াইতে না পোয়াইতেই, কোকিলা গোসলখানায় পানি দে। কোকিলা, ডিম ভাঁজি কর। কোকিলা, চা বানা। কোকিলা, বাবুর ইস্কুলের ব্যাগ গুছাইয়া দে। কোকিলা, শাড়ি ইস্তিরি কর।[৪৮]

কোকিলা যেমন কর্মনিষ্ঠ, আত্ম-সংযমী, মর্যাদাবোধসম্পন্ন তেমনি সারল্য, প্রেম, মাতৃত্ব ও মানবিকতায় পরিপূর্ণ। একারণে বাসার কাজ ছেড়ে গার্মেন্টসে কাজ করার ইচ্ছা হলেও গৃহকর্তার বাবুর প্রতি নিবিড় বন্ধন ছিন্ন করে যেতে পারেন না। আনু ভাইকে তিন মাস সেবা-শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তুলেছেন। আবার জৈব-মানবিক প্রবৃত্তিতে উদ্দীপিত হয়ে আনুকে প্রেম ও শারীরিক সম্পর্ক করতে সম্মতি জানিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে পড়ে শরীর-হৃদয় সর্বস্ব হারিয়ে একমাত্র গর্ভের সন্তানকে পেয়েছেন। তাই কোকিলার গর্ভের সন্তানের পিতা আনু পিতৃত্ব অস্বীকার করে বিদেশে পালিয়ে গেলেও– কোকিলা তার গর্ভের সন্তানকে অস্বীকার করেননি। এ মাতৃত্ববোধ কোকিলা চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। সন্তানের পিতৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আনুকে বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে গৃহকর্তাকে চাপ দিয়েছেন। কিন্তু গৃহকর্তা কোকিলাকে বঞ্চিত করলে তিনি রাগে-ক্ষোভে গৃহকর্তা সম্পর্কে গৃহকর্ত্রীর মাথায় সন্দেহ ঢুকিয়ে দেন। কোকিলার ক্ষুব্ধ রূপ তার সংলাপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> বাহ বাহরে বাহ। ফূর্তির কুনো কুল কিনারা নাই। ক্ষ্যামতা থাকে ত ধইরা আনেন তারে বিদাশ থিকা। আমি ছারুম না। ভাবছেন কি আপনেরা? মাইয়া মানুষ মাটির পুতলা? খেললে খেললাম, না খেললে আছার দিয়া ভাইঙ্গা ফ্যালাইলাম?[৪৯]

কিন্তু উচ্চবর্গের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিকট কোকিলা পরাজিত হয়েছেন। গৃহকর্তা তাকে চোর সাব্যস্ত করে থানায় সোর্পদ করেছেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পরকালে বিচারের আশায় গর্ভের সন্তানসহ ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করে প্রথম পর্বের কোকিলা মুক্তির পথ রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় কোকিলা উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের সংসার-নিপুণা, ধর্মপরায়ণ উচ্চশিক্ষিত সুগৃহিণী। পঁচিশ বছর ধরে দুই কন্যাসহ স্বামীর সংসার করছেন। স্বামীর সেবা-যত্ন কিংবা সাংসারিক দায়িত্বপালনে তার সামান্যতম

ঘাটতি নেই। স্বামী অফিসের নানা কাজে ব্যস্ত থাকলে কিংবা স্বামী সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বললেও কোকিলার মধ্যে স্বামীকে নিয়ে সামান্যতম সন্দেহ নেই। গৃহ-সংসারে এমন ধর্মপরায়ণ, সংসারকামী রমণী খুব কমই আছে। জনৈক মিসেস হোসেনের বিদ্রুপের প্রতিউত্তরে কোকিলা চরিত্রের এমন গুণ তার সংলাপে প্রমাণিত :

> মিসেস হোসেন একদম চুপ করুন আপনি। আপনার সাহস তো কম নয়? আপনি আমার কাছেই আমার স্বামীর চরিত্র তুলে কথা বলছেন? একজন পি,এ, হতে পারে বিশ্বসুন্দরী। কিন্তু আমি তার স্ত্রী। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবন আমাদের। দুটো মেয়ের জনক জননী আমরা।[৫০]

কিন্তু ভোগবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এমন সংসারপরায়ণ স্ত্রী কোকিলাকেও অধিকার বঞ্চিত হতে হয়েছে। কারণ কোকিলার স্বামী তার ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে অফিসের এক কর্মচারীকে বিবাহ করলে তিনি পঁচিশ বছরের ঘর-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। কিন্তু কোকিলা পুরুষের জঘন্য-লাম্পট্যের নিকট হার মানবার পাত্র নন। প্রচণ্ড রাগে-ক্ষোভে-বিক্ষোভে কোকিলার হৃদয় প্রতিবাদে জ্বলে ওঠে। মেয়েরা মামা বাড়ি চলে গেলেও কোকিলা তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়ে বাড়িতে অবস্থান করেন। কেননা সংসারের দুর্যোগে-অভাবে কোকিলাও অন্ন সংস্থান করেছেন– বাবার বাড়ির গহনা বন্ধক রেখে ব্যবসায়ের মূলধন যুগিয়েছেন। সংসার গড়তে এমন অবদান কোকিলার আত্মমর্যাদা ও অধিকার চেতনাকে মহিমান্বিত করেছে। একারণে কোকিলা পুরুষের লোলুপ লাম্পট্য ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। কোকিলার সংলাপে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ বিষাদাগার :

> তোমরা পুরুষেরা, বিশেষ করে বিবাহিত পুরুষেরা এক নারীতে সন্তুষ্ট থাকতে পার না। স্বাদ পাল্টানো তোমাদের মজ্জাগত অভিলাষ। রীতাকে তুমি কোনোদিন সভ্য চোখে দ্যাখোনি। তাই তুমি রীতাকে বিয়ে করছ। বল– স্বীকার কর। অসভ্য অশ্লীল লম্পট পুরুষ, তোমার সব ভাল ভাল জামা কাপড় খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় নেমে যাও। কেননা ওটাই তোমার আসল রূপ।[৫১]

তৃতীয় কোকিলা কবি কিংবা আবৃত্তিকার নন, তিনি সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির একজন প্রতিবাদী আইনজ্ঞ। একই সঙ্গে তিনি সামাজিক নানা অত্যাচার, অন্যায়, ঘুষ-দুর্নীতি, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা প্রভৃতি থেকে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একজন জাত ব্যারিস্টার হিসেবে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় কোকিলার খুনী আনোয়ার হোসেন (আনু) ও হাবিব খন্দকারের (খন্দকার সাহেব) অপরাধ আদালতের নিকট উপস্থাপন করেছেন। কোকিলা নিশ্চিত যে আইনের

দৃষ্টিতে দুই খুনীই সন্দেহাতীতভাবে অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন। একারণে আইনজ্ঞ কোকিলা আদালতের নিকট খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তির আবেদন জানান :

> মহামান্য আদালত, আজকের এই আদালতে আসামির দুটো কাঠগড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দুই ঘাতক। প্রথম কোকিলার ঘাতক আনোয়ার হোসেন আর দ্বিতীয় কোকিলার ঘাতক হাবিব খন্দকার। এদের অপরাধ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। [...] আদালত এই দুই অপরাধীর জঘন্য অপরাধের সুবিচার করুন। এদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন।[৫২]

কোকিলা চরিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে তিনি একজন বিজ্ঞ আইনজ্ঞ। তিনি জানেন, পুরুষ শাসিত সমাজ পরিচালনায় প্রচলিত আইন পুরুষদের দ্বারা রচিত। এ আইনে নারীর ন্যায়-বিচার প্রাপ্তি কিংবা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তবু ব্যারিস্টার কোকিলা আইনি লড়াই চালিয়েছেন। প্রচলিত আদালতের রায়ে পরাজিত হলে শেষ পর্যন্ত গণ-আদালতের শরণাপন্ন হয়ে অপরাধীদের ন্যায্য শাস্তি চেয়েছেন। কোকিলার সংলাপে গণ-আদালতের নিকট এই বিচার প্রার্থনার দৃশ্য প্রণিধানযোগ্য :

> আনোয়ার হোসেন, হাবিব খন্দকার এখন আপনারা যে আদালতের মুখোমুখি হয়েছেন সেই আদালতের এক এবং অদ্বিতীয় নাম গণ-আদালত। সভ্যতা এবং মানবতার মাপকাঠির বিচারে এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালত।[৫৩]

কিন্তু গণ-আদালতেও পুরুষেরা বিশৃঙ্খলা শুরু করলে দুই খুনি পলায়ন করেন। একারণে আইনজ্ঞ কোকিলা পুরুষতন্ত্রের নিকট পরাজিত হয়েছেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুন *কোকিলারা* নাটকে তিন পর্বে তিনজন কোকিলার চরিত্র উপস্থাপন করলেও মূলে নারীসমাজের সমগ্র জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-বঞ্চনা, নির্যাতন-নিপীড়ন, অধিকারহীনতা, লৈঙ্গিক-বৈষম্যের চালচিত্র তুলে ধরেছেন। তাই কোকিলা এক নারী এক চরিত্র। এছাড়া *কোকিলারা* নাটকে পারিপার্শ্বিক চরিত্র হিসেবে গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী, বাবু, আনোয়ার হোসেন, হাবিব খন্দকার, দুই মেয়ে প্রমুখ কোকিলার সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনিকে প্রাণবন্ত করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কোকিলারা* নাটকে প্রথম কোকিলা নিম্নবিত্ত হওয়ায় সংলাপগুলো সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের ভাষা সংলগ্ন। আবার শিক্ষিত গৃহিণী কোকিলার সংলাপ প্রমিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। আইনজ্ঞ কোকিলার সংলাপ আরো উন্নত। এ নাটকে সংলাপগুলো বিষয়-চরিত্রকে কেন্দ্র করে কখনো দীর্ঘ, কখনো সংক্ষিপ্ত আবার কখনো পরোক্ষ উক্তিতে অন্য চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

কোকিলারা নাটকের ভাবনা মূলত নারীর অধিকার বঞ্চনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ নাটকে নারী নির্যাতনের চিত্র কোকিলার সংলাপে, কাহিনির বুননে, আইনের অসমপ্রয়োগে নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া প্রথম কোকিলার সন্তান বাৎসল্য, দ্বিতীয় কোকিলার সংসারপরায়ণ মনোভাব ও তৃতীয় কোকিলার অধিকার সচেতনতা, আইনের প্রতি আস্থা নাট্যভাবনাকে মহিমান্বিত করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন *কোকিলারা* নাটকে কোকিলাদের নির্যাতনের পটভূমি, তিনজন কোকিলার সাজ-সজ্জা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে অর্থ-ব্যবস্থার নিরিখে নারীর অবস্থান ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের মনোজাগতিক ভাবনা নাট্যদৃশ্যকে অপরূপ রূপে ফুটিয়ে তুলেছে।

কোকিলারা নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তবে এ নাটকে একেবারে শেষে 'আমি মেলা থেকে তালপাতার এক বাঁশি কিনে এনেছি'– এই গানটি আবহসংগীত হিসেবে কোকিলার ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়ার দিকটিকে ইঙ্গিত করে। এ নাটকে উপমার ব্যবহার লক্ষণীয়। 'ভাত দেবার মুরোদ নাই, কিল মারার গোসাই'– এই প্রবাদ-প্রবচনটির ব্যবহারও দেখা যায়। আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কোকিলারা* নাটকের রূপ-রীতি গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে নুরুল মোমেনের *নেমেসিস* (১৯৪৩) নাটকের পর একক চরিত্রনির্ভর ও বাংলা নাটকে প্রথম একক নারী চরিত্রনির্ভর অনন্য বৈচিত্র্যের অধিকারী। একারণে দুই বাংলায় *কোকিলারা* মঞ্চসফল নাটকের মর্যাদা লাভ করেছে।

মেরাজ ফকিরের মা

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেরাজ ফকিরের মা* নাটক নাটকীয় বৈশিষ্ট্যে দর্শকের বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। এ নাটকে প্রগতিশীল চেতনার ধারক শহরবাসী সেরাজের গ্রামে আগমনের খবর শুনে মেরাজ ফকির যখন একই গৃহে বসবাসের জন্য নিজেকে না জায়েজ ঘোষণা করেন তখন নাট্যক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেমন:

> সেরাজ মিয়া ধর্ম করে না। ধর্ম মানে না। কোরান হাদিস শরা শরিয়তের ধার ধারে না। তার সঙ্গে একগৃহে বসবাস আমার পক্ষে জায়েজ হয় না।[৫৪]

মেরাজ ফকিরের মা নাটকে গেদা ফকির আগ বাড়িয়ে মেরাজ ফকিরের খানকায় আসলে– মেরাজ ফকির শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু গেদা ফকিরের ভাষ্যমতে যখন জানলেন যে, গ্রামের তরুণ শিক্ষিত মাস্টার ফকিরি ব্যবসা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে চান; তখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মব্যবসায়ীদের সঙ্গে

প্রকৃত ধর্মের মানুষদের সঙ্কট নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। আবার নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে মেরাজ ফকিরের মায়ের পূর্বেকার হিন্দু ধর্মের পরিচয় জানার পর দর্শকের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। গেদা ফকিরের সংলাপে এ নাট্যোৎকণ্ঠা প্রণিধানযোগ্য :

> মোজাহের মণ্ডল? মেরাজ ফকিরের আব্বাজান? মেরাজ ফকির আলোরানীর ছেলে? আলোরানী যদি হয় ধীরেন্দ্রলাল দত্তের মেয়ে তাহলে মেরাজ ফকির কি?[৫৫]

এ নাটকে মেরাজ ফকির তার অন্ধ বিশ্বাসে অবিচল থেকে মুসলমানের ধর্মকে অবমাননা করার জন্য মাকে হত্যা করবেন এটা স্পষ্টত ছিল। কিন্তু হঠাৎ মেরাজের বোধোদয় ঘটলে তিনি মাকে রক্ষার জন্য সেরাজের সঙ্গে গোপনে শহরের দিকে পাঠালে দর্শকের মনে নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি করেছে। অথচ নাটক শেষে গেদা ফকির ও গ্রামবাসী কর্তৃক মেরাজ ফকিরের পরিবারকে আটক করার ঘটনা আকস্মিকতা সৃষ্টি করে। এরপর ঐশী বাণী শ্রবণের মতো অবান্তর অনুষঙ্গ *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকের 'অতিনাটকীয়' ঘটনা নাট্যমান ক্ষুণ্ন করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর নাটকে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে স্বতন্ত্র। তাঁর *মেরাজ ফকিরের মা* সুগঠিত প্লটের জমজমাট নাটক। 'নব্বই দশকের শুরু থেকে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র কার্যক্রম এবং বিভিন্ন পির-ফকিরদের ফতোয়াবাজির প্রেক্ষাপটে এ নাটক রচিত।'[৫৬] এ নাটক রচনায় নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন আধুনিক রীতিতে নয়টি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। তবে এ নাটকে প্রথম দৃশ্যে পির মেরাজ ফকির অর্থাৎ ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছোট ভাই সেরাজের সঙ্কট স্থাপিত হয়ে তৃতীয় দৃশ্য পর্যন্ত সরলরৈখিকভাবে গতিশীল হয়েছে। চতুর্থ দৃশ্যে এ সমস্যা আরো ঘনীভূত হতে হতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্যে আলোরানীর পূর্বের হিন্দুত্বের পরিচয় প্রকাশ পেলে নাট্যঘটনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এরপর সপ্তম থেকে নবম দৃশ্যে ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের পরাজয় ও মানবতার বিজয়ের মধ্য দিয়ে ঘটনার প্রশমন ঘটেছে। এ বিবেচনায় *মেরাজ ফকিরের মা* নাটককে তৃতীয়াঙ্ক নাটক বলা যায়।

মেরাজ ফকিরের মা নাটকের ঘটনা একটি নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। নাটকের ঘটনাগুলো পলাশপুর নামক নির্দিষ্ট স্থানে দুই ফকিরের খানকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আবার এ নাটকের মূল ঘটনা ধর্মান্ধদের সঙ্গে সংস্কৃতিমনা উদার মানবতাবাদের দ্বন্দ্ব– যা অন্যান্য ছোট ছোট ঘটনাগুলোকে যুক্ত করে ঘটনার ঐক্য গড়ে তুলেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকের কাহিনি অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের পটভূমিতে ক্ষত-বিক্ষত আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও মানবধর্মের স্বরূপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ নাটকে কাহিনির শুরুতে প্রথম দৃশ্যে পলাশপুর গ্রামের মোজাহের মণ্ডল ও আলোরানীর ছেলে মেরাজ ফকির খানকায় যাওয়ার পূর্বে বাবা-মাকে সালাম করেন। তারপর শহরবাসী শিক্ষিত সহোদর সেরাজের আগমনের প্রসঙ্গ তুলে মেরাজ ফকির বাবা-মায়ের কাছে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কারণ সেরাজ ধর্ম মানে না আর সেরাজের বউ নাপাক। একারণে সেরাজের বউ সম্পর্কে মেরাজ ফকিরের প্রতিক্রিয়া :

> আদব কায়দা জানে না। মাথায় ঘোমটা দেয় না। চুল বান্ধে না। সিনা উচা করে হাঁটে। [...] এইবারও যদি বাড়ীতে এইসব বেলেল্লাপনা হয় তাইলে আমি বিবি বাচ্চা লয়ে খানকায়ে গিয়া বাসা বান্দিব।[৫৭]

দ্বিতীয় দৃশ্যে গ্রামের আরেকজন পির গেদা ফকির– নিজেদের ফকিরি ব্যবসায়ের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মেরাজ ফকিরের খানকায় সন্ধি করার জন্য আসেন। তৃতীয় দৃশ্যে মোজাহের মণ্ডলের অন্য দুই ছেলের একজন শহরবাসী সেরাজ ও আরেকজন যাত্রাভিনেতা পিয়ার বাড়িতে ফিরলে সবাই নাচে-গানে আনন্দে মেতে ওঠেন। কিন্তু পির মেরাজ ফকির এমন বেশরিয়তি কার্যক্রম দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে চতুর্থ দৃশ্যে বিছানাপত্র নিয়ে খানকায় অবস্থান করছেন। এমন সময় চেয়ারম্যান প্রার্থী কাজী তোবারক তার রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীয় চেতনা যুক্ত করে সহজে নির্বাচনে জয়লাভ করার উদ্দেশে মেরাজ ফকিরের নিকট আসেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চেতনাবাহী মেরাজ ফকির এ সুযোগে রায়ট সৃষ্টি করতে চান। এই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া মেরাজ ফকিরের সংলাপে প্রণিধানযোগ্য :

> শুরুটাই আসল। বিসমিল্লাতেই পিলা চমকাইয়া দিতে হবে মানুষের। এমন একটা কেলেংকারী ঘটাতে হবে যা শুধু এই পলাশপুর গ্রামেই না, পুরা দেশের কলিজা কাঁপায়ে দেবে।[৫৮]

কিন্তু এ দৃশ্যে মেরাজ ফকিরের মা আলোরানীর বাবা ধীরেন্দ্রলাল মল্লিকের আগমনের পর হঠাৎ মৃত্যু হলে কাহিনি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

পঞ্চম দৃশ্যে মেরাজ ফকিরের খানকায় আলোরানীর হিন্দু বাবার পরিচয় উন্মোচিত হলে মেরাজ ফকির চিন্তায় যেন ভাবশূন্য হন। ষষ্ঠ দৃশ্যে আলোরানী, মোজাহের মণ্ডল, সেরাজ, সেলিনা প্রমুখ মিলে লাশের সৎকার করার কথা ভাবছেন– এমন সময় গেদা ফকির ফতোয়া নিয়ে আসেন। সপ্তম দৃশ্যে মেরাজ ফকির নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বে আত্মসঙ্কটে পড়েন। একদিকে মা অন্যদিকে ধর্ম। অষ্টম দৃশ্যে মোজাহের মণ্ডলের বৈঠকখানায় শোকে স্তব্ধ আলোরানীকে খুন করতে তলোয়ার হাতে মেরাজ ফকির উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু 'গায়েবী আওয়াজে' পিতামাতাকে সম্মান করার উপদেশ ভেসে আসলে মেরাজ

ফকিরের ভাবান্তর ঘটে। এরপর মাকে ফতোয়াবাজি থেকে রক্ষা করতে ছোট ভাই সেরাজকে শহরে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। নবম দৃশ্যে গেদা ফকিরের ফতোয়ায় উল্লসিত ধর্মান্ধ গ্রামবাসী আলোরানীকে পাথর মারা শুরু করেন। এমন সময় মেরাজ ফকির, মাস্টার ও প্রগতিশীল চেতনার গ্রামবাসী গেদা ফকিরকে প্রতিরোধ করেন। মেরাজ ফকির ধর্মান্ধতা ও প্রকৃত ধর্মের অর্থ বুঝতে পেরে আলোর পথে চলার জন্য মায়ের নিকট শপথ করেন। মেরাজের সংলাপে তার সংস্কারবোধ সম্পর্কে জানা যায় :

> গেদা ফকিরের মতন আমারও অপরাধের অন্ত নাই। আমিও ধর্মের নামে অনেক অধর্ম করেছি। একবার আপনের মাপ পাইলে আমি নিজেরে শুদ্ধ করব।[৫৯]

আলোরানী মেরাজকে মাপ করে দেন। এর মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে ধর্মীয় বিধি-বিধানের ঘাত-সংঘাতে পলাশপুর গ্রামের মোজাহের মণ্ডল ও আলোরানীর বড় ছেলে মানব ধর্মে উত্তীর্ণ মেরাজ ফকির প্রধান চরিত্র। তিনি মাদ্‌রাসা থেকে পড়াশোনা শেষে খানকা স্থাপন করে ধর্মকর্মে মনোযোগ দেন। এলাকার সহজ-সরল মানুষের নিকট অল্পদিনের মধ্যে মেরাজ ফকিরি বিদ্যার গুণে ডাকসাইটে পির হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেন। তিনি পানি পড়া দিয়ে মানুষের নিকট পয়সা হাতিয়ে নিলেও গ্রামের অন্য পির গেদা ফকিরের চেয়ে নৈতিক গুণে উন্নত চরিত্রের। কিন্তু আপাতদৃশ্যে মেরাজ ফকির প্রগতিশীল চেতনা বিরোধী। এ কারণে শহর নিবাসী সহোদর সেরাজের শিক্ষা-সংস্কারকে বেশরিয়তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। মেরাজ ফকিরের এই চেতনা একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মান্ধ মৌলবাদী চেতনা থেকে উৎসারিত। মেরাজ ফকির বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেন না, বাঙালি সংস্কার-চেতনার বিপরীতে ধর্মান্ধ-সাম্প্রদায়িক ধারায় তিনি ধাবিত হয়েছেন। মেরাজ ফকিরের সংলাপে তার সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রণিধানযোগ্য :

> আমি এই দেশটারে হিন্দুমুক্ত করতে চাই। দলে দলে মালাউনদের মুসলমান বানাইতে চাই। হাজার বছরে পলিটিশিয়ানরা, মেলেটারি জেনারেলেরা যে কাম পারে নাই আমি সেই কাম কইরা বিশ্বরে দেখাইতে চাই।[৬০]

সাম্প্রদায়িক চেতনা মেরাজ চরিত্রে এতটাই প্রকট হয়েছে যে, মায়ের পূর্বের হিন্দু পরিচয় জানার পর তিনি ধর্ম রক্ষায় উন্মুক্ত তরবারি হাতে মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। এমন সময় 'গায়েবী আওয়াজে' ভেসে আসা ধর্মের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরে সঙ্কট থেকে মুক্তির পথে মেরাজ চরিত্রের উত্তরণ

ঘটেছে। একারণে গেদা ফকিরের ফতোয়া থেকে মায়ের সম্মান রক্ষায় সংস্কারমুক্ত মাস্টারের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। 'মেরাজ ফকির ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ হলেও শেষ পর্যন্ত সে মায়ের ধর্মে তথা মানবধর্মে বলিয়ান হয়ে সমগ্র পরিবারকে গেদা ফকিরের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছে।'[৬১] তিনি ধর্মের নামে অধর্মের পথ ছেড়ে প্রকৃত ধর্ম অনুসরণের জন্য মায়ের নিকট শপথ করেছেন। একারণে মেরাজ ফকির মিনতি জানিয়েছেন :

> আম্মাজান, আমারে মাপ কইরা দ্যান। [...] আমিও ধর্মের নামে অনেক অধর্ম করেছি। একবার আপনের মাপ পাইলে আমি নিজেরে শুদ্ধ করব। ফকিরি ব্যবসা আমি ছাইড়া দিব আম্মা। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিব না।[৬২]

মেরাজ ফকিরের মা নাটকে আলোরানী চরিত্রের শাশ্বত মাতৃত্বের রূপকে কেন্দ্র করেই নাট্যকাহিনি গড়ে উঠেছে। সন্তান বাৎসল্য-পিতৃদ্বায়গ্রস্থ, প্রেম-ভালোবাসা প্রভৃতি মানবীয় গুণে তিনি উত্তীর্ণ। কিন্তু আলোরানী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সূত্রধর নন, কারণ মানব চরিত্রের মানবীয় গুণ স্ব-স্ব ধর্মের আদর্শের অংশ বটে আর স্ব-ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ সাম্প্রদায়িক বন্ধন নয়। তবে আলোরানীর চরিত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নেই– তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও যেমন ইসলাম ধর্মের অবমাননাকর কোনো কাজ করেননি, তেমনি হিন্দু বাবাকেও অস্বীকার করেননি। একারণে উনচল্লিশ বছর পরে আলোরানীর হিন্দু বাবা ধীরেন মল্লিক ফিরে এসে মেরাজ ফকিরের খানকায় মৃত্যুবরণ করলে– তিনি পিতৃভক্তির দরুণ স্বামী-সন্তানদের নিকট বাবার সৎকারের জন্য অনুনয় জানিয়েছেন। আলোরানীর এই পিতৃ-শ্রদ্ধা নিম্নরূপ :

> জন্মদাতা বাপেরে বাপ বলছি তাই আমারে পাগল মনে হইতেছে? শোন্ এই মণ্ডল সাব যেমন তোদের বাপ্, ঠিক তেমুনি এই হতভাগা মানুষটাও আমার বাপ। [...] হ্যাঁগো আমার বাবারে তুমরা সৎকার করবা না? বাপ বেটায় চুপ কইরা আছ কেন? তোমাদের কাছে আমার এইটুকু দাবী নাই?[৬৩]

আলোরানী আর দশজন বাঙালি নারীর মতো সংসারপরায়ণ একজন আদর্শ নারী, গৃহিণী ও মা। তিনি এক ছেলেকে মাদ্‌রাসায় পড়িয়েছেন, এক ছেলেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন আবার এক ছেলেকে যাত্রাগানে অভিনয় করলেও নিষেধ করেননি। সন্তান, 'পির বা চোর' যা-ই হোক না কেন মা হিসেবে আলোরানীর নিকট সবাই সমান। কিন্তু ধর্মান্ধ মৌলবাদী পির গেদা ফকির ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে আলোরানীকে তওবা পড়িয়ে আবারও সন্তানদের বৈধ মা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে চান। আলোরানী গেদা ফকিরের ফতোয়ায় বিচলিত হননি, তিনি ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে মাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে সন্তানদের অস্তিত্বের সঙ্গে ধারণ করেছেন। একারণে গেদা ফকিরের তওবা পড়ানোর প্রস্তাবে

আলোরানী ধর্ম-সমাজ ও স্বামীর উদ্দেশে তার মাতৃত্বের মহত্ব মহিমান্বিত করে তুলে ধরেছেন। আলোরানীর সংলাপে এই মাতৃত্বের স্বরূপ প্রমাণিত :

> আমি উনচল্লিশ বছর মণ্ডল সাবের বিবি হয়ে তার সংসার করতেছি। তার তিন তিনটি সন্তানের মা হয়েছি। আমার পেটের এক ছেলেরে আল্লার পথে, আল্লার নামে সইপ্যা দিছি। আইজকা সেই আমারেই নতুন কইরা বিধান নিয়া আইনসঙ্গত বিবি হইতে হইব? সন্তানের মা হইতে হইবো? আমার উনচল্লিশ বছরের জীবনের সব মিথ্যা হইয়া যাবে? [...] মিথ্যা হইয়া যাবে আমার গর্ভ? আমার রক্ত? আমার মা পরিচয়?[৬৪]

মেরাজ ফকিরের মা নাটকে ধর্মান্ধ মৌলবাদী শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে গেদা ফকির চরিত্রটি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। প্রকৃতপক্ষে গেদা ফকির বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে নবোত্থিত সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের একজন স্বার্থক প্রতিনিধি। তিনি ধর্মের নামে একদিকে কাজী তোবারকের মতো রাজনীতিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছেন; অন্যদিকে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। পলাশপুর গ্রামের হিন্দু আলোরানী উনচল্লিশ বছর আগে ইসলামী তরিকামতে মোজাহের মণ্ডলকে বিবাহ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেও গেদা ফকির ধর্ম অবমাননার অভিযোগে আলোরানীর নামে ফতোয়া জারি করেছেন। তিনি হিন্দুয়ানি থেকে পলাশপুর গ্রামকে পুত-পবিত্র করতে একবার ফতোয়া জারি করে আবার আলোরানীর পরিবারকে শুদ্ধ মুসলমান বানাতে চান। গেদা ফকিরের সংলাপে তার চরিত্রের এই ধর্মান্ধ ফতোয়াবাজির চিত্র উন্মোচিত হয় :

> অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের এই পলাশপুর গ্রামে আমাদের পবিত্র ধর্ম ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে। বেদাতি বেশরিয়তি কর্ম করা হইয়াছে। আর করিয়াছেন মুসলমানের ছদ্মবেশে এক হিন্দু রমণী। আর এই কুকর্মটি তিনি করিয়াছেন সুদীর্ঘ তিরিশ বৎসর ধরিয়া। আমরা তাই তাহাকে ন্যায্য শাস্তি প্রদান করিয়া পলাশপুর গ্রামকে পূত পবিত্র করিব।[৬৫]

কিন্তু ধর্মের প্রকৃত সত্যে মেরাজ ফকির উজ্জীবিত হলে প্রগতিশীল চেতনার নিকট মৌলবাদী গেদা ফকিরের পরাজয় ঘটেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণে কাজী তোবারক একজন সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িক চেতনার রাজনীতিক। তিনি গত নির্বাচনে হিন্দুদের ভোটের আশায় নির্বাচন করে পরাজিত হয়ে এবার জয়লাভের জন্য গেদা ফকির ও মেরাজ ফকিরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। কাজী তোবারক দুই পিরের ধর্মানুভূতি কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করতে চান। একারণে

দেশটাকে হিন্দুমুক্ত করতে মেরাজ ফকিরকে রায়ট লাগানোর উস্কানি দেন। কাজী তোবারকের সংলাপে তার সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা প্রণিধানযোগ্য :

> রায়ট লাগায়ে দেন হুজুর। এই পলাশপুর গেরামের মালাউন খতম করে দেন। কাম এবং নাম দুটাই হবে।[৬৬]

কাজী তোবারক একজন সুবিধাবাদী, স্বার্থপর কুচরিত্রের অধিকারী। একারণে মেরাজ ফকিরের মায়ের হিন্দু পরিচয় জানাজানির পর তিনি ফতোয়াবাজ গেদা ফকিরকে সমর্থন যুগিয়ে নিজের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনৈতিক পরিচয় উন্মোচন করেছেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে মোজাহের মণ্ডল চরিত্রটি আলোরানীর পরিচয় ও বাংলাদেশের ধর্মান্তরিত জাতিগত সংস্কৃতি উন্মোচনে উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত হয়েছে। এ নাটকে মাস্টার, সেলিনা, সেরাজ প্রমুখ চরিত্র নাট্যঘটনায় প্রাধান্য না পেলেও প্রগতি ও উদার মানবতাবাদী চেতনা ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পিয়ার চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বাংলাদেশের প্রবহমান সাংস্কৃতিক চেতনাকে উজ্জীবিত করেছেন। এছাড়া এ নাটকে নবা, জবা, মেরাজ ফকিরের বোরখা পরিহিতা স্ত্রী প্রমুখ চরিত্র রক্ষণশীল পরিবারের চিত্রকে তুলে ধরে। বদি, হেকমত, হাক্কানী ও রব্বানী হাস্যরসের মধ্য দিয়ে নাট্যঘটনাকে গতিশীল করেছে।

মেরাজ ফকিরের মা নাটকের সংলাপ সরল-স্বাভাবিক-শিল্পিত। নাট্যকার এ নাটকে মৌলবাদীদের ধর্মীয় কুসংস্কারকে ফুটিয়ে তুলতে যেমন ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার করেছেন; তেমনি মেরাজ ফকির, গেদা ফকির, সেরাজ-সেলিনা, মাস্টার প্রমুখ চরিত্রের শিক্ষিত-মার্জিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। আবার বদি, হেকমত প্রমুখের ভাষা সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকের ভাবনা ফতোয়াবাজ মৌলবাদী গোষ্ঠীর অন্ধবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গৃহীত হয়েছে। কীভাবে ধর্মান্ধ গোষ্ঠী গ্রামের সাধারণ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে ঠকাচ্ছেন ও ফতোয়াবাজির মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-ভেদাভেদ সৃষ্টি করছেন নাট্যকার তা এ নাটকে নানা মহিমায় উপস্থাপন করেছেন।

মেরাজ ফকিরের মা নাটকের দৃশ্য চমৎকৃত। এ নাটকে গেদা ফকির ও মেরাজ ফকিরের মতো পিরের পলাশপুর গ্রামে আলোরানীর হিন্দু পরিচয় উন্মোচিত হলে, ইসলাম ধর্ম অবমাননা ও ফতোয়াবাজির যে

প্রেক্ষাপট রচিত হয় তা এ নাটকের দৃশ্য ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এছাড়া এ নাটকে পাত্র-পাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন তাদের আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় অবস্থাকে তুলে ধরে; তেমনি গেদা ফকির, মেরাজ ফকির ও তার স্ত্রী-সন্তানদের ক্রিয়াকলাপ, সংলাপে, মানসিক অবস্থায় ধর্মান্ধতা ফুটে উঠেছে। আবার মাস্টার, সেরাজ, সেলিনা-আলোরানী প্রমুখের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থায় সংস্কৃতিমনা, সংস্কারমুক্ত ধর্মীয় চেতনা নাট্য-দৃশ্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন *মেরাজ ফকিরের মা* নাটকে, 'ওরে ও– মানুষ রইলি বেঁহুশ'– গানটি ব্যবহার করেছেন। এছাড়া উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারও করেছেন। যেমন : 'ঘানি টানা'।

খ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবন কেন্দ্রিক :

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনো সংঘাত কিংবা হানাহানির চিত্র, নেই তবে মুক্তিযদ্ধের প্রোথিত চেতনা উজ্জীবনে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলো হচ্ছে, *এবার ধরা দাও*, *আয়নায় বন্ধুর মুখ*, *এখনও ক্রীতদাস*, *তোমরাই*, *তৃতীয় পুরুষ*, *বিবিসাব*, *দ্যাশের মানুষ* ও *মেহেরজান আরেকবার* নাটকগুলোর মধ্য থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় নাটক *এবার ধরা দাও*, *এখনও ক্রীতদাস*, *তোমরাই*, *তৃতীয় পুরুষ* ও *মেহেরজান আরেকবার* প্রভৃতির রূপ-রীতি বিশ্লেষণে সচেষ্ট থাকব।

এবার ধরা দাও

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এবার ধরা দাও* নাটকের নাট্য কলাকৌশল অভিনব। এ নাটকে জনৈক শিক্ষিত তরুণ পারিবারিক ব্যয়ভার মেটাতে চাকরির সন্ধানে বের হলে নাট্য ক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু চাকরি পেয়েও করবেন কি-না এমন ভাবনা চিন্তা শুরু করলে বাবা তাকে চাকরিটা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। তখন নাট্যক্রিয়া থেকে নাট্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু টাকা উড়ানোর চাকরি করতে অস্বীকার করলে নাট্যদ্বন্দ্ব মুখরিত হয়েছে। তখন বাবা তার একমাত্র মেয়েকে রোজগারের জন্য নিয়োগ করতে চান। বাবা যখন ছেলের নিকট সেই ইচ্ছা অকপটে প্রকাশ করেন তখন নাট্যদ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন :

> আমি শুনেছি, আমাকে অনেকে বলেছে, আজকাল রোজগারপাতি মেয়েরাই ভালো করে। কেন তুই ওকে আটকে রাখবি, কেন? [৬৭]

এরপর বাবার বাড়িতে অপরিচিত লোকের আনাগোনা, তরুণের চাকরিতে যোগদান সম্পর্কে দর্শকের মনে নাট্যোৎকণ্ঠা তৈরি করেছে। অন্যদিকে পলাতক কর্তৃক মহিলার ভাই রাজুর চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ায়

নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি করেছে। আবার মহিলার সমস্ত অর্থ উড়িয়ে তরুণ প্রতিষ্ঠা না পেলে চোখের পলকে অর্থের অভাবে তার বোনের দালালের হাতে পড়ার মুহূর্ত এ নাটকে আকস্মিকতা তৈরি করেছে।

এবার ধরা দাও নাটকের বৃত্ত গড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতে ক্ষয়িষ্ণু নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দশাকে কেন্দ্র করে। বিষয়টি কাহিনির অন্তর্বয়নে মঞ্চের আলোকসম্পাতের মধ্য দিয়ে দৃশ্য থেকে দৃশ্যে অগ্রসর হয়েছে। একই সঙ্গে ঐক্য বিচার করলেও স্থান, সময় ও ঘটনাগুলো একটির সঙ্গে আরেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। একারণে *এবার ধরা দাও* মঞ্চসফল নাটক।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এবার ধরা দাও* নাটকের কাহিনি যুদ্ধোত্তর কালে ভঙ্গুর অর্থনীতির প্রতিবেশে একজন শিক্ষিত বেকার যুবকের চাকরির অন্বেষণকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়েছে। তরুণের বাবা অনেক টাকা খরচ করে তরুণকে শিক্ষিত করেছেন। এখন টাকা উপার্জন করে বাবার ঋণ পরিশোধ করার পালা তরুণের। একারণে তরুণ চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পলাতকের পরামর্শে জনৈক মহিলার পথরোধ করে চাকরি চান। তরুণের সংলাপে তার বেকার জীবনের গ্লানি প্রণিধানযোগ্য :

> আপাতত বাবার কণ্ঠস্বরে কোমলতা এবং অভিব্যক্তিত্বে কিঞ্চিৎ পিতৃসুলভ নমুনা। জানেন, টাকা টাকা করে বাবা আর বাবা নেই। বাবাকে মনে হয় অপরিচিত কেউ। ভাবতে পারেন সামান্য টাকার জন্য জন্মদাতার পরিচয় পর্যন্ত লোপ পেতে বসেছে।
>
> [...]
>
> আর কিছু না। আমাকে সুট করে এমন একটা কাজ পেলেই আমি বেঁচে যাই।[৬৮]

এদিকে পলাতক তরুণের বাবাকে তরুণের চাকরি পাওয়ার খবর জানান। আর মহিলা তরুণকে চাকরির জন্য শর্ত জুড়ে দেন যে, তার জমানো রাশি রাশি টাকা উড়িয়ে দিয়ে তাকে কষ্ট দিতে হবে। কিন্তু তরুণ মহিলার এমন আজব কাজের ধরণ শুনে হেসে উড়িয়ে দেন। তখন তরুণের বাবা একমাত্র মেয়েকে দিয়ে টাকা-পয়সা রোজগারের পরিকল্পনা করেন। তরুণ বাবার কীর্তিকলাপে ফুঁসে উঠে বোনের সম্ভ্রম রক্ষায় টাকা উপার্জন করতে আবার কাজটা করার জন্য পলাতকের কাছে ছুটে যান। তরুণ জানতে পারেন পলাতকই মহিলার স্বামী। টাকার জন্য মহিলা একদিন মফস্বল শহরের সুখী দাম্পত্য জীবন ছেড়ে পলাতকের সংসার-জীবন থেকে আলাদা হয়েছেন। তখন তরুণ পলাতককে জানান যে, তার স্ত্রী তার জন্য অপেক্ষা করছেন। পলাতক খুশি হয়ে স্ত্রীর নিকট ছুটে যান। আর তরুণ বোনকে রক্ষায় হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পলাতকের নিকট কিছু টাকার জন্য আকুতি জানান। কিন্তু টাকা

নিয়ে এগিয়ে আসেন দ্বিতীয় পথচারী। বিনিময়ে তরুণের বোনকে পথচারীর হাতে তুলে দিতে হবে। একারণে নাট্যকাহিনির সমাপ্তিতে দর্শকদের মনে তরুণের নিক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

> আপনাদের একটা জেনারেশন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা কি তাকে হারিয়ে যেতে দেবেন? ধ্বংস হতে দেবেন?[৬৯]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এবার ধরা দাও* নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে পলাতক, তরুণ, মহিলা, বোন, রাজু ও পথচারী উল্লেখযোগ্য। এ নাটকে বাড়িওয়ালা, নেপথ্য কণ্ঠস্বর ছাড়া মোট চরিত্র আটজন। তরুণ এ নাটকের প্রধান চরিত্র। তার শরীরের 'রক্ত টগবগ করে ফুটছে'। সদ্য বি.এ পাশ করা তরুণ বাবার অভাবের সংসারে হাল ধরতে কাজ অর্থাৎ চাকরি সন্ধান করছেন। কিন্তু বাস্তবে চাকরি করার বা বাগানোর অভিজ্ঞতা তরুণের নেই। তার মতো শিক্ষিত বেকার তরুণেরা চাকরির অভাবে যে পথে অর্থ উপার্জনের জন্য সন্ত্রাসবাদ, চাঁদাবাজি-ছিনতাই-রাহাজানিকে অবলম্বন হিসেবে বেছে নেন, সৎ-নির্ভীক তরুণ সেই পথ পছন্দ করেন না। একারণে দ্বিতীয় পথচারী তার হাতে রিভলবার ধরিয়ে দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেন :

> প্রকাশ্য দিবালোকে মাতাল হচ্ছে, নেক্সট জেনারেশনের হাতে পিস্তল ধরিয়ে দিচ্ছে, তবু এরাই একেকজন মহাপুরুষ। এ্যাকটিভিটি বলতে এরা বোঝে ভায়োলেন্স। কাজ চাইলেই ভায়োলেন্ট হবার পরামর্শ দেয়–তবু এদের কোনো দোষ নেই–এরাই মহাপুরুষ।[৭০]

তরুণের এই খেদোক্তি তার চরিত্রের সততা, দৃঢ়তা ও তার শিক্ষা-সংস্কারের মার্জিত রূপকে প্রকাশ করেছে। তরুণ শিক্ষিত বাবার বোঝা হয়ে থাকতে চান না। তিনি বাবার কষ্ট দূর করতে যেমন সংকল্পবদ্ধ, তেমনি দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিপীড়িত ব্রিটিশ আমলের শিক্ষিত বাবা তার সংসারের অভাব মেটাতে মেয়েকে রোজগারের জন্য কাজে লাগাবেন– এই অভিব্যক্তি জানতে পেরে পুরনো জরা-জীর্ণতায় ভরা সমাজের রীতির বিরুদ্ধে তরুণ প্রচণ্ড ঘৃণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। পুরনো সেই রীতির মেয়েকে দিয়ে যৌনব্যবসা করার সমাজকে তরুণ গলা টিপে মারতে চান। তাই বিক্ষুব্ধ তরুণের সংলাপে প্রতিধ্বনিত এই প্রতিবাদ :

> ওর গলা চেপে ধরব। [...] ওরা জানে না পৃথিবীটা বয়সে বাড়লেও আমরা আছি একটা জেনারেশান– নবীন, বিক্ষুব্ধ। রক্তে আমাদের চঞ্চলতা। এই পৃথিবীর জঞ্জাল আমরা সরাবই।[৭১]

কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার শোষণ-নিপীড়নে, শোষিত-বঞ্চিত নিম্নবর্গীয় তরুণ যেন ভাগ্যের কাছে হেরে যান। একদিকে চরিত্রের দৃঢ়তার দরুণ মহিলার টাকার স্তূপ উড়ানোর কাজ পেয়েও তরুণ কানা

পয়সাও আত্মসাৎ করেননি, অন্যদিকে তার বাবা টাকার অভাবে বোনকে দালালের হাতে তুলে দেওয়ার সমস্ত আয়োজন করলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। তখন বোনকে রক্ষায় মহিলার কাছে ছুটে গেছেন। তরুণের এই দায়বোধ তাকে ভ্রাতৃবোধে উচ্চকিত করেছে। তরুণ বোনের সম্ভ্রম রক্ষায় মহিলার নিকট টাকার জন্য অনুনয় জানিয়েছেন :

> টাকা না পেলে একটা মেয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। যত সময় যাচ্ছে নিজের উপর বিশ্বাস আমার হারিয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্বাসটুকু হারিয়ে গেলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিছু টাকা আমাকে ধার দিন।[৭২]

তবে 'মেয়ের দালাল' দ্বিতীয় পথচারী তরুণকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেন– বিনিময়ে তরুণকে তার বোনের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। তখন নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তরুণ আর্ত-চিৎকার করে বাঁচার আকুতি জানান।

মহিলা এ নাটকে অন্যতম প্রধান চরিত্র। তিনি পুঁজিবাদের মূর্ত প্রতীক। পুঁজি অর্থাৎ অর্থের লালসায় স্বামী-সংসার পরিত্যাগ করে একদিন মহিলা নিঃসঙ্গ জীবনকে বেছে নিয়েছেন। এক সময় তার সংসার-প্রেম-ভালোবাসা-হৃদয়াবেগ সবই পরিপূর্ণ ছিল। পথরোধকারী তরুণের প্রতি মহিলার সংলাপে তার এই হৃদয়াবেগ প্রস্ফূটিত হয়েছে। যেমন :

> ভালো করে তাকালে বুঝতে পারতেন, মন্ত্রমুগ্ধ পুরুষের অসংলগ্ন স্তুতিবাক্যকে প্রশ্রয় দেবার বয়সটা আমি পেরিয়ে এসেছি। তাই বলে ভাববেন না কোনো পুরুষের জীবনে 'প্রথম প্রেম' যে কতবড় মূল্যবান অনুভূতি তা আমি জানি না।[৭৩]

বস্তুত যেদিন থেকে অর্থের লোভ মহিলাকে পেয়ে বসল সেদিন থেকেই তার হৃদয়ের আবেগ উবে গেল। তিনি তিল তিল করে অজস্র অর্থের পাহাড় গড়ে তুললেন। তার একমাত্র ভাই রাজুকে হোস্টেলে রেখে পড়ালেখা শিখিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলেন। কিন্তু অর্থ আর সুখ একসঙ্গে রইলো না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভোগবাদী মানসিকতা একদিন সুদূর মফস্বল শহরের মলিন আকাশ তলের সমস্ত সুখ মুছে দিয়ে মহিলার জীবনকে বিষিয়ে তোলে। এই পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার সঙ্গে জীবনের ঘনীভূত সঙ্কট প্রসঙ্গে মহিলার স্বীকারোক্তি :

> যে টাকার উপর আমি আদরের হাত বুলিয়েছি সেই টাকাই ক্রমাগত ছড়াচ্ছে আমার অন্ধকার, আমার কালিমা। যে টাকা পাবার আগে ভেবেছিলাম না পেলে জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে, সে টাকা পাবার পরে দেখলাম জীবন শুধু অর্থহীন নয়, জীবন হারিয়ে গেছে। বড় কষ্টের রোজগার, তাই বড়ই আক্রোশ।[৭৪]

মহিলা চরিত্রের এই নস্টালজিক মনোভাব তাকে শেকড়ের দিকে টানে। অর্থাৎ তিনি প্রকৃত সুখলাভে পুঁজিবাদের খোলস ছেড়ে আবার সেই মফস্বল শহরের গৃহনীড়ে ফিরে যেতে উন্মুখ হয়েছেন। তরুণের মাধ্যমে সেই খবরটি স্বামীকে জানান। মহিলার এই অভিব্যক্তি তাকে স্বভাবসুলভ নারীতে পরিণতি দান করেছে। মহিলা সৎ, নির্ভীক, কথা দিয়ে কথা রক্ষা করেন। তিনি কাঙ্ক্ষিত কষ্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুণকে প্রতিষ্ঠা স্বরূপ সমস্ত অর্থের মালিকানা দান করেন। মহিলার সংলাপে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়েছে :

> শুনুন, যে কষ্ট পাবার জন্যে ঐ টাকাগুলো আপনাকে উড়িয়ে দিতে বলেছিলাম সে কষ্ট আমি পেয়ে গেছি। টাকাগুলো আর উড়াবার দরকার নেই। আমি ঠিক করছি সব টাকা আমি আপনাকে দেব।[৭৫]

কিন্তু নাট্যকার মহিলা চরিত্র প্রস্ফূটনে রহস্যের জাল বুনে রেখেছেন শিল্পবোধের মধ্যে। কারণ মহিলার উপার্জিত অজস্র টাকা তার স্বামীর ভাষায়, 'টাকার নেশা'। তার নিজের ভাষায়, 'টাকা পেয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া' এবং যুবকের ভাষায় 'টাকাটার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা বড়ই তিক্ত' –এই ইঙ্গিতগুলো অর্থ উপার্জনের উৎসকে রহস্যাবৃত করেছে। মহিলার অজস্র টাকা উপার্জনের পথ ঘুষ না যৌনব্যবসা– তা আমাদের বোধের মধ্য দিয়ে বিচার্য।

বাবা চরিত্রটি *এবার ধরা দাও* নাটকে নাট্যক্রিয়া সংঘটনে সর্বদা ক্রিয়াশীল। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষিত বাবার মাঝে রসবোধও যথেষ্ট। তিনি পলাতকের সঙ্গে ভাসা ভাসা কথায় যেমন ভাব জমিয়ে তোলেন, তেমনি বাড়িওয়ালাকে কথায় মুগ্ধ করে ভাড়া না দিয়ে ফেরৎ পাঠান। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে একদিকে নব্য পুঁজিবাদী অর্থের বিকাশ, অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, সীমাহীন দারিদ্র্য, শিক্ষিত তরুণ ছেলের কর্মসংস্থানের অভাব বাবাকে পাষণ্ড করে তুলেছে। একারণে বাবা একদিন মেয়ের দালালকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তরুণ ছেলে বাঁধা দিলে, বাবা অকপটে তার দারিদ্র্য ও অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেছেন। বাবা চরিত্রের এই পরাজয় পুঁজিবাদী সমাজে ক্ষয়ে যাওয়া মানবিকতা ও চরম লাঞ্ছনার চালচিত্রকে উন্মোচন করেছে। এ প্রসঙ্গে তরুণ ছেলের প্রতি নিম্নবিত্ত বাবার অমানবিক সংলাপ :

> অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই তো নিয়ম। ছেলে যদি উপযুক্ত হতো, উপার্জন করতে জানত তাহলে মেয়ের দিকে আমি হাত বাড়াই? চুপ করে রইলি কেন? দু'চার কথা বল। বল কোন কথাটা আমি অন্যায় বলেছি?[৭৬]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের সৃষ্টি পলাতক চরিত্রটি অদ্ভুত কিন্তু বাস্তব জীবনেও সংসার পলাতক এক রহস্যময় চরিত্র। এ নাটকে পলাতকই একটি ঘটনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার যোগসূত্র স্থাপন করেছেন–

যেন তার স্পর্শে যাদুর কাঠি নাড়ার মতো প্রত্যেকটি চরিত্র নড়াচড়া করেছে। পলাতক স্ত্রী-সংসার বিচ্ছিন্ন ভাসমান পথিক হলেও বাস্তবে একজন পোড় খাওয়া মানুষ। আর দশজন পুরুষের মতো তিনিও স্ত্রীকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে সংসার-জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর টাকার নেশা পলাতককে সংসার বিচ্ছিন্ন করেছে। তাই যখন তরুণের মুখে স্ত্রীর অনুতপ্ত হওয়ার কথা শোনেন তখন আবার সেই সুখের আশায় স্ত্রী-সংসারের দিকে ছুটে চলেছেন। পলাতকের সংলাপে তার চরিত্রের এই রহস্য প্রণিধানযোগ্য :

> আমি এখন মফস্বল কলেজে প্রফেসারি করি। দুজনের সংসারে বড় শান্তি ছিল, সুখ ছিল। ভাবতাম মফস্বল শহরের বিষণ্ন আকাশ দেখে জীবন কাটিয়ে দেব। ঠিক তখনই ওর চোখে নেশা ধরল। টাকার নেশা। আমি সরে এলাম। আজ খবর পেয়েছি টাকা শেষ হয়েছে, আমিও ফিরে যাচ্ছি।[৭৭]

পলাতকের গৃহমুখীনতা তাকে স্বার্থপর করে তুলেছে। তিনি স্ত্রী-সংসারের টানে ছুটে চলেছেন, অথচ যে তরুণকে দিয়ে তিনি স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করেছেন– তার বিপদে সহায়তার হাত বাড়াননি।

এবার ধরা দাও নাটকে বোন চরিত্রটি নিম্নবর্গীয় বাবার চরিত্রকে চরিতার্থ করতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছেন। বোন আর দশজন মেয়ের মতোই ব্যক্তিত্বে, সৌন্দর্যে তেজোদীপ্ত। কিন্তু বাবার অসংলগ্ন কার্যকলাপে দালালকে প্রতিহত করতে উচ্চকণ্ঠ হলেও অসহায় বাবার দারিদ্র্যের নিকট নির্মোহ হয়েছেন। বোনের মতো রাজু চরিত্রটিও মহিলার দুঃখ সংঘঠনে সৃষ্টি। পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার প্রভাবে অসৎসঙ্গের সঙ্গে মিশে রাজু চরিত্রের অধঃপতন ঘটেছে। মহিলার ভাই রাজু, প্রথম পথচারী ও দ্বিতীয় পথচারী প্রমুখ চরিত্র নাট্যঘটনার সঙ্গে যুক্ত।

এবার ধরা দাও নাটকে চরিত্রপোযোগী সংলাপ নাটককে অনন্য প্রাণবন্ত করেছে। এ নাটকের সংলাপ যেমন চরিত্রানুগ, তেমনি আঞ্চলিক ও সংক্ষিপ্ততায় বিষয়কে স্পষ্ট করতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন তরুণের সঙ্গে বাবার সংলাপে মেয়েকে দালালের হাতে তুলে দেয়ার চিত্র থেকে অনুমান করা যায় :

তরুণ : জানো ও লোকটা কে?

বাবা : জানি, মেয়ের দালাল!

তরুণ : ওকে তুমি বাড়িতে ঢুকতে দিলে?

বাবা : দিলাম।

তরুণ : কেন?

বাবা : কারণ আমার বাড়িতেও মেয়ে আছে।[৭৮]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এবার ধরা দাও* নাটকের ভাবনা পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় শোষিত-বঞ্চিত নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের দুর্দশাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ নাটকে চরিত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপ ও সংলাপে যেমন– দ্বিতীয় পথচারী কর্তৃক তরুণের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার চিত্র কিংবা বাবার মেয়েকে দালালের হাতে তুলে দেয়ার বন্দোবস্ত প্রভৃতি ঘটনা দর্শকের মনে ভাবনার উদয় করে।

এবার ধরা দাও নাটকের দৃশ্য বা অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গের রূপসজ্জা ও অঙ্গভঙ্গি নাটককে গতিশীল করে তুলেছে। এ নাটকের চরিত্র, স্থান ও ঘটনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে দৃশ্য শিল্পীত হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এবার ধরা দাও* নাটকে বাবাকে মদ খেয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে– 'ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বনফুল গো' গান গাইতে শোনা যায়। এ নাটকে 'অর্থই অনর্থের মূল'; 'এ ড্রাউনিং ম্যান ক্যাচেস এট এ স্ট্র', 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

এখনও ক্রীতদাস

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের নাটকীয়তা চমৎকৃত। এ নাটকে ক্ষুধার জ্বালায় কাতর বাক্কা মিয়া 'টোস বিস্কুদ দে– আমি চায়ের মইদ্যে টোস বিস্কুট চুবাইয়া চুবাইয়া খামু'[৭৯] বলে তার স্ত্রীর নিকট খাদ্য চাইলে নাট্যক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু ঘরে পান্তার হাঁড়ি থাকলেও স্ত্রী কান্দুনি বাক্কা মিয়াকে খাবার না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে নাট্যপ্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ নাটকটি সর্বত্র দ্বন্দ্ব মুখর হলেও শেষ দৃশ্যে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা বিরোধী কাজী আবদুল মালেকের বিরুদ্ধে যখন মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়া পিস্তল উঁচিয়ে ধরে বলেন, 'কাজী আবদুল মালেক, তৈরি হইয়া যাও।'[৮০] তখন নাট্যদ্বন্দ্ব আরো প্রকট হয়ে ওঠে। এই নাট্যদ্বন্দ্ব থেকেই সামাজিকের মনে নাট্যোৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। এরপর মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার সঙ্গে রাজাকার কাজী আবদুল মালেকের কী ঘটবে তা জানার জন্য সামাজিক উৎকণ্ঠা বোধ করেন। কিন্তু হঠাৎ কাজীর চেলার আগমনে নাট্যশ্লেষ থেকে আকস্মিকতা সৃষ্টি হলে *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের নাটকীয়তাকে শিল্পমণ্ডিত করেছে।

এখনও ক্রীতদাস নাটকের নাট্যবৃত্ত আটটি দৃশ্যের সমন্বয়ে গলাচিপা বস্তিনিবাসী মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার অবহেলিত জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুন এ নাটক রচনায় প্রচলিত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য রীতি বর্জন করলেও এ নাটকের সর্বত্র উত্তেজনা বিরাজমান। সপ্তম দৃশ্যে বাক্কা মিয়া তার

স্ত্রী কান্দুনিকে তালাক দিলে সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। অষ্টম দৃশ্যে বাক্কা মিয়ার করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে ঘটনার প্রশমন ঘটেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের কাহিনি গলাচিপা বস্তির অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার জীবনচিত্রের আখ্যান। এ নাটকের কাহিনি গলাচিপা বস্তির কান্দুনি ও কুঁজোবুড়োর নেপথ্য সংলাপের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। বাক্কা মিয়া অপলক দৃষ্টিতে মর্জিনার দিকে চেয়ে চেয়ে বলেন, 'আমার ক্ষিদা লাগছে...খাওন দে।'[৮১] কিন্তু অভাবের সংসারে বাক্কা মিয়ার সংসারে খাবার জোটে না। বাক্কার স্ত্রী কান্দুনি হাঁড়িতে পান্তা দেখিয়ে দিয়ে ঝিয়ের কাজে চলে যান। এরপর বাক্কার ঘরে কুঁজোবুড়ো ও ফিল্মের প্রডাকশন ম্যানেজার তালেব মিয়া আসেন। মর্জিনা তালেব মিয়ার সঙ্গে চলে যান। দ্বিতীয় দৃশ্যে বিড়ি-সিগারেট না পেয়ে কুঁজোবুড়ো গলাচিপা বস্তির ভর্ৎসনা করতে করতে বাক্কার নিকট আসেন। ওদিকে বস্তির মেয়ে তহুরণ প্রত্যেকদিন ডিউটির কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যান আর রাতে অনেক দেরিতে ফেরেন। তৃতীয় দৃশ্যে মর্জিনা সাজুগুজু করে ফাইটারের সঙ্গে চলে যেতে উদ্যত হলে বাক্কা মিয়া বারণ করেন।

চতুর্থ দৃশ্যে আদম ব্যবসায়ী রাজাকার কাজী আবদুল মালেক এসে বাক্কা মিয়ার খুপরি ঘরটাকে চোরাকারবারি ও অপকর্মের অফিস বানিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে তার ব্যবসায়ের খবরের জন্য কারো আসার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে ওঠেন। এদিকে রাত গড়ায়, কিন্তু মর্জিনা ঘরে ফেরেন না। অস্থির হয়ে ওঠেন বাক্কা মিয়া। কিন্তু কান্দুনি ঠিকই জানেন– তার মেয়ে কোথায় যেতে পারেন। এ দৃশ্যে মেয়ে মর্জিনার জীবনের অনিকেত ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে কান্দুনির সংলাপ :

> মনে কর এইডা ঢাহার শহর– এইহানে খালি উচা উচা দালান, বর বর রাস্তা, লাখে লাখে মটরগাড়ি আর সুন্দর সুন্দর মানুষ। হেইসব কবে শূন্যে মিলাইয়া গ্যাছে। ঢাহার শহর অহন মস্ত জঙ্গল। এই জঙ্গলে মানুষ নাই দেও আছে। খালি খাই খাই করতাছে। এইহানে আর তুমি মর্জিনারে খুঁইজ্যা পাইবা না।[৮২]

এমন সময় রিকশাচালক হারেস এসে কর্মহীন কান্দুনিকে নিয়ে উড়াল দেওয়ার স্বপ্ন দেখান– কান্দুনিকে উতলা করে স্বপ্নের মায়ায় বন বন করে ভাসিয়ে নিয়ে চলেন।

পঞ্চম দৃশ্যে কর্মহীন কান্দুনি সংসারের রোজগারের জন্য পঙ্গু স্বামী বাক্কা মিয়াকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে জোর দিতে থাকলে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। এমন সময় কাজী আবদুল মালেক সেই মেয়ে

(মর্জিনা) যাকে সারারাত ধরে ধর্ষণ করেছে তার খোঁজে আসলে– মর্জিনার বর্ণনায় ভয়াবহ সেই রাতের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। ষষ্ঠ দৃশ্যে গলাচিপা বস্তির ঘরে এক নবজাত শিশুকে নিয়ে কান্দুনি ব্যস্ত, এদিকে হারেস আলী এসে কান্দুনিকে তালাক দেয়ার জন্য বাক্কা মিয়াকে বললে দুজনের বাক্‌যুদ্ধ শুরু হয়। সপ্তম দৃশ্যে বস্তির মাস্তানেরা কাওয়ালি গানের জন্য কান্দুনির নিকট চাঁদার টাকা চাইতে আসেন। কান্দুনি বাঁশের খুঁটির খোপে টাকা খুঁজতে যান। কিন্তু টাকা না পেয়ে আঁতকে উঠে পাশে পড়ে থাকা দা'টা হাতে নিতেই মাস্তানেরা দৌড়ে পালান। রাগে-ক্ষোভে কান্দুনি বাক্কা মিয়ার দিকে তেড়ে যান। মর্জিনা দা'টা ছিনিয়ে নিয়ে বাক্কা মিয়াকে বাঁচান। স্ত্রীর এমন আচরণে বাক্কা মিয়া ক্ষোভে জ্বলে ওঠেন। যে স্ত্রীর নিকট স্বামীর চেয়ে টাকা বড়– সেই স্ত্রীকে বাক্কা মিয়া তালাক দেন। বাক্কা মিয়ার সংলাপে এই করুণ পরিণতি প্রণিবিধানযোগ্য :

> কি? কি কইলি? সোয়ামীর থিকা টেকা বর? যাঃ শালা– তরে আমি তালাক দিলাম।[৮৩]

এভাবে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলতেই হারেস আলী আসেন। কান্দুনি হারেস আলী সঙ্গে বেড়িয়ে গেলে এ অংশে Falling Action সম্পন্ন হয়েছে।

অষ্টম দৃশ্যে শোকে মুহ্যমান বাক্কা মিয়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কুঁজোবুড়ো আসেন। আজ কান্দুনির সঙ্গে হারেসের বিয়ে, কিন্তু 'মায়ের বিয়া দ্যাখতে নাই'– এজন্য মর্জিনা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। কান্দুনি বধূবেশে হারেসকে সঙ্গে নিয়ে বাক্কা মিয়ার সঙ্গে শেষ কথা বলার জন্য আসলে– বাক্কা মিয়া তালাক তুলে নিয়ে কান্দুনিকে কাছে পেতে চান। কান্দুনিও বাক্কা মিয়াকে ছেড়ে চলে যেতে চান না। কিন্তু যেতেই হয়। গভীর রাত্রে মর্জিনা ফিরে পাটি বিছিয়ে শোয়ার আয়োজন করেছেন– এমন সময় তিনজন গুণ্ডা মর্জিনাকে তুলে নিয়ে যায়। মেয়েকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ বাক্কা মিয়া বিক্ষোভে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু কাজীর চেলা হঠাৎ ছুটে এসে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে বাক্কা মিয়াকে কমিউনিস্ট বলে লাথি-গুতো মারেন; এক গুলিতেই বাক্কা মিয়ার সমস্ত চাওয়া শেষ করে দেন। কিন্তু অতিনাটকীয় ভাবে চলচ্চিত্রের 'পো মোশানে' বাক্কা মিয়া রাজাকার কাজী আবদুল মালেক ও তার চেলাকে দুই বগলে চেপে ধরে প্রচণ্ড বিক্ষোভে চিৎকার করে ওঠেন :

> লেম্বু– পচা লেম্বু [...] তগ মতন পচা লেম্বুতে এই দ্যাশ ভইরা গ্যাছে। অহনে তগো লেম্বুচিপা দিয়া খতম করতে হইবো। লেম্বুচিপা, একমাত্র পথ।[৮৪]

নাট্য কাহিনির সমাপ্তিতে বাক্কা মিয়ার এই প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিহত করতে মুক্তিযুদ্ধের নবজাগ্রত চেতনার বীজ প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের প্রধান চরিত্র 'বাক্কা মিয়া সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করেননি, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের বহন করে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার দৃঢ় সংকল্পের মাঝে রয়েছে তার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনা ধারণ করার কারণে বাক্কা মিয়া মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা লাভ করে।'[৮৫] কারণ ১৯৭১ সালে দেশমাতৃকা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে লাখো তরুণ বাঙালির মতো বাক্কা মিয়ার হৃদয়েও দেশপ্রেমের ঢেউ তরঙ্গ উদ্ভাসিত হয়। তাই ট্রাক চালক বাক্কা মিয়া দেশকে হানাদারমুক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধাদের তার ট্রাকে নিয়ে দিনাজপুর সীমান্তের ওপারে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো উড়াল দেন। বাক্কা মিয়ার এই গভীর দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত সংলাপ :

> আমি টেরাক লইয়া দিনাজপুরে গেছি খ্যাপ মারতে। মাল খালাস করছি কি করি নাই, খবর আইলো ঢাকা থিকা খানেরা আইসা পরছে। টাউনের একপাল জুয়ান মর্দ পোলাপান ফাল দিয়া উঠল আমার টেরাকে– কইল, চলেন মিয়াবাই বডারের ওপার– দ্যাশ স্বাদীন করতে হইবো। আমারও শালা কোইতথিকা জানি জোশ আইয়া পরল। ছুটাইলাম পঙ্খীরাজ। বেশিদূর যাইতে পারলাম না। বেদম গোলাগুলির মইদ্যে ফাইসা গেলাম। যহন হুশ হইল, দেখলাম চিত্তর হইয়া পইরা রইছি গাতার মইদ্যে। শালারা গুল্লি মাইরা আমার শইলের পুরা এক সাইড ঝাঝরা কইরা ফালাইছে।[৮৬]

বাক্কা মিয়াদের জীবন কিংবা পায়ের বিনিময়ে দেশ শত্রুমুক্ত হলেও যুদ্ধোত্তর কালে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি মেলেনি। রাষ্ট্রের অবহেলা আর দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়া স্ত্রী কান্দুনি ও কন্যা মর্জিনাকে নিয়ে অসহায়-দারিদ্র্য-অবহেলা-লাঞ্ছনা-বঞ্চনা সহ্য করে শহরের ভদ্র পল্লির শেষ কিনারায় গলাচিপা বস্তিতে আশ্রয় নেন। কিন্তু শত অভাব-দারিদ্র্য গ্রাস করলেও '৭১-এর বীর সৈনিক বাক্কা মিয়ার পিতৃত্ব কিংবা মানবীয় গুণাবলিকে ম্লান করতে পারেনি। একারণে বাড়িতে যুবতী কন্যার সঙ্গে ফাইটারের আগমনে বাক্কা মিয়া শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। ফিল্মে অভিনয়ের নাম করে মেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় দৃঢ়কণ্ঠে মেয়েকে যেতে নিষেধ করেছেন। বাক্কা মিয়ার সংলাপে তার এই পিতৃত্বগুণ প্রণিধানযোগ্য :

> খারা মর্জিনা। কান্দুনি তর মাইয়ারে ঠেকা– অরে যাইতে দিস না। অ নষ্ট হইয়া যাইবো, পইচ্যা যাইবো– অরে ঠেকা– গ্যাল গা ত– ও কান্দুনি গ্যাল গা ত– অহনও ধর, বান, পায়ে বেরী দে– কান্দুনি–[৮৭]

কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে অর্থনৈতিক বৈষম্য, স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থানজনিত কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবহেলা পঙ্গু বাক্কা মিয়ার পিতৃত্ব, ব্যক্তিচেতনা ও আত্মসম্মানকে হ্রাস করেছে।

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক প্রতিবেশে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়াকে স্ত্রীর উপার্জনের উপর নির্ভর করে বাঁচতে হয়েছে। মেয়ের সম্ভ্রম লুণ্ঠনকারী কাজীকে চিনতে পারলেও সামর্থহীন বাক্কা মিয়া নীরবে মেনে নিয়েছেন। আবার স্ত্রী কান্দুনির সঙ্গে হারেস আলীর পরকিয়ার সম্পর্কও তার নিকট স্বাভাবিক মনে হয়েছে। বাক্কা মিয়া চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাকে দোষ-গুণে মানবিক করে তুলেছে। একারণে তিনি স্ত্রীর সঞ্চিত অর্থ চুরি করেন, কাজীর নিকট অর্থ নেন– আড়ালে উলঙ্গ ছবির পোস্টার দেখে কামচেতনা চরিতার্থ করেন। কিন্তু দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করে বাক্কা মিয়ার চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হলেও স্ত্রী কান্দুনি ও মেয়ে মর্জিনাকে হারানোর পর '৭১-এর প্রতিশোধ, প্রতিবিধানে বিদ্রোহী সত্তায় আবির্ভূত হয়েছেন। কাজীর দেয়া পিস্তল উঁচিয়ে কাজীর দিকেই তাক করেন। কিন্তু কাজীর চেলার আক্রমণে নিহত হলেও প্রতিবাদী ভাষায় চিৎকার করে বলেন :

> আমি আমার ঘর, বাড়ি, ভিটা ফেরৎ চাই। আমার বাপ দাদার ভিটা ফেরৎ চাই। আমার হাত ফেরৎ চাই। পাও ফেরৎ চাই। আমি আমার জিন্দেগি ফেরৎ চাই।[৮৮]

বাক্কা মিয়া চরিত্রের এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, হাহাকার মূলত মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক অবস্থায় স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

কান্দুনি *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে অন্যতম মুখ্য চরিত্র। 'কান্দুনি নাম-প্রতীকে নাট্যকার ক্রন্দনরতা বেহাল বঙ্গমাতাকেই দ্যোতিত করেছেন।'[৮৯] বস্তুত কান্দুনি সমগ্র নাটকে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সংসার-নারীত্বের নিকট হার মানা এক চরিত্র। এ নাটকে কান্দুনি পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার সহধর্মিণী। সংসারের শত অভাব-দারিদ্র্যের তাড়নায় পরের বাসায় ঝিয়ের কাজ করতে গিয়ে মালিকের শত গঞ্জনা-অত্যাচার সহ্য করে জীবন সংগ্রামে বিজয়ী এক নারী কান্দুনি। কিন্তু তিনি ক্ষুধা-দারিদ্র্যের নিকট পরাজিত হয়েছেন। জীবন সম্পর্কে কান্দুনির অভিজ্ঞতা এতই গভীর যে, সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় মেয়েকে ফিল্মের কাজে যেতে বাক্কা মিয়া নিষেধ করলেও কান্দুনি সম্মতি জানিয়েছেন। কারণ :

> এই রহম শতে শতে, হাজারে হাজারে মর্জিনা পেত্যেকদিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে, পইচ্যা গইলা যাইতাছে। কে কার খুঁজ রাহে?[৯০]

সহধর্মিণী কান্দুনি পঙ্গু বাক্কা মিয়ার সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরলেও ব্যক্তি কান্দুনি ক্ষুধার নিকট পরাজিত হয়েছেন। একারণে মেয়ের সম্ভ্রমহানি জেনেও ফিল্মের কাজে যেতে যেমন সায় দিয়েছেন, তেমনি বাসা-বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে চুরি করেছেন। আবার বাক্কা মিয়াকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের

জন্য জোর দিয়েছেন। অতৃপ্ত যৌবন-বাসনা পূরণে হারেস আলীর সঙ্গে কান্দুনি অসামাজিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। কান্দুনি চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তিমাধুর্যকে হ্রাস করলেও একজন দায়িত্বশীল স্ত্রী ও মা হিসেবে তাকে মহিমান্বিত করেছে। কিন্তু ধর্মীয় কুসংস্কার বা জ্ঞানহীনতার দরুণ কান্দুনি মৌখিক তালাক গ্রহণ করে বাক্কা মিয়ার ঘর ছেড়ে হারেস আলীকে বিবাহ করেছেন। আবার প্রচণ্ড আঘাতে কান্দুনি স্বীকার করেন বাক্কা মিয়া তার পরম আশ্রয়। বিবাহের আগে বাক্কা মিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এলে জীবন সম্পর্কে এমন বোধ কান্দুনিকে মানবিক করে তোলে। কান্দুনির সংলাপে এ জীবনবোধ :

> না। যামু না। তুমি ছুও আমারে। ছুও– আমি কইতাছি, তুমি আমারে ছুইবা।[৯১]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের মর্জিনা চরিত্রটি *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের বিষয়-বস্তুকে আরো লক্ষ্যভেদী করে তুলেছে। এ নাটকে মর্জিনা অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হলেও গলাচিপা বস্তির পঙ্গু বাক্কা মিয়ার সংসারে শত অভাব-দারিদ্র্যের কষাঘাতে লালিত-পালিত সমাজ বাস্তবানুগ চরিত্র। বাবার দারিদ্র্যের ভার বহন করতে মর্জিনা আরব্য উপন্যাসের মর্জিনার মতো কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেন। কিন্তু আরব্য উপন্যাসের মর্জিনা তার পিতৃতুল্য মনিবকে ডাকাতের কবল থেকে রক্ষা করতে পারলেও– নাটকের মর্জিনা পরিশ্রম করে পঙ্গু বাবার অভাব-দারিদ্র্যকে দূর করতে পারেননি; বরং যুদ্ধোত্তর সন্ত্রাসকবলিত সমাজবাস্তবতায় নিজের সম্ভ্রম হারিয়ে ঘরে ফিরে এসেছেন। মর্জিনার চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কতিলক ফুটে উঠেছে– তার সংলাপে :

> বাবাগো, অরা আমারে নষ্ট কইরা দিছে। আমি পইচ্যা গেছি। আমি বেহুশ হইয়া গেছিলাম। অরা আমারে-[৯২]

এখনও ক্রীতদাস নাটকে ফাইটার গৌণ চরিত্র হলেও মানবিকতায় উত্তীর্ণ। ফাইটার সমাজে 'জাউরা' পোলা নামে পরিচিত। যুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতায় তার ঠিকানা হয় রাজাকার কাজী আবদুল মালেকের কু-কর্মের সহকারী হিসেবে। কিন্তু মর্জিনার সম্ভ্রমহানির ঘটনা তাকে এতটাই আঘাত দেয় যে, প্রেম-ভালোবাসা, দয়া-মানবিকতায় পরিপূর্ণ হৃদয়বান ফাইটার পঙ্কিলতা থেকে আলোর পথে বেরিয়ে আসেন। একারণে মর্জিনাকে কাজীর লোকেরা গুম করার পরিকল্পনা করলে ফাইটার রক্ষা করার জন্য ছুটে আসেন। ফাইটারের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য তার সংলাপে প্রণিধানযোগ্য :

> কাজী আবদুল মালেক–হারামীর বাচ্চা– অর কামই হইল মাইয়া ধরা– গেরামের বস্তির। [...] আমার মায়ের কসম, আপনে সাবধানে থাইকেন। মর্জিনারে সাবধানে রাইখেন। আমি যাই।[৯৩]

কিন্তু ফাইটার শেষ পর্যন্ত মর্জিনাকে রক্ষা করতে পারেননি। মর্জিনাকে উদ্ধার করতে যাওয়ার আগেই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

কাজী আবদুল মালেক *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে গৌণ হয়েও মুখ্য চরিত্রের ন্যায় সমগ্র নাট্যকাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। যুদ্ধোত্তর কালে সমাজের সমগ্র অশুভ শক্তির প্রতীক কাজী আবদুল মালেক। তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধোত্তর কালে নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রতিবেশে দাঁড়িয়ে মানবপাচার, নারী পাচার ও বস্তির নারীদের দ্বারা দেহব্যবসা প্রভৃতি অপকর্মের রাজত্ব বিস্তার করেছেন। কাজী চরিত্রের এই বীভৎস রূপটি তার সংলাপে অনুমান করা যায়। যেমন :

> কালেক্ট করি– জুগার করি– কইরা লেবার বানাইয়া আরবে পাঠাই। বাইচ্যা যায় মিয়া– যাওনের সুময় একেক শালা শইলে লইয়া যায় খালি কয়খান হাড্ডি– বছর দেড় বছর পরে যহন ওয়াপছ আসে তহন একেকটারে দেহায় যেমন খোদার খাসী– গোস্তের কাচারি।[৯৪]

যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতা বিরোধী কাজীর প্রতিপত্তি এতটাই বেড়ে যায় যে, তার অপকর্ম মুছে ফেলতে মর্জিনাকে ধর্ষণের পর গুম করতে রাতের আঁধারে তুলে নিয়ে যান। বাক্কা মিয়া চিনতে পারলে কাজী আবদুল মালেক টাকার লোভ দেখিয়ে চুপ থাকতে বলেন। প্রতিবাদী বাক্কা মিয়া গুলি করতে উদ্যত হলে নিষ্ঠুর কাজী আবদুল মালেক '৭১-এর পরাজয়ের গ্লানিজনিত প্রতিশোধের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠেন। মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়াকে লাথি-থাপ্পর মেরে হত্যার জন্য তার চেলাকে নির্দেশ দেন। কাজীর হৃদয়ের উদ্‌গিরিত এই প্রতিশোধের আগুন তার সংলাপে :

> শালা কমুনিস্ট। বজ্জাত লুলা। কাজী আবদুল মালেকের সিনায় গুল্লি মারতে চায়? মার শালারে মার। পিস্তলের চ্যাম্বারে যত গুল্লি আছে ব্যাবাক খরচা কর।[৯৫]

মূলত কাজী চরিত্রের এ প্রভাব যুদ্ধ পরবর্তী কালে পরাজিত শক্তির উত্থান ও বিকাশ প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু একাত্তরের বীরযোদ্ধা বাক্কা মিয়া জেগে উঠলে রাজাকার কাজী আবদুল মালেক পরাজিত হয়েছেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে আঙুরী, তহুরণ, হারেস আলী, তালেব, কুঁজোবুড়ো প্রভৃতি চরিত্র বিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়া ৪জন মাস্তান, ২জন পুলিশ, কাজীর ২জন চেলা নাট্যঘটনাকে সক্রিয় করেছে।

এখনও ক্রীতদাস নাটকের পাত্রপাত্রীদের সংলাপ গলাচিপা বস্তিবাসী সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী। এ নাটকের ভাষা বস্তিবাসী ঢাকাইয়া আঞ্চলিক রীতির, সংক্ষিপ্ত অথচ বিষয়কে শাণিত করে তোলে। যেমন ফাইটার ও মর্জিনার সংলাপে আবদুল্লাহ আল-মামুনের সংলাপ রচনার নৈপূন্য প্রণিধানযোগ্য :

মর্জিনা : আপনে এট্টু খারান বাই– আমি দেহি তহুরণ ডিউটি থিকা ফিরছে নাকি।

ফাইটার : কিসের ডিউটি করে ঐ ছেমরী?

মর্জিনা : ডিউটি মানে বুঝলেন না?[৯৬]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের চরিত্রগুলির সংলাপ-ক্রিয়াকলাপ, চরিত্রগুলোর বিকাশ, মানস ও কল্পনাশক্তির মধ্য দিয়ে বাক্কা মিয়া তথা একজন মুক্তিযোদ্ধার অবহেলিত জীবনের চালচিত্র এ নাটকের ভাবনাকে লক্ষ্যণীয় করে তুলেছেন। এ নাটকে নানা আঙ্গিক ও মহিমায় যুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা ভাবনা রূপে চিত্রিত হয়েছে।

এখনও ক্রীতদাস নাটকের দৃশ্যসজ্জা অসাধারণ। এ নাটকে **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বর্বরতা ফুটিয়ে তুলতে বাক্কা মিয়ার পঙ্গু বেশ, তহুরণের কার্যকলাপ দ্বারা বস্তির মেয়েদের ক্লেদাক্ত জীবন, কাজীর সংলাপে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার অসাধারণ রূপে ফুটে উঠেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুনের অনেক নাটকের মতো *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে কোনো মৌলিক সংগীতের ব্যবহার নেই। তবে এ নাটকে মর্জিনা কয়েকটি কলি যেমন: 'ও দরিয়ার পানি [...] তর মতলব জানি' গেয়েছেন। উপমার ব্যবহার *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে দুর্লক্ষয় নয়, তবে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার এ নাটকে নেই।

তোমরাই

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই* নাটক আগাগোড়া নাটকীয়তায় পূর্ণ। এ নাটকে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান রঞ্জুর বিদ্রোহ কোন পরিণতি লাভ করবে তা থেকে দর্শকের মনে নাট্যক্রিয়ার সৃষ্টি করে। *তোমরাই* নাটকে চরিত্রগুলোর মধ্যে যেমন নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে, তেমনি এক চরিত্রের সঙ্গে আরেক চরিত্র যেমন– মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি ননী ব্যানার্জী, মা, বাবা ও মুক্তিযোদ্ধা আকবরের সঙ্গে বিপক্ষ শক্তি রাজাকার-আলবদর হায়দার আলী, মোবারক, গোলাম রব্বানীর দ্বন্দ্ব সমগ্র নাটককে স্বতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে।

তোমরাই নাটকে মুক্তিযুদ্ধের দুই পক্ষশক্তির দ্বন্দ্বজনিত কারণে রঞ্জুর বিদ্রোহী সত্তা নাট্যোৎকণ্ঠা তৈরি করেছে। আবার রাজাকার হায়দার আলী কর্তৃক ব্যবহৃত রঞ্জুরা হয়তো ননী ব্যানার্জীর দোকান উচ্ছেদসহ নানা অঘটন ঘটাবেন– আপাতদৃশ্যে এমন মনে হয়েছে। কিন্তু রঞ্জুরা হায়দার আলীর বিরুদ্ধে গেলে নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি করেছে। তবে *তোমরাই* নাটকে শেষ দৃশ্যে মা, বাবা, ননী ব্যানার্জী, বাবলু, টোকন, শমসের প্রমুখ চরিত্রের একত্রীকরণ ও রঞ্জু কর্তৃক রাজাকার হায়দার আলীর মৃত্যু অতিনাটকীয় দোষের সৃষ্টি করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই* নাটক মোট ১৪টি দৃশ্যের সমন্বয়ে রচিত। এ নাটকের সর্বত্র উত্তেজনা বিরাজমান। তবে সপ্তম দৃশ্যে রাজাকার হায়দার আলী মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জীর দোকান উচ্ছেদের জন্য রঞ্জুকে নির্দেশ দিলে সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে এবং ত্রয়োদশ দৃশ্যে শমসেরের হাত থেকে পিস্তল নিয়ে রঞ্জু স্বাধীনতার শত্রু হায়দার আলীকে ধাওয়া করলে ঘটনার প্রশোমন ঘটেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই* নাটকে সময়, স্থান, ক্রিয়া এই তিন ঐক্য যথাযথভাবে মানা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারদের হাতে বিকশিত বিনাশী অর্থনৈতিক প্রভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের বিপদগামী তরুণ সমাজের বিক্ষুব্ধ জীবনকাহিনি নিয়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই* নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে। এ নাটকের প্রথম দৃশ্যে স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বারা বিভ্রান্ত যুবক রঞ্জু তার দলবল নিয়ে রাস্তায় বোমা ফাটিয়ে ছিনতাই করতে প্রবৃত্ত হন। দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বাধীনতা উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রঞ্জুদের পরিবারের অবহেলিত জীবনযাপনের চিত্র পাওয়া যায়। তৃতীয় দৃশ্যে রাজাকার হায়দার আলী তার মেয়ে লুনার হাত থেকে ফোন রিসিভ করে অপর প্রান্তের ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনকালে রাজাকারদের তালিকায় তার নাম উঠলে বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া দেখান। শমসের, টোকন ও রঞ্জুরা হায়দার আলীকে তার অপকর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত করলে বিনয়ী হয়েছেন। রঞ্জুর হাতে টাকার বাণ্ডিল তুলে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল রচনা করেন। হায়দার আলীর সংলাপে তার দেশবিরোধী চেতনা প্রণিধানযোগ্য :

> ওই যে শমসের ছেলেটা, আমার মুখ থেকে স্বাধীনতার গপ্পো শুনতে চায় না, আমাকে বলে দেশের নামকরা শত্রু, ওর দিকে একটু নজর রেখো। দেশটেশ নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করে মনে হয়। [...] তোমাদের রাজনীতি করার প্রয়োজন নেই। মনে প্রাণে জোস এসে গেলে একটু গুলি-টুলি ছুঁড়লে, বোমা-টোমা ফাটালে। ব্যস ওই যথেষ্ট। কিন্তু রাজনীতি নয়। নাও টাকাটা রাখো।[৯৭]

চতুর্থ দৃশ্যে মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জী, আকবর, রঞ্জুর বাবা-মা সবার কথায় গভীর দেশপ্রেম, যুদ্ধের কাহিনি, মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও হানাদারদের নির্যাতনের বর্ণনা নাট্য ঘটনাকে উত্তুঙ্গ করে তুলেছে। পঞ্চম দৃশ্যে এক বিকেলে কোনো একটা পার্কে প্রেমিক রায়হান তার প্রেমিকা সায়রাকে আর অপেক্ষা না করে দ্রুত বাবা-মায়ের সংসারের ভার রেখে নিজের সংসারের ভার কাঁধে নিতে বলেন। ষষ্ঠ দৃশ্যে বীরু মামার সঙ্গে ননী ব্যানার্জী ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি ও রঞ্জুর নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করেন। সপ্তম দৃশ্যে পর মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জী স্বাধীনতা বিরোধী হায়দার আলীর দোকান ছেড়ে দেয়ার অবৈধ নোটিশের প্রতিবাদ জানাতে আসেন। কারণ মুক্তিযোদ্ধা ননীবাবু 'এনিমি প্রোপার্টি' ভোগদখলকারী একজন রাজাকারের অবৈধ নোটিশে ভীত-সন্ত্রস্ত নন, বরং তিনি পথভ্রষ্ট রঞ্জুদের আবার বুকে ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জীর এই প্রত্যাশা তার সংলাপে :

> আপনিও জেনে রাখুন, এরা আমাদের সন্তান। একদিন না একদিন এরা ঘরে ফিরবেই।[৯৮]

অষ্টম দৃশ্যে টোকন, শমসের ও বাবলুরা মামাকে (রঞ্জুর মামা) জনতার রোষানল থেকে রক্ষা করে রঞ্জুর নেতৃত্বে ননী ব্যানার্জীর দোকান উচ্ছেদ করতে যান। নবম দৃশ্যে ননী ব্যানার্জী '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত ভাষণ শুরু করলে রঞ্জুরা কাত হয়ে পড়েন। দশম দৃশ্যে নব-বিবাহিতা সায়রা তার স্বামী রায়হান বিয়ের পরেও হেল্প করার আশ্বাস দিলে মা সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। সায়রার চলে যাওয়ায় রঞ্জু চিন্তিত হন। এ দৃশ্যে মা যখন রঞ্জুকে বলেন, 'কি জানিস তুই হায়দার আলী সম্পর্কে? আমাদের আজকের এই অবস্থার জন্যে দায়ী কে? কে তোর বাবাকে পাকিস্তান আর্মির হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল?'[৯৯] তখন রঞ্জুর ভুল ভেঙে যায়। একাদশ দৃশ্যে হায়দার আলী– একজন মালিকের পোষা কুকুরকে গুলি করার গল্প বলার মধ্য দিয়ে রঞ্জুকে মেরে ফেলার ইঙ্গিত দেন। এমন সময় রঞ্জু এসে হায়দার আলীকে মানুষ আর কুকুরের পার্থক্য বোঝার মধ্য দিয়ে গল্পটার সার্থকতা খুঁজতে বলেন। দ্বাদশ দৃশ্যে ননী ব্যানার্জীর দোকানে রঞ্জুর জন্য উদ্বিগ্ন মা মুক্তিযোদ্ধা আকবরের সঙ্গে আলাপকালে গোলাম রব্বানীকে স্বাধীন বিরোধীদের ঔদ্ধত্য ও স্বাধীনতার পক্ষের মানুষের করুণ অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু ননী ব্যানার্জী সামান্য বিচলিত নন। ত্রয়োদশ দৃশ্যে হায়দার আলীর পরামর্শে গোলাম রব্বানী মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জীর দোকানে আগুন ধরিয়ে দেন। এদিকে গোলাম রব্বানী মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জীর দিকে পিস্তল তাক করতেই আকবর আগলে ধরেন। এমন সময় রঞ্জুরা প্রবেশ করলে হায়দার আলী ও গোলাম রব্বানী দৌড়ে পালাতে উদ্যত হন। চতুর্দশ দৃশ্যে মুক্তিযুদ্ধের শাণিত চেতনায়

উজ্জীবিত রঞ্জু বিদ্রোহে জ্বলে উঠে রাজাকার হায়দার আলীকে থামিয়ে দেন। তাই বিদ্রোহী রঞ্জু রাজাকার হায়দার আলীকে জানিয়ে দেন :

> পোষা কুকুর আর পোষা মানুষ এক নয়। এ কথাটাই আজ বুঝিয়ে দিতে চাই।[১০০]

কিন্তু রঞ্জুর প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগেই মা এগিয়ে এসে তীব্র ঘৃণায় '৭১-এর পরাজিত রাজাকার হায়দার আলীর কলার চেপে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জু পিস্তল দিয়ে হায়দার আলীর বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেন। এরপর মা স্বাধীনতা বিরোধী নবোত্থিত শক্তিকে প্রতিহত করতে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আকবরের লাশ নিয়ে প্রতিবাদে জ্বলে ওঠার আহ্বানের জানান। এর মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই* নাটকে কুড়িজন চরিত্রের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তরুণ সমাজের প্রতিনিধি রঞ্জু কেন্দ্রীয় চরিত্র। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক প্রতিবেশে বেকার-কর্মহীন যুবক রঞ্জু একাত্তরের রাজাকার হায়দার আলীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে বোমাবাজি আর অস্ত্রের ঝংকারে ছিনতাই, লুটতরাজ, চাঁদাবাজি প্রভৃতি অপকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে নষ্টদের প্রতীক করে তোলেন। অথচ রঞ্জুর বাবা একসময়ের ডাকসাইটে উকিল–মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হলেও, তিনি বাবার আদর্শের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। জীবনকে প্রতিষ্ঠার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে বেছে নিয়েছেন। রঞ্জুর সংলাপে তার চরিত্রের এ অধঃপতন স্পষ্ট হয়েছে :

> বাড়ি? কোনটাকে তুমি বাড়ি বলছ বাবা? এটা তো একটা গোয়াল ঘর। এখানে বাস করে মানুষ নামধারী কিছু জন্তু। এ বাড়ি আমাকে কি দিয়েছে? [...] দিয়েছে একটা সেলাই মেশিন। আমার মা সেটা কেবল ঘোরাচ্ছে। আর দিয়েছে তোমাকে, একটা পাগলা বাপ। একেকবার আমার ইচ্ছে হয় বোমা মেরে এই বাড়িটাকে উড়িয়ে দিই শূন্যে।[১০১]

বয়সের তাড়না মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিনাশী অর্থনৈতিক প্রতিবেশ রঞ্জুকে একাত্তরের রাজাকার হায়দার আলীর দাবার গুটিতে পরিণত করেছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান রঞ্জু রক্তের আদর্শ ভুলে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও যেন আত্মহননের পথ বেছে নেন। মায়ের আত্মমর্যাদা, বোনের শাসন, ননী ব্যানার্জীর স্নেহ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনো কিছুই রঞ্জুকে আটকাতে পারে না। হায়দার আলীর নির্দেশে তিনি 'এনিমি প্রোপার্টি'তে গড়ে ওঠা ননী ব্যানার্জীর গার্মেন্টস কাপড়ের দোকানটা উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। হায়দার আলীর নিকট ওয়াদাবদ্ধ রঞ্জুর সংলাপে তার চরিত্রের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম প্রণিধানযোগ্য :

ভাববেন না। ননীকাকাকে গাল দিতে পারলাম না। কিন্তু তার দোকানটা ঠিকই উঠিয়ে দেব?[১০২]

কিন্তু রঞ্জুর জন্মই হয়েছে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত চেতনার ধারায়। সাময়িক কালের জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির সুযোগে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা অর্থ আর ক্ষমতা অপব্যবহার করে রঞ্জুদের ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেও তাঁদের হৃদয় থেকে এ চেতনা মুছে ফেলতে পারেননি। ননী ব্যানার্জীর মুখে শোনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আর মায়ের কাছে শোনা হায়দার আলীদের একাত্তরের বর্বরতার চিত্র রঞ্জুর বিবেককে বিদ্রোহী চেতনায় জাগিয়ে তোলে। একারণে পিতৃপুরুষের ঔরসজাত মুক্তিযুদ্ধের নবচেতনায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে বীরের মতো শমসেরের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে রঞ্জু পলায়নপর রাজাকার হায়দার আলীকে ধাওয়া করেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি দোসরদের প্রতীক রাজাকার হায়দার আলীকে প্রতিহত করেন। রঞ্জুর সংলাপে এ বিদ্রোহ প্রতিবিধানযোগ্য :

> আমার বাবাকে পাকিস্তান আর্মির হাতে ধরিয়ে দাও। আমার মাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে বেড়াও। ননীকাকার দোকানে আগুন লাগাও। পঙ্গু এক মুক্তিযোদ্ধার বুকে গুলি চালাও। কেন? কি অপরাধ করেছে এরা?[১০৩]

পিতৃপুরুষের ওপর রাজাকারদের অত্যাচারের গ্লানি, সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে হতাশাবোধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নববিকাশ, ইতিহাসের সত্যে ব্যক্তিত্বের উন্মোচন রঞ্জুকে আত্মশুদ্ধ করে বিপথ থেকে সুপথে একজন বিদ্রোহী চরিত্রে রূপান্তরিত করেছে। বস্তুত রঞ্জু হায়দার আলীকে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের নবচেতনার ধারা তরুণ প্রজন্মের নিকট নবরূপে প্রবাহিত করেছেন।

এ নাটকে ননী ব্যানার্জী চরিত্রটি নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের স্বাধীনতা উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা প্রবাহের ধারক এবং বাহক। ননী ব্যানার্জী নাট্যকারের চেতনা-প্রসূত বর্তমান প্রজন্মকে ইতিহাসের বিভ্রান্তি ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করতে সর্বদা ব্যাকুল। তিনি যুদ্ধোত্তর কালে পাকিস্তানের দোসর রাজাকার-আলবদর হায়দার আলীদের প্রতিহত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একারণে সাময়িক উত্তেজনায় রঞ্জু দিকভ্রান্ত হলেও হায়দার আলীর মতো রাজাকারের কবল থেকে ফেরাতে মুক্তিযোদ্ধা কান্তা ও জাফরকে আহ্বান জানান। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে উদ্বিগ্ন ননী বাবু রঞ্জুর মাকে জানান যে :

> রঞ্জু তোমার ছেলে। ওর প্রতি তুমি এতটা উদাসীন থাকতে পারো না। ও এখন একটা বিপজ্জনক বয়স পার হচ্ছে। ওকে যে করে হোক ফেরাতে হবে।[১০৪]

ননী ব্যানার্জী একজন প্রতিবাদী-বিদ্রোহী দেশপ্রেমিক। একাত্তরের রণাঙ্গনে যেমন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন, তেমনি স্বাধীনতার পরও রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে পুনর্বাসিত রাজাকারদের প্রতিহত করতে এদেশের মানুষকে সভা-সেমিনারে বক্তৃতা দিয়ে সর্বদা সচেতন করতে সচেষ্টপ্রাণ হয়েছেন। বিশেষত ননী ব্যানার্জী দিকভ্রান্ত রঞ্জুদের মতো তরুণ প্রজন্মকে যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতার সত্য ইতিহাসে উজ্জীবিত করে তুলতে চান। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় রঞ্জুরা জেগে উঠলে পুনর্বাসিত রাজাকার-আলবদররা স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে চিরতরে পরাজিত হবেন। একারণে ননী ব্যানার্জী একাত্তরের রণাঙ্গণের বীর সৈনিক কান্তা ও কবিরের বীরত্বগাথা তাদেরই সন্তান রঞ্জুর নিকট প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে ননী ব্যনার্জীর বলেন :

> তুমি কবিরের ছেলে, কান্তার ছেলে। কে এই কবির? কে এই কান্তা? এরা হচ্ছে সেই কবির, সেই কান্তা যারা এই অভাগা দেশটার জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছে সারাটা জীবন।[১০৫]

ননী ব্যানার্জী বিজয়ী বীরের জাত– পরাজয় তাঁকে মানায় না। তিনি যুদ্ধোত্তর কালে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের যে সত্য স্বরূপ তুলে ধরেছেন তা দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে আলো ছড়িয়েছে। তাঁর সঞ্চারিত চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে বিভ্রান্ত রঞ্জুরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পথে রাজাকার হায়দার আলীদের নিশ্চিহ্ন করেছেন। ননী ব্যানার্জীর সংলাপে এ সত্য নিরূপণ করা যায়। যথা :

> ঋণ শোধ হয়েছে রঞ্জু। একদিন হায়দার আলীকে বলেছিলাম, তোরা আমাদের সন্তান। একদিন না একদিন তোরা ঘরে ফিরবিই। কথাটা বলেছিলাম বড়মুখ করে, মাথা উঁচিয়ে। তুই আমার মুখ রক্ষা করলি।[১০৬]

মা চরিত্রটি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সংকটে যাপিতজীবনের বাস্তবতায় নীতি-নৈতিকতায় আত্মমর্যাদাপ্রবণ, প্রতিবাদী সুগৃহিণী। অথচ স্বাধীনতার পূর্বে ও স্বাধীনতাযুদ্ধ কালে মা ছিলেন একজন রাজনীতিক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। ন্যায় এবং সাম্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তিনি যেমন রাজনীতির ময়দানে নিষ্ঠাবান ছিলেন, তেমনি প্রখর নেতৃত্বদান করেছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আঘাতে বিপর্যস্ত প্রতিবেশে সমকালীন রাজনৈতিক ব্যর্থতায়, মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা-প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হয়ে মা গৃহমুখী হলেও নবোত্থিত রাজাকার হায়দার আলীদের নিশ্চিহ্ন করতে নিরাসক্ত-নিশ্চুপ থাকতে পারেননি। রঞ্জুদের মতো তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগিয়ে তুলতে মা চরিত্র বিদ্রোহ-প্রতিবাদের অগ্নি উত্তাপে দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছেন। একাত্তরে মা যেমন স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে মানুষকে আন্দোলন-সংগ্রামে মুখরিত করেছিলেন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে দেশদ্রোহী রাজাকার-দোসরদের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়েছেন। একারণে তীব্র ঘৃণা আর অগ্নি উত্তেজনায় মা রাজাকার হায়দার আলীর শার্টের কলার চেপে ধরে একাত্তরের কৃত কর্মের জন্য জবাব চান। মায়ের সংলাপে এই বিদ্রোহ :

> পুলিশের কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে তুমি একাত্তরে আমার পুর পরিবারটাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলে। পারোনি। হায়দার আলী চেয়ে দ্যাখ, এখনও বেঁচে আছি। তবে একটা কাজ তুমি পেরেছ। আমার ছেলেটাকে তুমি নষ্ট করে দিয়েছ। [...] হায়দার আলী, ভেবেছ সব ভুলে গেছি? হিসেব চুকিয়ে দাও। আমার সব হিসেব আজ তোমাকে চোকাতেই হবে। পাই পাই হিসেব। ছাড়ব না। তোমাকে আমি ছাড়ব না হায়দার আলী।[১০৭]

মা চরিত্রে এ বিদ্রোহ তার সহজাত গভীর দেশপ্রেম থেকে উৎসারিত হয়েছে।

আকবর মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের চরিত্রগুলোর অন্যতম। আকবর একাত্তরে রণাঙ্গনে পঙ্গুত্ব বরণ করলেও দেশ স্বাধীনের পর প্রতিবাদী চেতনায় মুখরিত হয়েছেন। আকবরের এই চেতনার মূলে রয়েছে গভীর দেশপ্রেম। দেশ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তার অনুভূতি :

> স্বাধীন দেশ। মানুষের মুখে হাসি। ওরা বুক উঁচু করে হাঁটে। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। এই তো চেয়েছিলাম। এরইজন্যে ত যুদ্ধ করছিলাম।[১০৮]

আকবরের দেশপ্রেম, আত্মসম্মান তাকে এতটাই উচ্চকিত করেছে যে, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি রাজাকার সমর্থিত সরকারের নিকট নিজের সেবা নিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবার রাজাকার হায়দার আলীর চেলা একাত্তরের ঘাতক রব্বানী আরেক মুক্তিযোদ্ধা ননীদাকে গুলি চালালে আকবর নিজের বুক পেতে ননীদাকে রক্ষা করেছেন।

তোমরাই নাটকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীত চরিত্র রাজাকার হায়দার আলী। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তাকারী রাজাকার হায়দার আলী স্বাধীনতার পর পুর্নবাসিত হয়ে এদেশের তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। একারণে হায়দার আলী দিকভ্রান্ত রঞ্জুদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। রঞ্জুদের মতো তরুণ প্রজন্মের নিকট স্বাধীনতা সংগ্রামের অপব্যাখ্যা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নির্মূল করতে চেয়েছেন। একাত্তরের বাংলাদেশটাকে শূন্যে মিলিয়ে দিতে হায়দার আলী মুক্তিযোদ্ধা ননী বাবুকে নিজের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্বের প্রবল প্রতাপ প্রদর্শন করেন। হায়দার আলীর সংলাপে তার রাজনৈতিক ধৃষ্টতা প্রণিধানযোগ্য :

> কি বললেন? গভমেন্ট? গভমেন্টের কাছে আমি যাব? ননীবাবু, এতকাল ধরে রাজনীতি করেন, হাওয়া বাতাস কখন কোন দিক দিয়ে বয়ে যায় এই সামান্য ব্যাপারটাও বোঝেন না? এখনও আমাকে এনিমি

ধরেই বসে আছেন? নলেজ আপটুডেট করুন ননীবাবু। রাজনীতি তো ছাড়তে পারবেন না। স্টাইলটা পাল্টান। মডার্ন রাজনীতি করুন। এখন শত্রু মিত্রের পার্থক্য বোঝেন না, এ তো আমার জানা ছিল না।[১০৯]

একাত্তরে পরাজয়জনিত গ্লানি নবোত্থিত রাজাকার হায়দার আলীকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছে। একারণে তার একজন কর্মচারী মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অপমান করেছেন। আবার শমসেরের মুখে মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জীর দেশপ্রেম সম্পর্কে জেনে, 'পুড়িয়ে দেব ঐ স্বাধীনতার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের পতাকা?'– বলে হুমকি দিয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজাকার হায়দার আলী নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করতে এবং অস্তিত্ব রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-স্নাত সৈনিক ননী ব্যানার্জীকে হত্যা করতে পুরনো অস্ত্র আলবদর গোলাম রব্বানীকে বেছে নেন। তাই প্রতিহিংসা পরায়ণ হায়দার আলী জানায় :

দলিল, ফটোগ্রাফ, পাকা প্রমাণ। একাত্তরে আমরা কে কি করেছি না করেছি সব সে ফাঁস করে দেবে আগামীকাল। [...] আগামীকাল। ননী ব্যানার্জীর জীবনে আর কোনো আগামীকাল আসবে না। গোলাম রব্বানী, দেরী কিসের?[১১০]

কিন্তু রাজাকার হায়দার আলী সফল হতে পারেননি। তরুণ প্রজন্ম ননী ব্যানার্জীর ডাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনামুখী হলে রাজাকার হায়দার আলী একাত্তরের মতো বাংলার মাটিতে পরাজিত হয়েছেন।

তোমরাই নাটকে বাবলু, শমসের, হারান, টোকন প্রমুখ চরিত্র স্বাধীনতা উত্তর দিকভ্রান্ত তরুণ প্রজন্ম ও মোবারক আলী, গোলাম রব্বানী রাজাকারদের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে শমসের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সর্বদা রাজাকার হায়দার আলীকে নানাভাবে অপদস্থ করেছেন। এ নাটকে অন্যান্য চরিত্রগুলোর মধ্যে বাবা, মামা, রায়হান, পলা, শ্রমিক, সায়রা, রাহেলা, লুনা, খালা প্রমুখ চরিত্র কাহিনিকে গতিশীল করতে স্বাধীনতা উত্তর সমাজবাস্তবতাকে অনিবার্যভাবে ফুটে তুলেছে।

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তোমরাই* নাটকের রঞ্জু, ননীবাবু প্রমুখের সংলাপ প্রমিত। আবার খালা কিংবা পলার সংলাপ চরিত্রানুগ আঞ্চলিক। এছাড়া পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের তীক্ষ্মতায় স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের দুই শক্তির তীব্র দ্বন্দ্ব নাটকের কাহিনিকে প্রাঞ্জল করেছে। এ নাটকের সংলাপ ও চরিত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপ '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে ভাবনা রূপে চিত্রিত করেছে।

তোমরাই নাটকে পাত্র-পাত্রীদের রূপসজ্জা, সংলাপের মধ্য দিয়ে অঙ্গভঙ্গি, মঞ্চসজ্জা একাত্তরের সংগ্রামী চেতনা আর বাংলাদেশ বিরোধী রাজাকার আলবদরদের পরিচয় দর্শকের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এ নাটকে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার রয়েছে। যেমন : 'একেই বলে দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা'।

তৃতীয় পুরুষ

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে লায়লা ও আলী ইমাম চরিত্রের মনোজাগতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে। এ নাটকে লায়লার স্বামী অধ্যাপক জাফর একাত্তরের গভীর রাতে বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর লায়লার মনোজগতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা নাট্যক্রিয়া থেকে নাট্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। যেমন :

> জাফর বলল, "কোনো ভয় নেই। আমি এক্ষুণি ফিরে আসব"। কই, ফিরেতো তুমি আসনি জাফর? কেন সেদিন আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলে? পুরো ন'টি মাস আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি।[১১১]

তৃতীয় পুরুষ নাটকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে লায়লা ও স্বাধীনতার বিপক্ষে আলী ইমামের মনোজাগতিক দ্বন্দ্ব ক্রমে জাতীয় জীবনে পরিশীলিত হলে সমগ্র নাটকের নাট্যদ্বন্দ্বকে প্রকট করে তুলেছে। লায়লা ও ইমামের সংলাপে এ নাট্যদ্বন্দ্ব প্রণিধানযোগ্য :

> লায়লা : স্বাধীনতার পর তোমার বন্ধু যদি বেঁচে থাকতো, আমি হলপ করে বলতে পারি, সে তোমাকে ক্ষমা করতো না। স্বাধীনতার সঙ্গে যে ইয়ার্কী তুমি করেছো, তার জন্য উপযুক্ত শাস্তি তোমাকে পেতে হতো।
>
> ইমাম : এতদিনে আমি আমার ভাগ্য গড়ে নিয়েছি। স্বাধীনতার আগের আমি আর স্বাধীনতার পরের আমি, এই দুইয়ের মাঝে অনেক ফারাক লায়লা।[১১২]

এ নাটকে আলী ইমাম ব্যক্তি জীবনে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে লায়লাকে খুন করতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু লায়লা কৌশল অবলম্বন করে আলী ইমামকে বিবাহ করতে সম্মত হলে নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি করেছে। আবার আলী ইমাম পুলিশের হাতে ধরা পড়েও নিজের পিস্তল দিয়ে গুলি চালিয়ে পালানো কিংবা আত্মহত্যা না করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নিকট পরাজয় করলে পরিবর্তন আকস্মিকতার সৃষ্টি করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তৃতীয় পুরুষ* নাটক একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাতে অনুরণিত দুটি চরিত্রের মনোজাগতিক বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অঙ্ক বিভাজন, দৃশ্য ভাগ না থাকলেও পঞ্চাঙ্ক নাটকের রীতিতে সমগ্র নাটকটিকে বিভাজন করলেও করা যায়।

তৃতীয় পুরুষ নাটকের কাহিনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির প্রভাবে এক শহিদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীর যাপিতজীবনে নেমে আসা বেদনাবহ চিত্রকে ধারণ করে গড়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত শহিদ অধ্যাপক জাফরের স্ত্রী লায়লার নিঃসঙ্গ জীবনে নামধারী মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমামের অত্যাচারে এ জীবন-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তাই 'লায়লার স্বামী জাফর মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়ার পর স্বাধীন দেশে লায়লার নিঃসঙ্গ-যন্ত্রণা নাট্যকাহিনির কেন্দ্রবিন্দু।'[১১৩] মুক্তিযুদ্ধে স্বামী-সংসার হারানো লায়লা শহিদ স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করে ঢাকা ছেড়ে সুদূর কক্সবাজারে গিয়ে বসবাস শুরু করছেন। তিনি একাত্তরের ভয়াবহ যুদ্ধে স্বামী হারানোর বেদনা ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বার্থান্বেষী মুক্তিযোদ্ধাদের মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে চান। কিন্তু কক্সবাজারে গিয়েও একাত্তরের প্রেতাত্মা স্বার্থান্বেষী মুক্তিযোদ্ধা উপাধিধারী আলী ইমাম উপদ্রব শুরু করেছেন। লায়লার সংলাপে আলী ইমামের এই উপদ্রব :

> আমি তোমাকে, তোমাদের কাউকে পরোয়া করি না। কারো দয়া, সহানুভূতি উপকার আমার চাই না। একাকীত্ব আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা। বঞ্চনা আমার জীবনের অনুপ্রেরণার উৎস। আমাকে জ্বালিয়ো না। চলে যাও।[১১৪]

কিন্তু মিথ্যাবাদী আলী ইমাম কৌশলের আশ্রয় নেন। কথার ছলে মুক্তিযোদ্ধা জাফরের প্রসঙ্গ তুলে ধরে লায়লাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তিনি নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শহিদ জাফরের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে চান। লায়লা তখন মুক্তিযুদ্ধে আলী ইমামের স্বার্থান্বেষী ভূমিকার কথা তুলে ধরলে– আলী ইমাম প্রসঙ্গ বদল করেন। বাঙালির জাতীয় জীবনের গৌরান্বিত অর্জন একাত্তরের মহান স্বাধীনতাকে 'পুরনো কাসুন্দি' আখ্যা দিয়ে আলীম ইমাম নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দেন। আলী ইমামের সংলাপে তার মিথ্যা ছলনার জাল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যথা :

> স্বাধীনতার খবরদারী করা আমার কাজ নয়। জাফর আমার বন্ধু ছিল। আমি সেই বন্ধুর স্মৃতিকে শুধু অমর করে রাখতে চাই। লায়লা, প্লীজ, আমাকে নিয়ে আর ঘাটাঘাটি কোরো না। আমার কথা শোনো। এসো আমরা জাফরের জন্যে একটা কিছু করি।[১১৫]

লায়লা ঘাতক আলী ইমামের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরে অপমান করে বের করে দেন। কিন্তু একাত্তরের ধূর্ত কীট আলী ইমাম শহিদ অধ্যাপকের স্ত্রী লায়লার স্বরূপ বুঝতে পেরে ব্যক্তি জীবনে না পাওয়ার বেদনাজনিত ক্ষোভ থেকে ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে লায়লাকে খুন করতে উদ্যত হন। বুদ্ধিমতী লায়লা ঘাতক আলী ইমামকে প্রতিহত করতে কৌশল অবলম্বন করে বিবাহ করার সম্মতি জানান। লায়লা এ সুযোগে বিবাহের আয়োজন করতে বান্ধবীর বাড়ির নাম করে পুলিশকে খবর দিতে বাহিরে যান। আলী ইমামের অপরাধের জন্য পুলিশ তাকে আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানান। তখন একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী আলী ইমাম তার কুকর্মের পরিণতি অনুধাবন করে অনুতাপ প্রকাশ করেন। আলী ইমামের অনুতপ্ত হৃদয়ে পরিচয় তার সংলাপে :

> আমি একটার পর একটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। বন্ধু, দেশ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সবার সংগে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তাই আত্মহত্যা করার অধিকার আমার নেই। আত্মহত্যারও একটা আলাদা মর্যাদা আছে। সে মর্যাদা আমার প্রাপ্য নয়। আসি লায়লা।[১১৬]

আলী ইমামের এভাবে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষ এ দুটি পক্ষের দ্বন্দ্বে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের বিজয় সূচিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তৃতীয় পুরুষ* নাটক দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এ নাটকের প্রধান চরিত্র শহিদ মুক্তিযোদ্ধা জাফরের স্ত্রী লায়লা। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে স্বামীকে হারিয়ে লায়লা একাকী নিঃসঙ্গ বেদনাময় জীবনকে বেছে নিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর আদর্শকে ধারণ করে তিনি জীবন যাপন করছেন। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর নেতারা শহিদ জাফরের স্মৃতি রক্ষায় পাঠাগার স্থাপন, শহিদ জাফরের বিধবা স্ত্রীকে আজীবন বিশেষ ভাতা প্রদানের প্রলোভন দেখিয়ে কিছুদিনের মধ্যে জাফরের কথা ভুলে যান। আর লায়লা '৭১-এর যুদ্ধে সবকিছু হারালেও জাফরকে তার হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। লায়লার সংলাপে শহিদ জাফরের অস্তিত্ব :

> শোক সভার ভাড়াটে বক্তার দল, তোমাদের অপমান, অবজ্ঞা আর অবহেলার বোঝা শেষ পর্যন্ত আমাকেই বইতে হয়েছে। তোমাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু যে শহিদ জাফর তার প্রয়োজন ফুরাতে বেশী সময় লাগেনি। কিন্তু আমার জীবনে জাফরের প্রয়োজন কোনোদিন ফুরায়নি।[১১৭]

লায়লা তার অস্তিত্বের সঙ্গে স্বামীর স্মৃতিকে বুকে ধারণ করে ঢাকা ছেড়ে সুদূর কক্সবাজারে গিয়ে নিঃসঙ্গ সংসার গড়ে তুলেছেন। সেখানে শিক্ষকতা করে জাফরের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান। কিন্তু লায়লার নিরুপোদ্রব জীবনে যুদ্ধোত্তর কালে নবোত্থিত স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির প্রতিভূ নামধারী মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সেখানে গিয়ে সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন। লায়লা স্বাধীনতা বিরোধী ইমামের

ছলচাতুরি বুঝতে পেরে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও শহিদ জাফরের অবদানকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আলী ইমামকে ধিক্কার জানিয়েছেন। লায়লার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত এই প্রতিবাদ-ধিক্কার :

> স্বাধীনতার যুদ্ধটা যদি সত্যি হয়, আমার স্বামীর মত আরো লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ যদি নিরর্থক না হয়, তাহলে তোমরা পার পাবে না। একদিন তোমাদের বিচার হবেই।[১১৮]

লায়লা চরিত্রের এই দৃঢ়তা তার ব্যক্তিত্বকে আরো ধীর ও মহিমান্বিত করেছে– তাকে বিচক্ষণ করেছে। একারণে লায়লা সহজে আলী ইমামের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে পেরেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে ব্যর্থ ইমাম আজ আততায়ীর মতো-হিংস্র দানবে পরিণত হয়েছেন। এই দানবের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় কৌশল অবলম্বন। তাই বুদ্ধিমতী লায়লা ঘাতক আলী ইমামকে বশে আনতে বিবাহ করতে কৌশলে মৌখিক সম্মতি জানিয়েছেন। লায়লার সংলাপে চিত্রিত এই কৌশল :

> আমি তোমাকে বিয়ে করব ইমাম। [...] তুমি বললে না তুমিও কোমল নারী ভালোবাসো? তুমিও পেতে চাও এমন একটা নারী যে দরজায় ঘণ্টা বাজলে...[১১৯]

লায়লা মুখে বিবাহের সম্মতি জানালেও অন্তরে আলী ইমামের মতো স্বাধীনতার শত্রুকে বধ করতে কৌশল রচনা করেন। তিনি বিবাহের আয়োজনের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইমামকে পুলিশের নিকট সোর্পদ করার ব্যবস্থা করেন। লায়লা চরিত্রের এ আদর্শ তাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উচ্চকিত করেছে।

তৃতীয় পুরুষ নাটকে আলী ইমাম একজন স্বাধীনতা বিরোধী স্বার্থান্বেষী চরিত্রের প্রতিভূ। আলী ইমাম একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালে ব্যাংকের টাকা লুট করে নেন; স্বাধীনতা পরবর্তী সময় নামধারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারের সকল সুবিধা ভোগ করে অঢেল সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করেছেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধকে 'পুরনো কাসুন্দি' বলে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। ইমাম চরিত্রের এই ঔদ্ধত্য তাকে আরো নীচ, প্রতিহিংসাপরায়ণ, হিংস্র দানব ও অমানবিক করে তুলেছে। একারণে ছাত্রজীবনে লায়লাকে ভালো লাগা থেকে সৃষ্ট প্রেম এবং স্বীয় যোগ্যতায় না পাওয়ার বেদনায় যে ভোগাকাঙ্ক্ষা সুপ্ত হয়, তা মুক্তিযুদ্ধের পর কাম রূপে আলী ইমামের মাঝে জাগরিত হয়েছে। এ কারণে যে কোনো মূল্যে লায়লাকে পাওয়ার জন্য আলী ইমাম মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কিন্তু দীর্ঘ জীবনের সুপ্ত কামনা চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়ে আলী ইমাম বন্ধু পত্নী লায়লাকে গলা টিপে মেরে অপ্রাপ্তির বাসনা পূরণ করতে উদ্যত হয়েছেন। আলী ইমামের সংলাপে তার নিষ্ঠুরতা প্রণিধানযোগ্য :

লায়লা, আমি তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাবো যেখানে যাবার জন্যে তুমি সেই কবে থেকে আকুলি বিকুলি করছো– আর দেরী নেই– আততায়ীর হস্ত প্রসারিত। এই হাতের নিষ্পেষণে আর মাত্র খানিকক্ষণের মধ্যে তোমার প্রাণবায়ু বহির্গত হবে।[১২০]

স্বাধীনতার শত্রু আলী ইমাম আপাদমস্তক একজন অসৎ, ভণ্ড, ধোকাবাজ প্রতারক সর্বোপরি লঘু ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার চরিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। লায়লা বিবাহ করার আশ্বাস দিলে ইমাম যেমন সহজে বিশ্বাস করেছেন, তেমনি নাটকের কাহিনির সমাপ্তিতে পুলিশ তাকে ঘিরে ফেললে তার শুভ বোধোদয় ঘটেছে। আলী ইমাম চরিত্রের এই পরিবর্তন আকস্মিক এবং সিনেমাটিক হলেও তার পরাজয়কে ফুটিয়ে তুলেছে। একারণে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিভূ আলী ইমাম পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর পরাজয়কে বরণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ইমামের সংলাপে এই বশ্যতার স্বীকৃতি প্রমাণ :

আমার আজকের এই পরাজয় প্রমাণ করে দিল, জাফরের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। এদেশ জাফরের, ইমামের নয়।[১২১]

আবদুল্লাহ আল-মামুন *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে সংলাপ রচনায় অনন্য কৃতিত্ব স্থাপন করেছেন। এ নাটকের সংলাপগুলো সহজ-সরল স্বাভাবিক। নাট্যকার সংলাপের মধ্য দিয়ে যেমন : লায়লা ও আলী ইমামের ব্যক্তিত্ববোধকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি একাত্তরের ভয়াবহ দৃশ্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান মঞ্চে অভিনয় না করেও প্রস্ফূটিত করে তুলেছেন। এ নাটকে সংলাপগুলো আদ্যোপান্ত নাটকীয়। কখনো দীর্ঘ, কখনো সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থ বহন করেছে। যেমন :

ইমাম : বিয়েতে রাজি হয়েছিলে কেন?

লায়লা : এক খুনির হাত থেকে বাঁচার জন্যে।[১২২]

তৃতীয় পুরুষ নাটকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষ এই দুটি দলের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নাট্য ভাবনা গড়ে উঠলেও এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ নাটকে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপে দুটি পক্ষের বিরোধ ছাড়াও যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ, পাত্র-পাত্রীদের মনোজাগতিক ক্রিয়াকলাপ নাট্য ভাবনাকে শিল্পিত করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে দৃশ্য অসাধারণ। নাট্যকার এ নাটকে যে পটভূমিতে নাট্য ঘটনাকে তুলে ধরেছেন তা একাত্তরের ভয়াল দিনগুলোর কথা যেমন স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি যুদ্ধোত্তর কালে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় স্বাধীনতা বিরোধীদের ঔদ্ধত্যকে ফুটিয়ে তুলেছে।

তাছাড়া আলী ইমাম কর্তৃক লায়লাকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হত্যা করতে উদ্যত হওয়া এবং লায়লা-ইমামের মনোজাগতিক বিশ্লেষণে নাট্য দৃশ্য অসাধারণ শিল্পরূপ রূপলাভ করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে সংগীত নেই, তবে উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও প্রবাদ-প্রবচন এ নাটকে নেই। তবুও রূপ-রীতির বৈচিত্র্যে অঙ্গসজ্জা, চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি নাটকের বিষয়কে এতটাই শাণিত করেছে যে, *তৃতীয় পুরুষ* মঞ্চসফল নাটক হিসেবে অভিনীত হয়েছে।

মেহেরজান আরেকবার

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেহেরজান আরেকবার* নাটক নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। এ নাটকে মৌলবাদী হাজী সাহেব 'সোনার বাংলা' হোটেলে ভারতীয় এক কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি কানু ঘোষ ও মহিলা কর্মচারী মেহেরজানকে দেখে কটাক্ষ করে প্রতিক্রিয়ায় জ্বলে ওঠেন। মূলত হাজী সাহেবের সংলাপে এ নাটকের নাট্যক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেমন :

> এই এলাকাটা হইতাছে ইসলামী আন্দোলনের দুর্গ। সহসাই আমরা সরকার হটাও সংগ্রামে নামতেছি। এই অবস্থায় দোজখের কিরা নিয়া সমস্যা সৃষ্টি হইলে তো– ।[১২৩]

মেহেরজান আরেকবার নাটক নাট্যদ্বন্দ্বে মুখরিত। এ নাটকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির সঙ্গে স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বন্দ্ব নাট্যঘটনাকে প্রকট করে তুলেছে। *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে একদিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে সর্বস্ব হারানো মেহেরজান, শিকদার প্রমুখ নিম্নবিত্ত মানুষের অবস্থান, অন্যদিকে লুটেরা মৌলবাদী আলবদর নেতা হাজী সাহেব সমগ্র নাটকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ঘাত-প্রতিঘাতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির বিপরীতে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে।

এ নাটকে আলবদর নেতা হাজী সাহেবের দাঁত এক থাপ্পড়ে ফেলে দেয়ার পর মুক্তিযোদ্ধা ট্রাক ড্রাইভার শিকদারের নিরুদ্দেশ হওয়ায় নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে। মেহেরজান–হরমুজ কিংবা দর্শক সকলেই অস্থির হয়ে ওঠেন যে, এরপর শিকদারের জীবনে কী ঘটবে। *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে হাজী সাহেব শিকদারকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নিবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি হঠাৎ তার শত্রুকে ক্ষমা করে দিলে দর্শকের মধ্যে নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি হয়েছে। আবার আলবদর হাজী সাহেবের ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা শুনে শিকদার আত্মগোপন থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে– হাজী সাহেবের গুলিতে নিহত হওয়ায় আকস্মিকতার সৃষ্টি হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেহেরজান আরেকবার* নাটক আধুনিক রীতিতে ছয়টি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে প্রথম দৃশ্যে সোনার বাংলা হোটেলে পরিচিত ঘটনার সূচনা, দ্বিতীয় দৃশ্যে কানু ঘোষ ও মেহেরজানকে দেখে হাজী সাহেবের প্রতিক্রিয়ায় নাট্যঘটনা চূড়ামুখী হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে মুক্তিযোদ্ধা শিকদার ও হাজী সাহেবের মুখোমুখি অবস্থান সঙ্কটকে চূড়ান্ত পরিণতি দিয়েছে। পঞ্চম দৃশ্যে নাট্যঘটনা নিম্নমুখী হয়ে ষষ্ঠ দৃশ্যে মেহেরজানের হাতে স্বাধীনতার শত্রু হাজী সাহেবের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে *মেহেরজান আরেকবার* নাটকের গ্রন্থিমোচন ঘটেছে। এ বিবেচনায় আঙ্গিকগত অঙ্ক বিভাজন না থাকলেও বিষয়ের রূপায়ণে এ নাটক সফল।

মেহেরজান আরেকবার নাটকে সমগ্র ঘটনা 'সোনার বাংলা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট' এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। নাটকের ঘটনাগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এ নাটকের মূল ঘটনা আলবদর নেতা হাজী সাহেবের আধিপত্য-বিস্তারকে কেন্দ্র করে হলেও মুক্তিযোদ্ধা শিকদার কর্তৃক হাজী সাহেবের দাঁত থাপ্পড়ে উপড়ে ফেলা, সখিনাকে নিয়ে হিটলারের পলায়ন মূল ঘটনার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেহেরজান আরেকবার* নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে একজন আলবদর নেতার সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী আগ্রাসনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মেহেরজানের জীবনের করুণ দুর্দশাগ্রস্থ জীবনকে কেন্দ্র করে। এ নাটকের প্রথম দৃশ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে ঘরবাড়ি হারানো সোনার বাংলা হোটেলের কর্মচারী মেহেরজান ও মুক্তিযোদ্ধা শিকদারের জীবনচিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে আলবদর নেতা হাজী সাহেব হোটেলের রান্নাঘরে ভারতীয় হিন্দু ও মহিলা কর্মচারীকে দেখে তার সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী প্রতিক্রিয়ায় জ্বলে উঠেছেন। হাজী সাহেবের সংলাপে এই মৌলবাদী প্রতিক্রিয়া :

> অরে থামতে বল। হরমুজ আলী ভারতীয়রে থামতে কও। আইজকা জুম্মাবার এই পবিত্র দিনে আমারে মেইল ফিমেল দুই পদের দোজখের কিরা দেখাইলা খোদা? আমি আর কত সইয্য করুম।[১২৪]

মূলত এ দৃশ্যেই নাট্যকাহিনি মূল ঘটনার দিকে অগ্রসর হয়।

তৃতীয় দৃশ্যে হাজীর গুণ্ডা হিটলার সোনার বাংলা হোটেলে মেহেরজানের বিধবা পুত্রবধূর সঙ্গে দেখা করতে এলে হোটেল মালিক হরমুজ, শিকদার, মেহেরজান সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে হাজীর চেলারা আসেন। শিকদার হাজীকে গালিগালাজ করে চেলাদের প্রতিবাদ করেন। পরক্ষণে হাজীর উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধা শিকদার যেন প্রতিবাদের আগুনে জ্বলে ওঠেন। হাজীর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডার এক

পর্যায়ে শিকদারের থাপ্পড়ে হাজীর দাঁত উপরে গেলে এ নাটকের কাহিনি দ্বন্দ্বমুখর হয়েছে। শিকদারের সংলাপে নাট্যকাহিনীর এই মুখরিত দ্বন্দ্ব প্রণিধানযোগ্য :

> হরমুজ আলী, তুই সাক্ষী। আমি হাজীর দাড়িসমেত গালে থাপ্পড় দিছি। দেখিস কথা জানি না উল্টাইতে পারে।[১২৫]

চতুর্থ দৃশ্যে হোটেলের কর্মচারী মতি ক্যাশ থেকে হরমুজকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবর নিয়ে রান্নাঘরে আসলে সবাই স্তব্ধ হয়ে যান। হাজীর তালেবান বাহিনী সখিনার সম্ভ্রমহানির জন্য আক্রমণ চালালে মেহেরজান বটি দিয়ে একজনকে কোপ দেন। বিধবা পুত্রবধূ সখিনার জীবনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে হিটলারের হাতে তুলে দিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় অসীম সাহসী প্রতীক্ষায় সোনার বাংলা হোটেলেই অবস্থান করেন। পঞ্চম দৃশ্যে শিকদার ও মেহেরজানকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়ে হাজী সাহেব এবার এলাকায় ঈদ পালন করার কথা হরমুজকে জানান। ষষ্ঠ দৃশ্যে রাতে সোনার বাংলা হোটেলের রান্নাঘরে শিকদার কাঠের বাক্সগুলো পরীক্ষা করছেন। এমন সময় আলবদর নেতা হাজী সাহেব ও তার তালেবান বাহিনী হরমুজকে হত্যা করে শিকদারের পথ রোধ করলে শিকদার '৭১-এর আলবদর হাজী সাহেবকে আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু হাজী সাহেব গুলি করে শিকদারকে নিস্তব্ধ করে দিয়ে মেহেরজান ও পরীকে নেংটা করে নাচানোর ঘোষণা দেন। তখন বিক্ষুব্ধ মেহেরজান পাগলের মতো পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে হিটলারের দেয়া স্টেনগান দিয়ে হাজী ও তার তালেবান বাহিনীকে স্তব্ধ করে দেন। মাইকে বাহির থেকে আগামীকালের ঈদের ঘোষণা আসে। কিন্তু মেহেরজানদের জীবনে ঈদ নেই। তাই মেহেরজান কাঠের বাক্সের অস্ত্রগুলোতে জ্বলন্ত লাকড়িটা দিয়ে জ্বালিয়ে চিৎকার করে বলেন :

> না। আসমানে ঐ ঈদের চান, আমাগো আসমান থিকা মিলাইয়া যা তুই। আমাগো জীবনে কোন ঈদ নাই।[১২৬]

মেহেরজান আরেকবার নাটকের কাহিনি মেহেরজানের হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নিতে স্বাধীনতার শত্রু হাজী সাহেবের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে চরিত্র সংখ্যা এগারোজন। এ নাটকের প্রধান চরিত্র নাম ভূমিকায় মেহেরজান। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ভয়াবহ বর্বরতায় সবকিছু হারানো মহিয়সী মেহেরজান যুদ্ধোত্তর কালে মৌলবাদীদের ফতোয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্ব হারিয়ে ঢাকা শহরের সোনার বাংলা হোটেলে রাধুনির কাজ করে জীবনের নতুন স্বপ্ন দেখেন।

সমাজজীবনের বাস্তবতায় বারবার সবকিছু হারিয়ে পোড় খাওয়া মেহেরজানের সংলাপে তার জীবনের করুণ চালচিত্র :

> স্বাধীনের যুদ্ধের সময় খানেগো দাবরানি খাইয়া রাইতদিন হমানে পলাইছি। একদিন শুনলাম, দ্যাশ বলে স্বাধীন হইচে। ফিরা আসলাম গেরামে, নিজের ভিটায়। বছরের পর বছর পার হইল। স্বাধীনতা কি ট্যার পাইলাম না। স্বাধীনতা পইরা রইল শত শত মাইল দূরে ঢাকা শহরে।[১২৭]

স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার-সমাজ, জোয়ান পুত্র সবকিছু হারালেও বাস্তবজীবনে পোড় খাওয়া মেহেরজান ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মান, দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি সোনার বাংলা হোটেলে সারাদিন নিজের ঘর্মাক্ত শ্রমে উপার্জিত অর্থে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করেছেন। মেয়ের মতো বিধবা পুত্রবধূকে পরম মমতায় মাতৃত্বের ছায়ায় আগলে রেখেছেন। বিধবা পুত্রবধূর সম্ভ্রম রক্ষায় হাজীর চেলাদের বটি দিয়ে কোপ মেরে প্রতিহত করেছেন। আবার যুবতী পুত্রবধূর প্রেমিক 'হিটলারের হাতে সখিনাকে তুলে দিয়ে মেহেরজান নারীর যৌন-জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত'[১২৮] করে মাতৃত্বের গৌরব উজ্জ্বল করে তুলেছেন। হিটলারের হাতে সখিনার তুলে দেয়ার সময় মেহেরজানের সংলাপে চিত্রি তার মাতৃত্ব :

> তাইলে নিয়া যাও অরে। স্বামীর সোহাগ অর কপালে জোটে নাই। আমিও অরে শান্তি দিবার পারি নাই। সখিনারে নিয়া তুমি সুখে থাক, আমি দোয়া করি।[১২৯]

মেহেরজান চরিত্র যেমন ব্যক্তিত্বে প্রখর, তেমনি অধিকার সচেতন– প্রতিবাদে মুখর। তিনি সবকিছু হারালেও স্বমহিমায় কর্ম করে জীবিকা উপার্জনের জন্য 'সোনার বাংলা' হোটেলকে শেষ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়ে ঠাঁই গড়েছেন। কিন্তু আলবদর নেতা হাজী সাহেব মেহেরজানের শেষ আশ্রয় স্থলকে অস্ত্র চোরা-চালানের জন্য ব্যবহার করে তার অনিকেত যাত্রার পথ প্রশস্ত করেছেন। একারণে মেহেরজান তার অস্তিত্ব রক্ষায় হাজীর অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে ক্ষোভে জ্বলে ওঠেন। মেয়ে পরী ও তাকে উলঙ্গ করে নাচানোর আগে মেহেরজান অসীম দুঃসাহস এবং প্রচণ্ড বিক্ষোভে স্বাধীনতার শত্রু হাজী সাহেবকে স্টেনগান দিয়ে স্তব্ধ করে দেশকে কলুষমুক্ত করেছেন। হাজীর তালেবান বাহিনীর সদস্যদের প্রতি মেহেরজানের ক্ষোভ :

> স্বাধীন দেশে বদর বাহিনীর জানোয়ারের পাও চাটস? এইনি এই দেশের তোরা ভরসা? কোনো দরকার নাই। তরা পইচ্যা গ্যাছস। বাঁইচ্যা থাকলে তরা পুরা দ্যাশ পচাইবি। কোনো দরকার নাই।[১৩০]

এ নাটকে একেবারে প্রান্তিক জীবন থেকে উঠে আসা মেহেরজান জীবনের বাঁকে-বাঁকে ঘাত-প্রতিঘাতে অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে দুঃসাহসী বিক্ষোভে জ্বলে উঠেছেন। বস্তুত নাট্যকার মেহেরজানের জাগরণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করেছেন।

মেহেরজান আরেকবার নাটকে স্বাধীনতার বিরুদ্ধ শক্তি আলবদর নেতা হাজী সাহেব বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে ধর্মীয়-মৌলবাদী চেতনার ধারক। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে সামরিক শাসনামলে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি দিলে ধর্মান্ধ মৌলবাদী হাজী সাহেবের উত্থান ঘটেছে। ধর্মের লেবাস পরে হাজী সাহেব এলাকায় আধিপত্য বিস্তার, চোরাচালান, অস্ত্রব্যবসা, ইত্যাদি অপকর্ম করে প্রকারান্তরে বাংলাদেশের সংখ্যাধিক্য ইসলাম ধর্মানুসারী মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করেও হাজী সাহেব দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেন না। তাই একাত্তরের মহান মুক্তিযোদ্ধা অন্যায়ের প্রতিবাদী শিকদারকে কেটে কিমা বানানোর ঘোষণা দেন। হাজী সাহেবের সংলাপে একাত্তরের মতো তার বর্বর আলবদর বাহিনীর নৃশংস রূপ ফুটে উঠেছে। যেমন :

> শিকদার শুয়োরের বাচ্চারে যদি কিমা বানাইতে না পার, তাইলে আমি নিজ হাতে তুমারে সেই জিনিস বানাব। অনেক পুরানো অভ্যাস। একাত্তর সালের কথা। তথাপি পুরাপুরি ভুলি নাই।
>
> [...]
>
> নিজের চক্ষেই দেখবা এইবার আমরা কি করি? জলুস জলসা চলতাছে। আরো কঠিন প্রোগ্রাম আসতাছে। তোমাগো বন্ধুবান্ধবীর বাংলাদেশ ছ্যারাব্যারা কইরা দিমু।[১৩১]

হাজী সাহেব একজন স্বার্থান্ধ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক, প্রতিহিংসাপরায়ণ চরিত্র। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু-রাষ্ট্র ভারত ও কানু ঘোষ একজন ভারতীয় হিন্দু হওয়ায় সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প উগরে দিয়েছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আলবদরি কৌশল অবলম্বন করে সোনার বাংলা হোটেলে মুক্তিযোদ্ধা শিকদারকে আটক করেছেন। একাত্তরের কসাইয়ের মতো হোটেল মালিক হরমুজ ও শিকদারকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। হাজীর সংলাপে তার সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে :

> চোউপ শালা ভারতীয়। এট্টু লরাচরা করবি না। আইজকা তরও বিচার হবে। বাংলাদেশরে ইন্ডিয়া বানাইতে চাও? দিমু আইজক্যা ঠ্যালা বুঝাইয়া। আমার পেয়ারা কর্মচারী, আমার ডেরাইভার, জনাব শিকদার, সে এত চুপচাপ ক্যান? খিচানি দেয় না কেন গাদ্দারের বাচ্চাডা?[১৩২]

হাজী চরিত্রের এই প্রতাপ তাকে আরো উদ্ধত করেছে। একারণে তিনি মেহেরজান ও তার মেয়ে পরীকে উলঙ্গ করে নাচাতে চান। কিন্তু তার বর্বরতার রূপ শেষ পর্যন্ত মেহেরজানের স্টেনগানে একাত্তরের মতো মুখ থুবড়ে পড়েছে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী আলবদর হাজী সাহেব পরাজিত হয়েছেন।

মেহেরজান আরেকবার নাটকে শিকদার একজন সৎ, বন্ধুবৎসল, অন্যায়ের প্রতিবাদী চরিত্র। একাত্তরের রণাঙ্গনে এই মহান যোদ্ধা পরিবার-পরিজনহীন হলেও সোনার বাংলা হোটেলের কর্মচারীদের আপন করে নিয়েছেন। একাত্তরে নিজ হাতে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলেও শিকদার এর বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় কোনো সুবিধা নেননি, বরং ট্রাক চালিয়ে সাধারণ জীবনধারণ করছেন। তার ব্যক্তিত্ব সরলতায় যেমন পরিপূর্ণ, তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী– স্বদেশপ্রেমে উজ্জ্বল। শিকদার আলবদর নেতা হাজী সাহেবের অন্যায় শোষণ প্রতিহত করে দেশের নাগরিক হিসেবে স্বমহিমায় বাঁচতে চান। একারণে এ নাটকে স্বাধীনতার শত্রু হাজী সাহেবের মুখে দেশ ও স্বাধীনতা বিরোধী বক্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিকদার প্রচণ্ড ঘৃণা ও প্রতিবাদে থাপ্পড় দিয়ে হাজীর দাঁত উপড়ে ফেলেছেন। শিকদারের সংলাপে তার প্রতিবাদী চেতনা প্রণিধানযোগ্য :

> আইন মতন বাঁচি। ইজ্জত নিয়া বাঁচি। আমগো লিগা দ্যাশের কুনো আইন নাই। আমগো ইজ্জতের কারো পরোয়া নাই। আমারা কেউ কারো না। আমগো বাঁইচা থাকার ব্যবস্থা আমাগোই করতে হবে। আর যদি মরতে হয় তাইলে মাইরা মরুম।[১৩৩]

শিকদার যুদ্ধোত্তর কালে একাত্তরের রণাঙ্গণের মতো সাহসী একজন বীর । যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতার শত্রুদের উত্থান শিকদারকে ব্যথিত করে বটে, কিন্তু তাঁর বীরত্বকে খর্ব করতে পারেনি। একারণে স্বাধীনতা বিরোধী আলবদর হাজী সাহেব সোনার বাংলা হোটেলে শিকদারকে আটক করলে তিনি স্বাধীনতার শত্রুদের নির্মূল করতে আরো একটি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। শিকদারের সংলাপে তার চরিত্রের চিত্রিত বীরত্ব :

> তোমাগো মতন রাক্ষসেরা এক যুদ্ধে খতম হয় না। যুদ্ধ আরো লাগব। আবার যুদ্ধ হবে। এইবার যুদ্ধ হবে সবরকম বর্ণাচোরাদের লগে। টুপি পিন্দা, তসবি টিপা, মসজিদের ভিতরে দল পাকাইয়া আর বেশিদূর যাইতে পারবা না। দ্যাশের মানুষ বহুত সইয্য করছে। আর করবে না। যার যার পায়জামা, লুঙ্গি চাইপা ধইরা রেডি হইয়া যাও। যদি পলাইয়া বাঁচতে পার।[১৩৪]

কিন্তু আলবদর নেতা হাজীর কৌশল ও পিস্তলের গুলিতে শিকদার শহিদ হলেও আগামী প্রজন্মকে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা বার্তা দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুন *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক হিসেবে কানু ঘোষ চরিত্রটি সৃষ্টি করলেও তিনি হৃদ্যতা, সৌজন্য, মানবিকতা ও ন্যায় প্রকাশে উজ্জ্বল একজন মানুষ। কানু ঘোষ ভারতীয় কোম্পানির একজন সেলস্‌ম্যান। নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে খেতে এসে সোনার বাংলা হোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে এক অমায়িক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন। নাটকে অন্তিম

মুহূর্তে জাত-পাতের বিভেদ ভুলে মেহেরজানের মেয়ে পরীকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলেছেন। কানু ঘোষের এই হৃদ্যতা তার চরিত্রের সৌজন্যবোধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা সৌজন্যতার খাতিরেই কানু ঘোষ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঈদের আগের দিন মেহেরজানের জন্য উপহার নিয়ে আসেন। কানু ঘোষের সংলাপে তার চরিত্রের সৌজন্যবোধ ও কৃতজ্ঞতা স্পষ্ট হয়েছে :

> দিদি কাল তো আপনাদের ঈদ। আমি দরিদ্র ভারতীয়। সাধ আছে সাধ্য নেই। তবু এই সামান্য [...] আপনার আর পরীর জন্যে শাড়ি দিদি।[১৩৫]

মেহেরজান আরেকবার নাটকে সখিনা ও হিটলার চরিত্রদ্বয় উল্লেখযোগ্য। মেহেরজানের পারিবারিক আবহ ও মেহেরজান চরিত্রে মাতৃত্ববোধ জাগরণে পুত্রবধূ সখিনা সহায়ক চরিত্র। হিটলার আলবদর নেতা হাজী সাহেবের ভাড়াটে মাস্তান হলেও প্রেম-মানবিকতা ও মেহেরজানের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। মেহেরজানের মেয়ে পরী ঘটনার সংঘটনে ও বিধবা ভাবী সখিনাকে প্রেমে উৎসাহ দিয়ে জীবনবাদী হয়ে উঠেছেন। সোনার বাংলা হোটেলের মালিক হরমুজ, কর্মচারী আবুল, মতি, তালেবান বাহিনীর তরুণদল ও কয়েকজন কুলিও ঘটনাকে স্পর্শ করেছেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেহেরজান আরেকবার* নাটকের সংলাপ শিল্পিত। এ নাটকে একমাত্র কানুবাবু ছাড়া প্রত্যেকটি চরিত্র অর্ধ-শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত। নাট্যকার একারণে সংলাপগুলো চরিত্রানুগ উপযোগী করেছেন। তবে আলবদর হাজী সাহেবের সংলাপে আরবি-ফারসি মিশ্রিত ও ইংরেজি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নাটকের পটভূমি ঢাকা শহরের সোনার বাংলা হোটেল। এজন্য এ নাটকের সংলাপ ঢাকার আঞ্চলিক ভাষারীতির।

মেহেরজান আরেকবার নাটকের ভাবনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে স্বাধীনতার শত্রুদের ঘাত-সংঘাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতার শত্রুদের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উত্থান, স্বাধীনতার স্বপক্ষের মানুষের জীবনচিত্র, তাদের প্রতিবাদ-সংগ্রাম সংলাপ ও চরিত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যভাবনা শিল্পিত হয়েছে ।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মেহেরজান আরেকবার* নাটকের ঘটনার পটভূমি, আহার্য বা পরিচ্ছদাদির রূপে ও ক্রিয়া বা পাত্র-পাত্রীদের মানসিক অবস্থায় যেমন– হাজী সাহেব একাত্তরের পটভূমিকে চিত্রিত করেছেন, তেমনি মেহেরজান কিংবা শিকদার মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষদের দুর্দশা ও 'সোনার বাংলা'

হোটেল যেন সমগ্র বাংলাদেশ কিংবা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হয়ে ওঠেন। একারণে এ নাটকের দৃশ্য সজ্জাকে অস্বীকার করা যায় না।

গ. সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি নির্ভর :

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বশূন্যতায় সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি নির্ভর আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কুরসী* ও *মাইক মাস্টার* উল্লেখযোগ্য নাটক। এ পর্যায়ে সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি নির্ভর *কুরসী* ও *মাইক মাস্টার* নাটক দুটির রূপ-রীতি বিশ্লেষিত হলো :

কুরসী

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কুরসী* নাটকে স্বৈরশাসক হুজুর কুরসী তথা রাষ্ট্রক্ষমতা হারানোর উপক্রম হলে বাচনিক প্রতিক্রিয়ায় নাট্যক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ নাটকে প্রহরী, ঢুলী কুরসীর খোঁজে যখন হন্যে, তখন হুজুর কুরসীর জন্য পাগলপ্রায় মনোভাব ব্যক্ত করে নাট্যক্রিয়াকে গতিদান করেছেন। যেমন :

> কেন, কেন ওরা গায়েব করবে আমার কুরসী? কি অপরাধ করেছি আমি? প্রজার চিন্তায় আমার বিশ্রাম নাই, ঘুম নাই, খাওয়া দাওয়া নাই, প্রাকৃতিক কোনো ক্রিয়াকর্ম নাই।[১৩৬]

কুরসী দ্বন্দ্বমুখর নাটক। এ নাটকে সামরিক স্বৈরশাসকের সঙ্গে গণতন্ত্রকামী সাধারণ জনগণের অধিকার আদায়ের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। একদিকে হুজুরবেশী স্বৈরশাসক এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে সাধারণ জনগণ স্বৈরশাসকের শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তুললে নাট্যদ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

কুরসী নাটকে স্বৈরশাসক হুজুরের শোষণ-নিপীড়নে জর্জরিত কুরসী দেশমাতার কোলে লুকিয়ে আশ্রয় নেন। আর এদিকে হুজুরবেশী স্বৈরশাসক সমগ্র রাজ্যে কুরসীর খোঁজে দিশেহারা, তখন এরপর কী ঘটবে– তা দর্শকের মাঝে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। মায়ের সংলাপে এ নাট্যোৎকণ্ঠা :

> আমি ঘুমামু না। অহন ১৯৮৮ সাল। কুরসী–পাগল হুজুরে মরণ কামড় দিছে। আমার কুরসীরে সে ছারবো না। তাই আমি জাইগা থাকুম। কুরসী, ঘুমাও বাপজান। আমি আছি জাইগা।[১৩৭]

এ নাটকে গণ-আন্দোলনের কবল থেকে কোনো রকমে নিজেকে রক্ষা করে স্বৈরশাসক হুজুর সামরিক পোশাক পরিবর্তন করে রাজনীতিতে প্রবেশ করে হারানো ক্ষমতা উদ্ধার করেছেন। এমন সময় স্বৈরশাসক হুজুরের সঙ্গে এক আলোচনায় প্রধান উজীর রাজনীতি, সঙ্গীতকলা তথা সংস্কৃতির প্রসঙ্গ

এনে নাট্যঘটনাকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি করেন। কিন্তু নাটক শেষে মায়ের হাতে কুরসীর মৃত্যু নাট্যপরিণতিতে আকস্মিকতা সৃষ্টি করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন *কুরসী* নাটকের প্লট (Plot) স্বৈরশাসক এরশাদের শাসন-শোষণে নিপীড়িত জনগণের গণতান্ত্রিক মুক্তির আন্দোলন-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করেছেন। এ নাটকে কোনো দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাজন নেই। স্বৈরশাসক হুজুরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন, সামরিক জান্তা এরশাদের সামরিক পোশাক খুলে রাজনীতিতে প্রবেশ, অতঃপর প্রবল গণ-আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত প্রভৃতি ঘটনা নাটকে সমকাল, স্থান ও মূল ঘটনাকে একসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

বঙ্গবন্ধু উত্তরকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সঙ্কট-ক্রান্তিতে সামরিক জান্তাদের স্বৈরশাসনে শোষিত-বঞ্চিত ও উৎপীড়িত মানুষের গণতান্ত্রিক মুক্তিসংগ্রামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে *কুরসী* নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে। এ নাটকে দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটকালে হুজুরবেশী সামরিক শাসক এরশাদ বন্দুকের নলের মাথায় রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি ক্ষমতা থেকে আর নামতে চান না। ফলে সমগ্র দেশে নিপীড়িত 'প্রজারা আওয়াজ তুলছে। এলা নামেন হুজুর, কুরসী থিকা নামেন।'[১৩৮] কিন্তু স্বৈরশাসক হুজুর যে কোনো মূল্যে কুরসীতে আজীবন আসীন থাকতে চান। তাই কুরসী স্বৈরশাসক হুজুরের শোষণ অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে চান। কুরসীর সংলাপে স্বৈরশাসন থেকে জনগণের মুক্তির এমন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন :

> আপনে হুজুর লাগাতার বহুতদিন আমার উপুরে বসছেন। এত লম্বা সময় আগে কেউ আমার উপুরে বইসা থাকতে পারে নাই। এলা আমারে ছারেন। আপনের মেয়াদ শ্যাষ।[১৩৯]

কিন্তু হুজুর কোনো ক্রমেই ক্ষমতা ছাড়বেন না। একারণে সমগ্র দেশজুড়ে গণ-আন্দোলন শুরু হলে স্বৈরশাসক হুজুর ও জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়েছে। এমন সময় জ্যোতিষ এসে কুরসীর জন্মাবধি থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভাগ্য গণনা করে কুরসীর দুঃখ-দুর্দশা ও ভাগ্য সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করে তোলেন। কিন্তু ক্ষমতালোভী স্বৈরশাসক হুজুর সামরিক পোশাক পরিবর্তন করে আর ক্ষমতা থেকে নামতে চান না। তিনি দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার গভীর ষড়যন্ত্র রচনা করেন। কিন্তু নিপীড়িত-নির্যাতিত জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দৃঢ় প্রত্যয়ে গণ-আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হুজুরকে ঘিরে ফেলেন। এ প্রসঙ্গে দেশমাতার সংলাপে তার সন্তান তথা জনগণের বিদ্রোহের চিত্র :

> প্রাণ গেলে প্রাণ পাইলেও পাইতে পারেন। কিন্তু এই কুরসী আর আপনেরা কেউ কোনোদিন পাইবেন না।[১৪০]

অতঃপর মা কুরসীকে তথা সামরিক শাসনতন্ত্রকে নিজ হাতে কুঠারাঘাতে ধ্বংস করেছেন। তখনও কুরসী-পাগল স্বৈরশাসকের বিলাপের মধ্য দিয়ে *কুরসী* নাটকের কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কুরসী* নাটকে প্রধান চরিত্র 'হুজুর একমাত্র বিকশিত চরিত্র।'[১৪১] দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর প্রধান হয়ে রাষ্ট্রীক্ষমতায় আসীন হন হুজুর। দেশের সঙ্কট স্থিতিশীল হলে আবার কুরসী বা রাষ্ট্রক্ষমতা গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সামরিক প্রধান হুজুর ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার মোহ আর উচ্চাভিলাষ তাকে স্বৈরশাসকে পরিণত করেছে। একারণে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে জনগণ অন্যায়-শোষণ-উৎপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য জাগরিত হলে স্বৈরশাসক হুজুর যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা রক্ষায় উজীরকে নির্দেশ দেন। হুজুর নিজের মুখে এই ক্ষমতালিপ্সা প্রকাশ করে বলেন :

> আমাকে কুরসী ছেড়ে দিতে হবে? খবরদার, আর যদি কেউ আমাকে কুরসী ছাড়ার কথা বলে [...] মহা মতলববাজ উজীর, আমার কুরসী সামলাও।[১৪২]

কুরসী নাটকে হুজুর চরিত্রটি আশির দশকের স্বৈরশাসক এরশাদের প্রেতাত্মা। সামরিক শাসক এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের অল্পকাল পরে জনগণ অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু 'কাপড় খুলিনি, কাপড় বদলেছি। এক কাপড় খুলে, আরেক কাপড় পরেছি।'[১৪৩] -এই কৌশল অবলম্বন করে স্বৈরশাসক এরশাদ সামরিক পোশাক পরিবর্তন করে রাজনৈতিক দল গঠনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। এজন্য দেশমাতার নিকট ক্ষমতার লোভে নানা ছলচাতুরি ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দেন। হুজুরের সংলাপে তার চরিত্রের মিথ্যা ছলচাতুরির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। যেমন :

> বহুদিন ঐ কুরসীতে বসেছি। সুখে দুঃখে কেটে গেছে অনেক ক'টি বছর। শেষবারের মতন একটিবার আমাকে ঐ কুরসীতে ক্ষণিকের জন্যে বসতে দিন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, বসেই উঠে পড়ব।[১৪৪]

কিন্তু হুজুর জনগণ ও দেশমাতাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েই ক্ষান্ত হননি– তিনি ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত করতে শঠতারও আশ্রয় নিয়েছেন। এজন্য হুজুর দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংগীত চর্চার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মন জয় করার অপচেষ্টা চালান। কথিত আছে যে, হুজুরের মতো স্বৈরশাসক এরশাদও দেশের প্রথিতযশা কবি-শিল্পীদের দ্বারা কবিতা লিখে নিয়ে নিজ নামে প্রকাশ করতেন। কিন্তু সবই তার

চরিত্রের অভিনয় মাত্র। ক্ষমতাকেই হুজুর একজন স্বৈরশাসকের দম্ভ মনে করতেন। ক্ষমতার জন্য তিনি নীতি-দুর্নীতি-রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। একারণে হুজুরের দাম্ভিক স্বৈরাচারী মনোভাব ও নারীবিদ্বেষী সংলাপ :

> এতকাল রাজ্য শাসন করেছি। নীতি, দুর্নীতি, রাজনীতিসহ তাবৎ রীতি নীতির রস, আদি রস আকণ্ঠ পান করেছি। কিন্তু শেষের পরেও যে শেষ থাকে এমন কথা তো কখনো শুনিনি? আমি রাজা হয়ে যা জানি না।
>
> [...]
>
> আমাকে শিক্ষা দেবে সামান্য এক রমণী।[১৪৫]

কিন্তু প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে দাম্ভিক স্বৈরশাসক এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণের হাতে অর্পণ করে পালিয়ে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করেছেন।

কুরসী নাটকে প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে মা অন্যতম। মা এ নাটকে রূপক চরিত্র। মা দেশমাতার প্রতীক। অত্যাচারী শাসক হুজুরের শাসন-শোষণ-নির্যাতনে জর্জরিত সাধারণ জনগণকে বাঁচাতে মা কুরসী তথা রাষ্ট্রক্ষমতাকে রক্ষায় এগিয়ে আসেন। স্বৈরশাসক হুজুর সামরিক পোশাক পরিবর্তন করে রাজনৈতিক দল গঠনের মধ্য দিয়ে আবার ক্ষমতা গ্রহণের উদ্‌যোগ করলে মা প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। মায়ের সংলাপে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ প্রণিধানযোগ্য :

> এই কুরসীর লিগা আপনে এই রাইজ্যে পারা দিয়াই ফন্দী ফিকির শুরু করছিলেন।
>
> [...]
>
> এই কুরসীর লিগা পাগল হইয়া আপনে মানুষ পর্যন্ত খুন করছেন।[১৪৬]

কিন্তু মা তো মমতাময়ী। স্বৈরশাসকও যে তার গর্ভের সন্তান। একারণে মা স্বৈরশাসকের মিথ্যা প্রবোধ সরল বিশ্বাসে মেনে নিয়েছেন। মা হুজুরকে আরেকবার কুরসীতে বসার সুযোগ দিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে। দিতাছি শেষ সুযোগ। কিন্তু বইসাই উইঠা পরবেন।'[১৪৭] কিন্তু স্বৈরশাসক হুজুর ক্ষমতা গ্রহণ করে আর মায়ের কথা রাখেননি। আবহমান গ্রামবাংলার একজন শাশ্বত মা তার সন্তানকে যেমন বুকের মাঝে পরম মমতায় আগলে রাখেন, তেমনি দেশকে রক্ষায় সন্তানকে উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। এ নাটকে মা তার এক সন্তানকে কুরসী তথা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন করলেও অন্য সন্তানের শোষণ-নির্যাতন দেখে ব্যথিত হয়েছেন। তাই দেশকে অত্যাচারী স্বৈরশাসকের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে আরেক সন্তান কুরসীর জীবন উৎসর্গ করেছেন। মায়ের সংলাপে দেশরক্ষায় তার মাতৃমূর্তি সার্থকতা লাভ করেছে। যেমন :

মা হইয়া সন্তানরে বিলাইয়া দিলাম। এইডা কুনো নতুন ঘটনা না। এই দ্যাশের লিগা আমার মতন বহুত মা সন্তান বিলাইয়া দিছে। আরো দিব। দিতেই হইবো। নাইলে এই দ্যাশ থাকবো না।[১৪৮]

বস্তুত কুরসীর জন্য মায়ের এই আত্মোৎসর্গ স্বৈরশাসক এরশাদ শাসনামলে দিপালী-জয়নাল থেকে নূর হোসেন প্রমুখ শহিদের স্মৃতি বহন করে।

এ নাটকে কুরসী চরিত্রটি অবিকশিত, তবে দেশমাতৃকার অত্যাচারিত সন্তানের প্রতীক। কুরসী দ্বারা এ নাটকে রাষ্ট্রক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরসী হচ্ছে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনার সমষ্টি– যার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হয়ে একজন শাসক রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন। এ নাটকে কুরসী রূপকের অন্তরালে নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণের প্রতীক। এ প্রতীকাশ্রয়ী চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার স্বৈরশাসক এরশাদ আমলের শোষণ-বঞ্চনার চিত্র চিত্রিত করেছেন। কুরসীর সংলাপে তার নির্যাতিত জীবনচিত্র প্রণিধানযোগ্য :

হুজুরে নাচতে নাচতে আমার কাছে আসে। তবলার চাট্টির তালে তালে আমার হাতে হাত রাইখা সমানে কইতে থাকে, কুরসী, তুই আমার জানের জান। [...] মারে মা তহনকার দিনে ওজন কি তার! পয়লা পয়লা পাইছে ত আমারে। য্যান্ দশমনি চাইলের বস্তা। এইভাবে গেল বেশ কিছুদিন। আমি ত মনে করলাম, এই দফায় রক্ষা নাই আমার।[১৪৯]

কুরসী নাটকে জ্যোতিষ বিশিষ্ট চরিত্র । জ্যোতিষ যেন সমগ্র জাতির বিবেক। রাজনীতি সম্পর্কে তিনি অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখেন। তিনি দেশপ্রেম ও নেতৃত্বে অকুতোভয়। দেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পর্কে তিনি যেমন দেশমাতাকে অবহিত করেছেন, তেমনি দেশের সঙ্কটকালে রাজনীতিক না হয়েও জনগণকে গণতন্ত্র রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ করেছেন। দেশ ও জনগণ সম্পর্কে বিদগ্ধ জ্যোতিষের লক্ষ সুনির্দিষ্ট :

এইবার শুধু এক লক্ষ্য। কুরসী হইতে এই হুজুরকে হঠাও। [...] মাতঃ, আশীর্বাদ কর সন্তানদেরে। তুমি মাতা, জয় লাভের জন্য তোমার আশীর্বাদ বড় প্রয়োজন। অভিমানের সময় এখন নয় মা। [...] ঢোলক...ঢোলক... কোথায়? বাজাও তোমার ঢোল বাজাও।[১৫০]

এছাড়াও এ নাটকে তিনজন প্রহরী, তিনজন উজীর, মহিলা এবং পুরুষ গ্রামবাসী প্রমুখ চরিত্র কাহিনি ও নাট্যঘটনাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। তবে ঢুলী চরিত্র প্রথমে হুজুরের পক্ষে কুরসীকে খোঁজার জন্য ঢোল বাজালেও পরবর্তী সময় তিনি ঢোলে বাড়ি দিয়ে নিপীড়িত জনগণকে বিদ্রোহে জাগরিত করেছেন। একারণে অন্যান্য চরিত্রগুলোও তাৎপর্যপূর্ণ।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *কুরসী* নাটকের সংলাপ আশির দশকের স্বৈরশাসিত রাজনীতি, সমকালীন শাসক ও জনগণের চরিত্রকে সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ নাটকের সংলাপ সহজ-সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তিতে বিষয়কে সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছে।

কুরসী নাটকে নাট্যকার আশির দশকের গণতান্ত্রিক রাজনীতির নেতৃত্ব শূন্যতাকে ভাবনা রূপে গ্রহণ করেছেন। এ সময়ে সামরিক জান্তা এরশাদের সামরিক পোশাক পরিবর্তন করে রাজনীতিতে প্রবেশ, জনগণের শোষণ-নির্যাতন, তজ্জনিত কারণে গণ-আন্দোলন ও স্বৈরশাসকের পতন এ নাটকের ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *কুরসী* নাটকে প্রহরী, উজীর, হুজুর, মা ও সাধারণ জনগণের পোশাক-পরিচ্ছদাদির বৈচিত্র্যে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ, মানসিক সংকেতের রূপায়ণে দৃশ্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ নাটকে 'দালালির শাস্তি/ ঢোল থাক পইরা'; 'হুজুরালী হুজুরালী/ বেহায়া মরদ গো' এবং 'আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় আমি চড়তাম না' প্রভৃতি গানের অন্তরা দর্শকের ক্লান্তি দূর করে নাটককে সার্থক করে তুলেছে।

মাইক মাস্টার

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মাইক মাস্টার* নাটকটি নাটকীয়তায় উত্তীর্ণ। এ নাটকে মাইক মাস্টার হজরত আলী পার্টির সভার ঘোষণাপত্র পাঠ করতে গিয়ে মতলুব মিয়ার মতো অযোগ্য ব্যক্তির লেখা পড়তেই নাট্যক্রিয়া শুরু হয়েছে। মাইক মাস্টার হজরত আলীর সংলাপে নাট্যক্রিয়া প্রণিধানযোগ্য :

> এ্যাহ, দফতর সম্পাদকের হাতের লেখার ছিরি দ্যাখ– কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং– শালার এমন হাতের লেখা নিয়ে মতলুব মিয়া কি করে যে পার্টির দফতর সম্পাদক হয় বুঝি না।[১৫১]

মাইক মাস্টার নাটকে বঙ্গবন্ধু উত্তর রাজনৈতিক সঙ্কটকালে একজন আদর্শবান রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে নীতিহীন রাজনীতির দ্বন্দ্বকে নাট্যকার প্রকট করে তুলেছেন। এ নাটকে মাইক মাস্টার হজরত আলী নীতিহীন রাজনীতিকে বিসর্জন দিয়ে পার্টি অফিস ছেড়ে যেতে চান। কেননা যে রাজনীতি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, জাতির জনকের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে না– সেই রাজনীতি করে লাভ কী? হজরত আলীর এই উদ্যোগ দর্শকের মনে নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মাইক মাস্টার* নাটকে এক আদর্শবান রাজনৈতিক কর্মীর আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে হঠাৎ দূরসম্পর্কের নাতির মৃত্যুর খবর নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি করেছে। এ নাটকের মূল ঘটনা তখন দর্শকের মনকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে। কিন্তু নাটক শেষে এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলার বঙ্গবন্ধু, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, চিলির আলেন্দে, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা ও যুক্তরাষ্ট্রের আব্রাহাম লিংকন প্রমুখ রাজনীতিবিদকে আহ্বান *মাইক মাস্টার* নাটকে আকস্মিকতা সৃষ্টি করেছে।

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মাইক মাস্টার* নাটকের নাট্যবৃত্ত (Plot) গড়ে উঠেছে একজন সৎ, আদর্শবান ও নীতিবাদী রাজনৈতিক কর্মীর জীবন ও নীতির বঞ্চনাকে কেন্দ্র করে। *কোকিলারা* নাটকের মতো আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মাইক মাস্টার* একক চরিত্রনির্ভর নাটক। তবে নাট্যকারের নিপুণ বুননে ও কাহিনির অন্তর্বয়নে আরো অনেক চরিত্র মাইক মাস্টারের সংলাপে স্পষ্ট হয়ে নাট্যঘটনাকে সফলতা দান করেছে।

মাইক মাস্টার নাটকে স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য সমন্বিত হয়েছে। এ নাটকে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক নেতৃত্বের আদর্শশূন্যতা সমকাল ও সমগ্র বাংলাদেশের পটভূমিকে তুলে ধরেছে। নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী হজরত আলীর ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে হাতেখড়ি– তারপর একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দলে যোগদান, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশের স্বাধীনতা লাভ ও বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক নেতৃত্বে আদর্শের সঙ্কটজনিত কারণে একজন হজরত আলীর নাতির হত্যার ন্যায্য বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চনা প্রভৃতি ঘটনা *মাইক মাস্টার* নাটকের মূল ঘটনাকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মাইক মাস্টার* নাটকের কাহিনি একজন নিষ্ঠাবান বাম রাজনৈতিক কর্মী হজরত আলীর রাজনৈতিক আদর্শের পরাজিত জীবনের করুণ চিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ নাটকে হজরত আলী নষ্ট রাজনীতির যাতাকলে পিষ্ট হলেও তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রাজনৈতিক আদর্শ-উদ্দেশ্য উন্নত রয়েছে। তিনি এদেশের নষ্ট রাজনীতির মতলুব মিয়াদের মতো সুবিধাভোগী জনসেবকদের কথা বর্ণনা করতে তার নিজের রাজনৈতিক আদর্শের কথা তুলে ধরেছেন। একজন মাইক মাস্টার ছাত্রজীবনে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। মানুষের সেবাকে তিনি রাজনৈতিক ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হজরত আলীর সংলাপে মানবসেবার এমন মহত্ব প্রণিধানযোগ্য :

> কলেজে আমরা একদিন প্রিন্সিপালের কামরার সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেছিলাম। পুলিশ এসে আমাদের চ্যাঙদোলা করে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা থানায় বসেই স্লোগান দিয়েছিলাম, 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই।' ছাত্রদের দাবির কাছে সেদিন লোকাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে মাথা নত করতে হয়েছিল। আমরা বুক ফুলিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। থানার গেটে আমাদের মালা পরানো হয়েছিল। [...] আমি অন্তত সেদিন সেই মুহূর্তেই গলার মালা ছুঁয়ে মনে মনে শপথ করেছিলাম, দেশ আর দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবো।[১৫২]

হজরত আলী দেশের মানুষের কল্যাণে নিজ ভিটেমাটি ত্যাগ করে দেশ ও দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ দূর করতে রাজনীতিতে ছাত্রজীবনেই যুক্ত হলেন। কিন্তু নেতারা দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সভা-সেমিনার, আন্দোলন-সংগ্রামে গদ-বাঁধা এক প্রকার বক্তব্য প্রদান করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকেন। অথচ এদেশের সন্তানের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পিতা একদিন ঘোষণা দিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জীবন বাজি রেখে একদিন পিতা পুত্রকে এনে দেন মুক্তি, স্বাধীনতা। বিনিময়ে পুত্র সাজে জন্মদাতা পিতার কুৎসিত ঘাতক। পিতার রক্তে রঞ্জিত করে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি।'[১৫৩] হজরত আলী বঙ্গবন্ধু উত্তরকালে জাতির জনকের রাজনৈতিক আদর্শে বলীয়ান একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী হয়েও তার নাতির হত্যার বিচারের আশায় মতলুব মিয়াকে ধরে নেতার নিকট গেলে– নেতা হজরত আলীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য মতলুব মিয়াকে একটা বিবৃতি ও শোকবার্তা লেখার নির্দেশ দেন। মতলুব মিয়াকে নেতার দেয়া নির্দেশ থেকে সমকালীন রাজনীতির দায়িত্বহীনতা এ নাটকের কাহিনিকে প্রাণবন্ত করেছে। মাইক মাস্টরের সংলাপে নেতার দ্বায়িত্বহীন নির্দেশ :

> আইচ্ছা আইচ্ছা। বিবৃতির ল্যাজে একখান শোক প্রস্তাবও লাগাইয়া দেওন যাইবো নি। মতলুব মিয়া, যেমুন কইলাম বিবৃতির ল্যাজে– বুজছ তো–[১৫৪]

এরপর হজরত আলী একপ্রকার রাজনীতি ছেড়ে দেন। তবুও তার প্রত্যাশা একদিন এদেশের বুকে বঙ্গবন্ধু, প্যাট্রিস লুমুম্বা, আলেন্দে, নেলসন ম্যান্ডেলা ও আব্রাহাম লিংকনের মতো নেতার নেতৃত্ব এবং শ্রীচৈতন্যের প্রেম এদেশের নেতাদের হৃদয় ভরিয়ে দেবে। মাইক মাস্টার হজরত আলীর সংলাপে এ প্রত্যাশা প্রণিধানযোগ্য :

> বাঙালি যেমন ভালোবাসে জনক জননীকে, বধূকে, পুত্র-কন্যাকে তেমনি তাদের ভালোবাসতে শেখাও তাদের পরিবেশকে, তাদের বাসস্থানকে, কর্মস্থলকে, জাতিকে, দেশকে, দেশবাসীকে।[১৫৫]

মাইক মাস্টার নাটকের কাহিনির সমাপ্তিতে একজন হজরত আলীর এই প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে শুদ্ধসত্তার রাজনীতির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মাইক মাস্টার* নাটকটি একক চরিত্রনির্ভর নিরিক্ষাধর্মী নাটক। একজন মাইক মাস্টার হজরত আলী দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে সাম্যের ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বামপন্থি রাজনীতিতে একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে জাতির জনকের নেতৃত্বে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছেন। তার ব্যক্তিগত পরিচয়– তিনি বি.এ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন। আর দশজন রাজনীতিকের মতো তিনিও গ্রেফতার, পুলিশি নির্যাতন ও জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নেতাদের মালা দিয়ে বরণ করে নেয়ার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আলীর সংলাপে তার পারিবারিক ও রাজনৈতিক পরিচয় :

> মাইক মাস্টার হজরত আলী– পিতা মৃত একাব্বর আলী মুন্সী– [...] আমি উনিশ বিয়াল্লিশ সালে মেট্রিক পাস করে ঠেলেঠুলে বি.এ পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। তারপর, ঐ বি.এ ক্লাসে পড়তে পড়তেই রাজনীতির গন্ধম গুলিটা পেটে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা অস্তিত্বে দেশ আর দশের মুক্তির বিষয়টি যাকে বলে একেবারে কম্বল-লেপ্টা হয়ে জাঁকিয়ে বসলো।[১৫৬]

কিন্তু মাইক মাস্টার হজরত আলী যে আদর্শ ও নীতিকে ধারণ করে রাজনীতিতে যোগদান করেন, অল্পদিনের মধ্যে তার ম্লান রূপ দেখে সংকুচিত হয়েছেন। কেননা যে নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতি অল্প সময়ের মধ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম– অতঃপর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করেছেন; স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বিশ্বাসঘাতক জাতি তাদেরই পিতাকে হত্যা করেন। এমনকি পিতার হত্যার পর কেউ প্রতিবাদটুকুও করেননি। হজরত আলী এ সময়ের শুধু একজন রাজনৈতিক কর্মীই নন, একজন নির্মোহ পর্যবেক্ষক হিসেবে এদেশের রাজনীতির এই দৈন্য-দশা দেখে হতবাক হয়েছেন। এ জন্য প্রচলিত রাজনীতির প্রতি হজরত আলী ক্ষোভে-প্রতিবাদে-বিদ্রূপে ফেটে পড়েছেন। তিনি মতলুব মিয়ার মতো সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের প্রতি বিদ্রোহী কণ্ঠে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মাইক মাস্টারের সংলাপে প্রতিধ্বনিত এই প্রতিবাদ ও ঘৃণা :

> এই শালা মতলুব কোথায় তুমি? শালা বউ নিয়ে মজা মারছো? ব্যাবাক মজা তোমার পেছন দিয়ে বার করবো শুয়ার। দিনের বেলায় ব্ল্যাক মার্কেট কর আর রাতের বেলায়– পলিটিক্সের নামে তোমরা কি কি কর সব ফাঁস করে দেব আমি।[১৫৭]

মাইক মাস্টার নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন হজরত আলীকে একজন নির্যাতিত-নিপীড়িত ও উপেক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নির্মাণ করেছেন। মাইক মাস্টার হজরত আলী এদেশের ভাগ্যবঞ্চিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। সভা-সেমিনার, মিছিল-মিটিং, আন্দোলন-সংগ্রামে যোগদান করে অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেছেন। কিন্তু সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতায় হজরত আলী তার দূর সম্পর্কের প্রতিবাদী নাতির হত্যার বিচার প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। একারণে হজরত আলী রাগে-ক্ষোভে-অভিমানে রাজনীতি ছেড়ে দেন, কিন্তু ক্ষুধা-দারিদ্র্যের নিকট হার মেনে আবার পার্টি অফিসে ফিরে এসে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অন্যায়-অত্যাচার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। একজন হজরত আলী পরাজিত হলেও প্রত্যাশা করেন যোগ্য নেতারা রাজনৈতিক মহাপুরুষদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে একদিন দেশের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করবেন। তাই মাইক মাস্টার হজরত আলীর প্রত্যাশা :

> প্রেমের শক্তিতেই বাঙালির হৃদয়ের আসনে সসম্মানে অধিষ্ঠিত হোক জাতির পিতা, একজন বঙ্গবন্ধু, একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন শহিদ জননী এবং [...] দেশ বাংলাদেশ।[১৫৮]

মাইক মাস্টার হজরত আলীর এই প্রত্যাশা তার শুদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্বের গভীর চেতনা থেকে উৎসারিত হয়েছে। এ নাটকে হযরত আলী একক চরিত্র হলেও তার সংলাপে ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, নষ্ট রাজনীতির হোতা মতলুব মিয়া, নেতা, নাতি, পথচারী প্রমুখ চরিত্রেরও রূপ ফুটে উঠেছে।

সংলাপ রচনায় আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মাইক মাস্টার* নাটকটি একক কৃতিত্বের দাবিদার। একক চরিত্রনির্ভর এ নাটকের সংলাপগুলো সমকালীন রাজনীতি নির্ভর। মাইক মাস্টার হজরত আলী শিক্ষিত বলে তার সংলাপগুলো প্রমিত ভাষারীতির। আবার হজরত আলীর জবানীতে যখন অর্ধশিক্ষিত মতলুব মিয়া কিংবা বাথরুমের আগন্তুকের সংলাপ বর্ণিত হয়েছে তখন আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। এছাড়া মাইক মাস্টারের জবানিতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ কিংবা হজরত আলীর রাজনৈতিক বক্তব্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে চরিত্রানুগ হয়েছে।

মাইক মাস্টার নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন বঙ্গবন্ধু উত্তরকালের রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চিত্রকে ভাবনা রূপে চিত্রিত করেছেন। এ নাটকে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আদর্শহীনতা, স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক দলের ভাঙ্গাগড়া, সামরিকতন্ত্রের উত্থান-পতন, অধিকিন্তু শুদ্ধ রাজনীতির প্রত্যাশা মাইক মাস্টার হজরত আলীর সংলাপে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের *মাইক মাস্টার* নাটকের দৃশ্য চমৎকৃত। এ নাটকে অতি সাধারণভাবে লম্বালম্বিভাবে পাতানো একটি টেবিল ও একটি মাইক দ্বারা সজ্জিত মঞ্চে– যা একটি নিষ্ঠাবান বাম রাজনৈতিক কর্মীর অনাড়ম্বর জীবনচিত্রকে তুলে ধরে। পোশাক-পরিচ্ছদাদির তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই, তবে মাইক মাস্টার হজরত আলীর সংলাপে বঙ্গবন্ধু-উত্তর রাজনৈতিক নেতৃত্বশূন্যতা, কতিপয় রাজনীতিকের নীতিহীন রাজনৈতিক চর্চা, রাজনৈতিক ব্যর্থতাজনিত কারণে মানুষের আশাহত বেদনা, একজন মাইক মাস্টারের শুদ্ধ রাজনীতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা এ নাটকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। *মাইক মাস্টার* নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার নেই, তবে এ নাটকে একটি কবিতা আবৃত্তি হয়েছে। যা সঙ্গীতের মতো দর্শকের মনের একঘেয়েমি দূর করতে পরিপূরক। এ নাটকে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার নেই।

ঘ. শ্রেণিসংগ্রাম কেন্দ্রিক :

আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত ধনিকশ্রেণি কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ-বঞ্চনাজনিত প্রতিবাদ ও শ্রেণিসচেতনতা তাঁর রচিত শ্রেণিসংগ্রাম কেন্দ্রিক *সেনাপতি* ও *দূরপাল্লা* নাটকদ্বয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁর *সেনাপতি* নাটকের রূপ-রীতি বিশ্লেষিত হলো :

সেনাপতি

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সেনাপতি* নাটক নাটকীয়তার বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। এ নাটকে শ্রমিকদের সর্দার দাবিদাওয়া নিয়ে প্রথম যখন মালিকের নিকট থেকে ফেরত এসে বলেন, 'একটা নতুন মালের আমদানি হইছে। শুনলাম, বেবাক কলকাঠি এখন সেই মালের হাতে'[১৫৯] তখন নাট্যক্রিয়া শুরু হয়। আবার শ্রমিক শ্রেণির একপক্ষ 'সিস্টেম' বা মালিকের (তালুকদারের) পক্ষাবলম্বন করলে সর্দারের নেতৃত্বে অন্যপক্ষ অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে উঠলে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি-দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। যেমন :

১ম শ্রমিক : আমি তোমাগো দলে নাই চাচা।

৪র্থ শ্রমিক : আমিও নাই।

২য় শ্রমিক : আর কে কে ঐ দিকে যাইবা? এখনই যাও। আমাগো হাতে এখন অনেক কাম। আর আছ কেউ ঐদিকে যাইবার?

সর্দার : ভাগাভাগি হইয়া গেলো সিধু ভাই? ভাঙন শুরু হইল? [১৬০]

এ নাটকে শ্রমিকদের আন্দোলন ও রহিম মোল্লার মৃত্যু নাট্যোৎকণ্ঠা তৈরি করেছে। নাটকের শেষ দিকে যখন রহিম মোল্লার লাশ নিয়ে সিধু ভাই ও সর্দার মিছিল করার প্রস্তুতি নেন, ঠিক তার আগের রাতে

তালুকদার লাশ সরিয়ে ফেললে নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি হয়। আবার নাটকশেষে মেয়ে এসে স্যারকে (মিল মালিককে) নিয়ে গেলে আকস্মিকতা পরিলক্ষিত হয়।

সেনাপতি নাটকের বৃত্ত 'সিস্টেম' ও 'এস্টাবলিশমেন্ট' নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শোষিত-বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ নাটক তেরোটি দৃশ্যে রচিত। অঙ্ক বিভাজন নেই। তবে সপ্তম দৃশ্যে মালিক-শ্রমিকের মাঝামাঝি অবস্থানে তালুকদার চরিত্রকে চিত্রিত করে নাট্যকার অ্যারিস্টলীয় রীতির Midle বা মধ্যবিন্দু নির্ণয় করেছেন। যেখানে এ নাটকের চরম অবস্থা বিরাজ করেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সেনাপতি* নাটকের তিনটি অংশে– বাম পাশে তালুকদার, ডানপাশে স্যার এবং মধ্য অংশ নিরপেক্ষ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে দৃশ্যান্তর ঘটেছে। তবে ঐক্যনীতি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সেনাপতি* নাটকের কাহিনি শ্রমজীবী মানুষের দাবি আদায়ের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এ নাটকের কাহিনির শুরু রূপকের মধ্য দিয়ে। প্রথম দৃশ্যে একটি উন্নয়নশীল দেশের জাগ্রত চেতনাধারী শখের প্রদীপ আহরণকারী পুরনো হ্যারিকেন ঘষা দিলে এম.এ পাশ মধ্যবিত্ত বেকার যুবক আব্বাস আলী তালুকদারের আগমনের মধ্য দিয়ে কাহিনি শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে আব্বাস আলী তালুকদারের কর্মহীন সংসারে বাড়িওয়ালা তিন মাসের বকেয়া ভাড়া আদায় করতে আসেন। কিন্তু ভাড়ার টাকা দিতে না পারলে বাড়িওয়ালা তালুকদারের বিবাহ বার্ষিকীতে উপহার হিসেবে পাওয়া ফুলদানি নিয়ে যেতে উদ্যত হন। তখন তালুকদারের স্ত্রী মেরীর প্রচেষ্টায় তা রক্ষা পায় এবং মেরী কর্মহীন স্বামীকে ভর্ৎসনা করে বলেন :

> তোমাকে আমি আরো কিছু কথা শোনাতে চাই– আরো জ্বালাতে চাই– আর তো কিছু করতে পারবো না। আমি যে এক অক্ষম অকর্মণ্য অপদার্থ স্বামীর স্ত্রী। শুনছো, আমি তোমাকে অক্ষম বলছি, অকর্মণ্য বলছি, অপদার্থ বলছি।[১৬১]

তৃতীয় দৃশ্যে শখের প্রদীপ আহরণকারী শিল্পপতি স্যারের এলাকায় পুরনো হ্যারিকেন ঘষা দিলে চতুর তালুকদার অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। চতুর্থ দৃশ্যে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্রমুখ শ্রমিক তাদের দাবিদাওয়া আদায়ে ব্যর্থ হয়ে এসে মেরীকে দায়ী করেন। কিন্তু হঠাৎ মেরীর সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের ভুল ভাঙে। পঞ্চম দৃশ্যে বাড়িওয়ালার মেয়ে বেলী ও মেরী স্বভাবসুলভ আলাপরত। এমন সময় তালুকদার বাসায় প্রবেশ করে বেলীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে মন্তব্য করলে মেরীর সঙ্গে

বাদানুবাদ শুরু হয়। ষষ্ঠ দৃশ্যে এই অচেনা তালুকদার তোষামোদ করে স্যার তথা মিল মালিককের হৃদয় এতটাই দখল করেন যে– স্যারের মেয়ের জামাইকেও ঘরজামাই বলে অপমান করেছেন। সপ্তম দৃশ্যে আব্বাস আলী তালুকদারের মালিক-শ্রমিকের মধ্যবর্তী অবস্থান *সেনাপতি* নাটকের কাহিনিকে রহস্যময় ও জটিল করে তুলেছে। এ দৃশ্যে সর্দার, ১ম শ্রমিক, ২য় শ্রমিক কিংবা সিধু ভাই কেউ নির্ণয় করতে পারে না যে, আসলে তালুকদার শ্রমিক না মালিক শ্রেণির পক্ষে। অষ্টম দৃশ্যে তালুকদার চরিত্রের অতীত জীবনে দারিদ্র্যের আত্মগ্লানি তাকে সন্দেহবাদী পুরুষে রূপান্তর করেছে। তালুকদার মেরী ও বাড়িওয়ালার ছেলে সিধু ভাই সম্পর্কে নোংরা সন্দেহ করে স্ত্রীকে অপমান করেছেন। তালুকদারের সংলাপে তাদের পারিবারিক জীবনের সন্দেহ ও সঙ্কট স্পষ্ট হয়েছে। যেমন :

> যখন গরিব ছিলাম তখন কিছু বলি নি। শুধু দেখেছি। আজ আমি বাড়িওয়ালাকে সাতাইশ শ' টাকা দিয়েছি। আজ বলছি, আমার বাড়িতে থেকে ঐসব ছেনালিপনা চলবে না।[১৬২]

অপমানিত মেরী স্বামীর উপার্জনের উৎস সম্পর্কে জানতে পারলে তালুকদার তা প্রকাশ না করার জন্য মেরীর গলা টিপে ধরে শাসন করেন।

নবম দৃশ্যে তালুকদারের আধিপত্য নিজের ঘর থেকে মিলের শ্রমিকদের ওপরও প্রসারিত হয়েছে। দশম দৃশ্যে তালুকদার স্যারকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বোঝান যে, মিলে কোনো গণ্ডগোল নেই। কিন্তু একাদশ দৃশ্যে ১ম শ্রমিক মিলে গণ্ডগোলের সময় আহত রহিম মোল্লার মৃত্যুর জন্য তালুকদারকে দায়ী করেন। কিন্তু মিলে আহতদের রক্তের দাগ শুকানোর অনেক আগেই মুছে ফেলে তালুকদার রহিম মোল্লার লাশ গোপন করার জন্য মনে মনে অভিসন্ধি করেন। দ্বাদশ দৃশ্যে রহিম মোল্লার লাশ হাসপাতাল থেকে গোপন করায় শ্রমিকদের দুই দলে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শ্রমিকগণ স্যার ও আব্বাস আলী তালুকদারকে ঘিরে ফেলেন। তারা একটার পর একটা ঘটনা এবং দাবিদাওয়া তুলে ধরলে স্যারের চোখ খুলে যায়। তখন তালুকদার পশ্চাদপদসরণ করেন। ত্রয়োদশ দৃশ্যে স্যার তালুকদারকে ডাকলেও সাড়া দেন না। তিনি ব্রিফকেসে সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছেন। স্যারের নিকট বিশ্বাসঘাতক তালুকদারের স্বীকারোক্তি :

> আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না স্যার, আমি জন্মগ্রহণ করেছি, আপনাকে ধ্বংস করার জন্য।[১৬৩]

এমন সময় স্যারের মেয়ে এসে বাবাকে (স্যার) উদ্ধার করে নিয়ে যান। আন্দোলনরত শ্রমিকের হাতে তালুকদারের মৃত্যু অর্থাৎ পুঁজিবাদ যেন আর নিম্নবিত্ত শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করতে না পারে– এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে কাহিনি শেষ হয়েছে।

চরিত্র চিত্রণে *সেনাপতি* নাটক অনন্য। নাট্যকার এ নাটকে প্রধান চরিত্র এম.এ পাশ শিক্ষিত বেকার যুবক আব্বাস আলী তালুকদার নামের সেনাপতি চরিত্রটি আগাগোড়া টানটান করে চিত্রিত করেছেন। তালুকদার শিক্ষিত হলেও কাজের সুযোগ-বঞ্চিত হয়ে বেকার জীবনে দুঃখ, দৈন্য-দশার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে আছেন। একারণে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া মানসিকতার তালুকদার ভবঘুরে–উন্মাতালের মতো কর্মহীন-বেকার দরিদ্র জীবনের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে নিজেকে ভুল পথে পরিচালিত করে একজন সৎ শিল্প মালিকের তোষামোদ শুরু করেন। স্যারের প্রতি তোষামুদে চরিত্রের অধিকারী তালুকদারের সংলাপ :

> এখন আপনি যা চান তা আপনাকে দিতে পারে একমাত্র একজন আব্বাস আলী তালুকদার। আপনি চান সমাজতান্ত্রিক খ্যাতি ও হাঁক-ডাক। আরো চান ওঠা এবং বসা, চলা এবং ফেরায় এক ধরনের ব্যক্তিগত গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ঠিক ধরেছি না স্যার? [১৬৪]

স্যারের (মিল মালিক) সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উচ্চাভিলাসের সুযোগ নিয়ে তালুকদার ক্রমে তার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। অন্যদিকে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে 'সিস্টেম' ও এস্টাবলিশমেন্ট' নামক নীতি চালু করেন– যা তালুকদারকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক এবং লোভী শ্রমিক শোষকে রূপান্তর করেছে। তালুকদার চরিত্রের স্বার্থপরতা, হঠকারিতা যেমন ব্যক্তিজীবনের না পাওয়ার ব্যর্থতা থেকে উৎসারিত হয়েছে, তেমনি রয়েছে তার বিত্তের উচ্চাভিলাস, ক্ষমতার মোহ। 'আসলে এই আব্বাস আলী তালুকদার বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালের সত্তর দশকের বিপর্যস্ত আর্থসামাজিক অবস্থার শিকার এক বিক্ষুব্ধ চরিত্র'।[১৬৫] সমকালে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিকাশ ঘটলে সমাজের গুটিকয়েক মানুষ প্রভূত সম্পদের মালিকানা অর্জন করে আর তালুকদাররা লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হন। একারণে আব্বাস আলী তালুকদার ভোগবাদী অর্থব্যবস্থায় সংসারজীবনে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন, অন্যদিকে সংসার নামের পবিত্র প্রতিষ্ঠানকে তাচ্ছিল্য করতে সংকুচিত হন না। এ নাটকে তালুকদারের আত্মকথনে তার চরিত্রের এই ক্রুর রূপ ফুটে উঠেছে :

> ছিলাম ডাস্টবিনের আবর্জনা– বসার জায়গা পেয়ে গেলাম ফোমের গদি আঁটা ডবল সোফায়। গড়ে প্রতিদিন অন্তত বার দশেক তুমিই তো আমাকে ছোটলোকের বাচ্চা বলে সম্ভাষণ করেছো। ডাস্টবিন থেকে সোফা, একী কম আস্ফালন! আমি ছোটলোকের বাচ্চা। এক আধটু ঝাঁকুনি খাবো না? ঝাঁকুনি খেয়ে আমি যে তোমার গলা টিপে ধরেছিলাম, সে তোমাকে মারবার জন্যে?[১৬৬]

তালুকদার চরিত্রের এই বিদ্রোহ তাকে এতটাই আত্মবঞ্চিত করেছে যে, যে স্ত্রী তাকে ভালোবেসে এক কাপড়ে বাবার ঘর ছেড়ে এসে মিলে চাকরি করে সংসারের ঘানি টানার দায়িত্ব নেন, তাকেও তালুকদার

ঘর থেকে বের করে দেন। তিনি যে অধিকার বঞ্চিত শ্রমিক সমাজ থেকে উঠে এসে নিজেদের শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন– তাদেরকেও অবজ্ঞা করেছেন। আব্বাস আলী তালুকদার চরিত্রের এই সঙ্কট, দ্বন্দ্ব ও জটিলতা তাকে নিজেদের শ্রেণির নিকট স্বার্থান্ধ, বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারকের প্রতীকে রূপান্তর করেছে। একারণে তিনি আন্দোলনরত শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করে আন্দোলন দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আব্বাস আলী তালুকদারের সংলাপে তার বিশ্বাসঘাতকতার রূপ স্পষ্ট হয়েছে। যেমন :

> স্যার জানেন, তোমরা পুনর্বহাল হয়েছো। কিন্তু আসলে হও নি, কোনোদিন হবেও না। অতএব মালিকের বাড়িতে মিছিল করে যাওয়া, তাঁর সঙ্গে দেখা করা, সরাসরি তাঁর মুখ থেকে কিছু শোনা কোনোটাই আইনসঙ্গত হবে না। আর বেআইনি কিছু হলে আমাদের পোয়াবারো।[১৬৭]

আব্বাস আলী তালুকদার নিজের স্বার্থের প্রতিষ্ঠায় এতটাই উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠেন যে, তিনি যেন বিবেকবর্জিত পুঁজিবাদী সমাজের একজন ক্রীড়নক এবং প্রতিভূ হয়ে ওঠেন। কিন্তু শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হলে তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

সেনাপতি নাটকে মেরী চরিত্রটি আধুনিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সততা ও মানবিকতায় অনন্য। মেরী আর দশজন নারীর মতো স্বভাবসুলভ স্বামীর সঙ্গে সুখের সংসার রচনা করেছেন। সংসারে অভাবের বোঝা কাঁধে নিয়ে মিলের ফিমেল লেবারওয়েলফেয়ার সুপারভাইজার হিসেবে যোগদান করেন। মেরী শুধু ঘরেই নয়, বাহিরেও মিলের শ্রমিকদের মধ্যে একজন সচেতন ব্যক্তিচেতা নারী। মিলের শ্রমিকরা দূর থেকে তাকে দেখে শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চনার জন্য 'কলকাঠি' নাড়া ব্যক্তি মনে করলেও তিনি এড়িয়ে যান। শ্রমিকদের দাবির পক্ষে শ্রমিক নেতা সিধু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চান। তালুকদারের হঠাৎ অস্বাভাবিক উপার্জন দেখে বিচলিত হয়ে ওঠেন। স্বামী তালুকদার কর্তৃক নির্যাতিত হলে আত্মদহনে দগ্ধ মেরী স্বামীর প্রতি রাগে–ক্ষোভে হৃদয়ের ক্ষরণ উৎসারিত করে বলেন :

> কিন্তু একদিন খুব প্রয়োজন মনে করতে। যেদিন এক বেকার যুবকের হাত ধরে রাস্তায় নেমে এসেছিলাম। যেদিন ঘর নিয়ে ছিলাম, সংসার পেতেছিলাম। যে দিন ক্ষুধার জ্বালায় ঘরের বউ আমি চাকরিতে ঢুকেছিলাম।[১৬৮]

বস্তুত মেরীর হৃদয়-ক্ষরণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ যাপিতজীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলোর প্রকাশ ঘটেছে। মেরী দুঃখকে সঙ্গে নিয়ে সুখের টানে চলেছেন অথচ তালুকদার মিথ্যা পুঁজির অহংকারে বারবার মেরীকে আঘাত করেছেন। তখন মেরী সত্যকে আঁকড়ে ধরে ঘর ছেড়েছেন। ঘরে-বাহিরে অধিকার বঞ্চিত হতে

হতে মেরী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দৃপ্তকণ্ঠে স্বামীর সকল অপকর্মের তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। সত্য প্রতিষ্ঠায় এবং মিথ্যার প্রতীক তালুকদারের ধ্বংসের জন্য সৎ মিল মালিকের বিবেকের জাগরণে আহ্বান জানিয়েছেন :

> আব্বাস আলী তালুকদার অনেক আগেই আপনাকে মেরে ফেলেছে। আপনি টের পান নি। মাটির নিচে থেকে ওঠানো হয়েছে যে লাশ সেটা আসলে রহিম মোল্লার নয়, আপনার।[১৬৯]

অথচ প্রেমিক মেরীর নিকট তার চরিত্রের দৃঢ়তা নমনীয় হয়েছে। যখন শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে তালুকদারের মৃত্যু হয়েছে তখন মেরী স্বামীর লাশটা গ্রহণ করেছেন। কেননা, 'আব্বাস আলী তালুকদার মরে গেছে। মরা উচিত ছিল, মরেছে। এই মৃতদেহ আর কোনোদিন প্রাণ পাবে না। মৃতদেহের সঙ্গে শত্রুতা নিরর্থক, অযথা কালক্ষেপণ'। তাই মেরী শত্রু জেনেও স্বামীর লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেছেন। একারণেই মেরী চরিত্র মানবিকতায় উজ্জ্বল।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সেনাপতি* নাটকে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার বাস্তবায়নে অগ্রণী নেতৃত্বদানে সিধু ভাই চরিত্র অসাধারণ। হঠাৎ মিলের শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া অগ্রাহ্য হলে সিধু ভাই এগিয়ে আসেন। শ্রমিকরা যখন নিজেদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি করে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছেন সিধু ভাই তখন ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। কারণ সিধু ভাই অনুধাবন করেছিলেন অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই। একারণে তিনি বিভক্ত শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণের মূর্ত প্রতীক–পুঁজিবাদের ধারক তালুকদারকে পরাহত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সিধু ভাইয়ের সংগ্রামী বলিষ্ঠ সংলাপ :

> শত্রু নিজ থেকে বিলুপ্ত হয় না। স্বেচ্ছায় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে নামে না। এই, নিয়ে যাও এটাকে। দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে এসো।[১৭০]

সিধু ভাইয়ের মতো সর্দার চরিত্রটিও শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সক্রিয়। সর্দার সবসময় সহকর্মী শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে মালিকের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে কখনো বেঈমানি করেননি; মালিকের প্রতিও তার গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা রয়েছে। একারণে মিল শ্রমিকদের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হলে তিনি ছুটে এসে মালিককে জানান :

> যাইতেছি স্যার। তবে আপনের নুন খাইছি, আপনে আমাগো অনেক ভালোবাসা দিছেন একবার অন্তত আপনেরে হুশিয়ারি না দিলে আল্লা আমাদের গুনা দিব।[১৭১]

সর্দার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাকে একজন শ্রমিক নেতা হিসেবে উচ্চকিত করেছে।

সেনাপতি নাটকে বাড়িওয়ালা, স্যার, ঘরজামাই, মেয়ে প্রমুখ চরিত্রগুলো অপ্রধান হলেও কাহিনির গতিতে সক্রিয়তা দান করেছে। এছাড়া ১ম শ্রমিক, ২য় শ্রমিক, ৩য় শ্রমিক, ৪র্থ শ্রমিক ও বেলী প্রমুখ চরিত্রগুলো শ্রমিক আন্দোলন ও পারিবারিক আবহকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তবে শখের প্রদীপ আহরণকারী চরিত্রটি সংস্কৃত নাটকের রীতিতে নাট্যকাহিনির বীজ স্থাপন করেছেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সেনাপতি* নাটকে উচ্চশ্রেণির মুখের ভাষা যেমন সংলাপে রূপদান করেছেন, তেমনি শ্রমিকশ্রেণির মুখের ভাষা নির্মাণ করেছেন। *সেনাপতি* নাটকের ভাবনা গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্রমবিকাশমান পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার যাতাকলে শোষিত-নির্যাতিত-নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণির মানুষের জীবনকেন্দ্রিক। এ নাটকের ভাবনা একারণে বিষয় ও চরিত্রানুগ হয়েছে।

সেনাপতি নাটকের দৃশ্য কখনো কখনো ঘটনার পটভূমি, কখনো পোশাক-পরিচ্ছদে, রূপে, কখনো বা চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থায় মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব বা শ্রেণিসচেতনতা চিত্রিত করেছে। যেমন: স্যার বা মিল মালিকের পারিবারিক অবস্থা, শ্রমিকদের আন্দোলন কিংবা তালুকদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এ নাটকের দৃশ্যকে শিল্পিত করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সেনাপতি* নাটকে ১ম শ্রমিকের কণ্ঠে– 'চারা গাছে ফুল ফুইটাছে, ডাল ভাইঙ্গো না'– গানের কলি ও 'দু'টি সন্তানই যথেষ্ট', 'পাগলে কী না বলে ছাগলে কীনা খায়' প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

সর্বোপরি, নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলোর বহির্লক্ষণ-অন্তর্লক্ষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– তিনি বাংলা নাটকের আধুনিক রূপ-রীতির বিনির্মাণ করেছেন। তিনি আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও সমাজবাস্তবতাকে তাঁর নাটকের মূলে প্রতিস্থাপিত করেছেন, প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের কোনো রূপ-রীতি এসব নাটকের মূল্য বিচারে প্রযোজ্য নয়। একারণে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলোর মঞ্চ-পরিকল্পনা, দৃশ্য, ভাবনা, সংলাপ যেমন স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি কোনো কোনো নাটক হয়েছে নিরীক্ষাপ্রবণ। তবে নাট্যকাহিনির সমাপ্তিতে কোনো কোনো নাটকে অতিনাটকীয়তা লক্ষ্য করা গেলেও 'তাঁর নাটক হয়ে উঠেছে একদিকে আমাদের সমাজের বিশ্বস্ত দর্পণ, অন্যদিকে সাহিত্যগুণ সম্পন্ন শিল্পকর্ম, কখনো কখনো ঈষৎ প্রচারধর্মী ও উচ্চকণ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মামুনের অনেক নাটকের

নামকরণের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ধরা পড়ে।'[১৭২] বাংলা নাট্যসাহিত্যে আবদুল্লাহ আল-মামুনের এই রূপ-রীতি সঙ্গত কারণে প্রশংসাযোগ্য।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব-বিচার*, (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, প্রথম করুণা সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩), পৃ. ১৯।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৩. অজিতকুমার ঘোষ, *নাটকের কথা*, (কলকাতা : সাহিত্য লোক, ৫ম সংস্করণ, জুন ২০০৩) পৃ. ৩।

৪. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

৫. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৪) পৃ. ১৮২-১৮৩।

৬. Dr. Sen (edited), *Aristotle's Poetics,* (Dhaka : Friends Book Corner, Thirteenth edition 2002), p. 47.

৭. উদ্ধৃত, সাধনকুমার ভট্টাচার্য 'নাটক লেখার মূলসূত্র', (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ ১৯৮০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫), পৃ. ৩৭।

৮. Dr. Sen (edited), `*Aristotle's Poetics*, op, cit, p. 4-5.

৯. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

১০. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১।

১১. মো. হারুনুর রশীদ, 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয়ভাবনা ও শিল্পশৈলী', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, ৪৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৫), পৃ. ১৮৭।

১২. রামেন্দু মজুমদার, 'থিয়েটার সংবাদ', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪), পৃ. ১১৮।

১৩. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'সুবচন নির্বাসনে', *নির্বাচিত নাটক*, (ঢাকা : নালন্দা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫), পৃ. ২০।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

১৬. মো. জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭), পৃ. ১৬৭।

১৭. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'সুবচন নির্বাসনে', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

২২. মো. জাকিরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।

২৩. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'সুবচন নির্বাসনে', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

২৭. মো. জাকিরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০।

২৮. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এখন দুঃসময়', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

২৯. মো. জাকিরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ . ১৭১।

৩০. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এখন দুঃসময়', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

৩৫. মো. হারুনুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭।

৩৬. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এখন দুঃসময়', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।

৪১. মো. হারুনুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬।

৪২. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'কোকিলারা' *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭।

৪৩. বোরহান বুলবুল, *বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪), পৃ. ৭৭।

৪৪. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'কোকিলারা', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০।

৪৭. মো. জাকিরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।

৪৮. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'কোকিলারা', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।

৫৪. আবদুল্লাহ আল-মামুন, *মেরাজ ফকিরের মা*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭), পৃ. ৬।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

৫৬. রুবেল আনছার, *বাংলাদেশের নাটক : প্রবণতা ও প্রয়োগকলা*, (ঢাকা : সাহিত্য বিলাস, প্রথম প্রকাশ, একুশে বইমেলা ২০১১), পৃ. ৯৭

৫৭. আবদুল্লাহ আল-মামুন, *মেরাজ ফকিরের মা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৬১. সোলায়মান কবীর, *আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয় ও পরিচর্যা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৪), পৃ. ৮৫।

৬২. আবদুল্লাহ আল-মামুন, *মেরাজ ফকিরের মা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

৬৭. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এবার ধরা দাও', *নাটক সমগ্র* ১, (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, একুশের বইমেলা ২০০০), পৃ. ১১৭।

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪।

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

৭৯. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এখনও ক্রীতদাস', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৬।

৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯।

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩।

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০।

৮৫. ইউসুফ ইকবাল, 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ : স্বপ্নভঙ্গজনিত বেদনার ভাষাচিত্র', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, ৩৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫), পৃ. ১৪১।

৮৬. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এখনও ক্রীতদাস', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৮৮. পূর্বোক্ত পৃ. ২০৯।

৮৯. অনুপম হাসান, 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের নাটক', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, ৩৯তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১০), পৃ. ১৫৪।

৯০. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'এখনও ক্রীতদাস', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯।

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭।

৯৭. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'তোমরাই', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯।

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩।

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬-৬৭।

১০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬।

১০২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪।

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯।

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯।

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮।

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭।

১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০।

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩।

১১১. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'তৃতীয় পুরুষ', *মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র*, (ঢাকা : অনন্যা, প্রথম প্রকাশ,

বইমেলা ১৯৯৩), পৃ. ২৮৩-২৮৪।

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫।

১১৩. অনুপম হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।

১১৪. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'তৃতীয় পুরুষ', *মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭।

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬।

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১০।

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪।

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫।

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০।

১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭।

১২১. পূর্বোক্ত পৃ. ৩১০।

১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯।

১২৩. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'মেহেরজান আরেকবার', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২।

১২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২।

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০।

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২।

১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৫।

১২৮. অনুপম হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০।

১২৯. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'মেহেরজান আরেকবার', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮২।

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২।

১৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩।

১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯০।

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮।

১৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯০।

১৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৮।

১৩৬. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'কুরসী', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, (ঢাকা : থিয়েটার, চতুর্দশ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, মে ১৯৮৮), পৃ. ৮৯।

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

১৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

১৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।

১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

১৪১. সোলায়মান কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

১৪২. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'কুরসী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

১৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

১৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭।

১৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭।

১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

১৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

১৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

১৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

১৫১. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'মাইক মাস্টার', *নির্বাচিত নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৮।

১৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯-৫০০।

১৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৩।

১৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৯।

১৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২।

১৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯।

১৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬।

১৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২।

১৫৯. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'সেনাপতি', *নাটক সমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩।

১৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০।

১৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪।

১৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮।

১৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

১৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।

১৬৫. মো. জাকিরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০।

১৬৬. আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'সেনাপতি', *নাটক সমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১-২২২।

১৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫।

১৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩।

১৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫।

১৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯।

১৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬।

১৭২. কবীর চৌধুরী, 'বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আবদুল্লাহ আল-মামুন', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, (ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১), পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের বাংলা নাট্যসাহিত্যে আবদুল্লাহ আল-মামুন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রযাত্রার ধারায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, দ্রোহ-বিদ্রোহের একজন শৈল্পিক রূপকার। মুক্তিযুদ্ধ প্রাক-কালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন-শৃঙ্খলে বন্দী মানুষের জর্জরিত যাপিত জীবন আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাট্যমানসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, দেশ স্বাধীনের পরও তা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনকালে সাধারণের জীবনগাথা হয়ে তাঁর সমগ্র নাট্যসত্তায় জীবন্ত হয়ে চিত্রিত হয়েছে।

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত অর্থনীতির প্রতিবেশে এদেশের সমাজকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ সময়ে আর্থ-সামাজিক সঙ্কটজনিত কারণে সমাজের চিরাচরিত মূল্যবোধগুলোর অবক্ষয় ঘটতে থাকে। ফলে একশ্রেণির মানুষ দুর্নীতিকে আশ্রয় করে অবৈধভাবে ঘুষ-দুর্নীতি, কালোবাজারি-মজুতদারি ও চোরাকারবারি ব্যবসা করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। ফলে সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠী সামাজিক বৈষম্য-অনাচার-দুর্নীতিতে জর্জরিত যাপিত জীবনে সমাজের আদর্শ, সুনীতি, সুবচন, সততা প্রভৃতি মূল্যবোধগুলোর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। আবদুল্লাহ আল-মামুনের সামাজিক পর্যায়ের নাটকগুলোতে সমকালীন সমাজের মানুষের চিরাচরিত বিশ্বাসবোধের প্রতি অনাস্থা, বৈষম্য-অনাচার, ভোগবাদী-মানসিকতা, নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির দৌরাত্ম্য, যুবসমাজের অধঃপতন, অভাব-দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নারীর প্রতি বৈষম্য, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটজনিত কারণে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনকে প্রত্যক্ষভাবে আলোড়িত করলেও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর রয়েছে দ্বিধা-বিভক্ত অভিজ্ঞতা। কারণ স্বাধীনতা লাভের অল্পকাল পরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্কটের সুযোগে দ্বিধা-বিভক্ত জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আপাত স্থিত থাকলেও, অল্পকাল পরে নতুন কৌশলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারা কতিপয় স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ ও সামরিক শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যাংক-বীমাসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিল্পখাত, উচ্চ পদস্থ সরকারি চাকরি ছাড়াও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে নবজাগরিত সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ও রাজনীতিতে পুনর্বাসনের দরুণ

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষিত শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মণের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের এমন অবক্ষয়ের চালচিত্র নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। একারণে আবদুল্লাহ আল-মামুনের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবন কেন্দ্রিক নাটকগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ চিত্র কিংবা শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকলেও, স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনীতি, মুক্তিযোদ্ধাদের অবহেলিত জীবনের চালচিত্র, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা বিরোধীদের অপকর্মের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির প্রতিবাদ-বিদ্রোহ, অসাম্প্রদায়িক সমাজভাবনা ও প্রগতিশীল চেতনা তাঁর নাট্যভাবনাকে শিল্পিত করেছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতক কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের জাতীয় জীবন ও রাজনৈতিক অঙ্গনে পটপরির্বতন করে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর রাষ্ট্রক্ষমতা সামরিক শাসকদের নিয়ন্ত্রণে গেলে দৃশ্যত রাজনীতির সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হয়। ফলে দেশীয় ও বিদেশি ষড়যন্ত্রে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও কতিপয় বিপদগামী রাজনীতিবিদ ক্ষমতা ও অর্থের লোভে সামরিক শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণতন্ত্রকে দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্বাসনে পাঠান। কিন্তু আবহমান বাংলার অধিকার সচেতন মানুষ সামরিক শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শোষণে নির্যাতিত-নিপীড়িত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজেদের সংগঠিত করে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের রাজনৈতিক চেতনার নাটকগুলোতে সমকালীন রাজনীতির এই উত্থান-পতন, কতিপয় রাজনীতিবিদদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতালিপ্সা, সামরিক শাসকদের শোষণচিত্র, স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনৈতিক দৌরাত্ম্য, তজ্জনিত কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুর্বিষহ উৎপীড়ন-নির্যাতন ও গণতন্ত্রকামী মানুষের অধিকার চেতনার চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে বিশেষত আশির দশকে মার্কসীয় দর্শনের আলোকে বাংলাদেশের বিভিন্ন নাট্যদল পুঁজিবাদী-অসম অর্থব্যবস্থার বিপক্ষে শ্রেণিসংগ্রামের ঘোষণা দিয়ে নাটককে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে ব্যবহারের প্রচেষ্টা শুরু করেন। কারণ বাংলাদেশের নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশে– এক. পুঁজিবাদী লুটেরা শ্রেণি, দুই. শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শোষিত শ্রেণি এবং তিন. সর্বহারা শ্রমিক মজুর - এই তিনটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে পুঁজিপতিরা অন্য দুই শ্রেণির মানুষের শোষক হিসেবে সমাজে আর্বিভূত হয়। আবদুল্লাহ আল-মামুন এদেশের মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক-মজুর শ্রেণির দুর্ভোগ, বুভুক্ষা, বেকারত্ব, শোষণ-বঞ্চনা অনুধ্যানে ব্যথিত হয়েছেন। একারণে তিনি মার্কসবাদী বা শ্রেণিসংগ্রাম কিংবা মার্কসীয় অর্থনীতি সম্পর্কে পড়ে বা বুঝে অভিজ্ঞ না হলেও শ্রেণিসংগ্রাম কেন্দ্রিক রচিত

নাটকগুলোতে খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতি তাঁর হৃদয়ের গভীর মমত্ব, তাদের অর্থনৈতিক টানাপড়েন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবজাত ভোগবাদী মানসিকতা, ব্যক্তির স্বার্থপরতা, শ্রেণিসচেতনতা, ধনিক-মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র চিত্রিত করেছেন। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন তার শ্রেণিসংগ্রাম কেন্দ্রিক নাটকগুলোতে শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের সমস্যা মানবিক দৃষ্টিতে সমাধানের মধ্য দিয়ে সর্বোত্তম কল্যাণকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এই পথে শ্রেণি-সাম্য রচনা করেছেন।

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে শুধু বিষয়-বৈচিত্র্যের রূপায়ণে নয়, নাটকের রূপ-রীতি চর্চার ক্ষেত্রেও নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ছাপ রেখেছেন। প্রচলিত নাটকের প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো রূপ-রীতিকে তিনি মানেননি। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে তিনিই প্রথম প্রচলিত নাট্যবৃত্ত ভেঙে শুধু দৃশ্যের পর দৃশ্য অবতারণা করে আলোকসম্পাত বা পাত্র-পাত্রীদের আগমনের মধ্য দিয়ে কিংবা চলচ্চিত্রের 'পো মোশানে' নাটকের কাহিনিকে গতিশীল করেছেন। নাট্যঘটনার পরিণতিতে সমাজের প্রকল্পিত জীবনচিত্রকে রঙ্গমঞ্চের দর্শকের সামনে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর নাটকের চরিত্রসমূহ গতানুগতিক ধারার সমাজ বা জীবনের বাহিরে হলেও নাটকের কেন্দ্রাতিক বিষয় ও জীবনরূপকে ফুটিয়ে তুলতে উচ্চকিত হয়েছে। আর এসব নাটকের মঞ্চপরিকল্পনা, প্রযোজনা-নির্দেশনা ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অনস্বীকার্য। পাত্র-পাত্রীদের ভাষা নির্মাণে তিনি যেমন আঞ্চলিক রীতি ব্যবহার করেছেন, তেমনি ইংরেজি, আরবি, ফারসি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার শব্দ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা বক্রোক্তি, আধুনিক গান-কবিতা ব্যবহার করে সংলাপকে করেছেন সহজ-সরল, তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত। একারণে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলো আধুনিক রূপ-রীতি বা প্রকরণে বাংলা নাট্যসাহিত্যে নবনির্মাণ হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

সর্বোপরি, আমরা বলতে পারি বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য তথা বাংলা নাট্যসাহিত্যে আবদুল্লাহ আল-মামুন একজন মৌলিক নাট্যধারার নির্মাতা। তিনি যুদ্ধোত্তর কালে বাংলাদেশের সমাজচিত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, রাজনৈতিক সঙ্কট, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশে শ্রেণিসচেতনতা ছাড়াও একই নাটকে যেমন– উগ্র মৌলবাদী আগ্রাসনে বিপর্যস্ত বাঙালির আবহমান সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিপরীতে মানবিকতার জয়গান, শুদ্ধ সাংস্কৃতিক চেতনার উজ্জীবন, ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বিপরীতে প্রগতিশীল ভাবনা, নারীর প্রতি লৈঙ্গিক-বৈষম্য, অধিকার সচেতনতা ও পাত্র-পাত্রীদের মনোজাগতিক রহস্য স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি আধুনিক রূপ-রীতির চর্চায় বাংলা নাটককে নবরূপে অবয়ব দান করেছেন। সঙ্গত কারণে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন বাংলাদেশের নাটক তথা বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রবহমান ধারায় এই নতুন নাট্যধারা বিনির্মাণের জন্য চিরকাল কিংবদন্তি হয়ে থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ আল-মামুনের জীবনপঞ্জি

১৯৪২ : ১২ জুলাই জামালপুর জেলার অন্তর্গত বকশীগঞ্জ থানায় অবস্থিত তার নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা– অধ্যক্ষ আবদুল কুদ্দুস, মাতা– ফাতেমা খাতুন। মা-বাবার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

১৯৬৩ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ।

১৯৬৪ : একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ।

১৯৬৬ : বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রযোজক হিসেবে যোগদান।

১৯৬৮ : বাংলাদেশ টেলিভিশনে উর্ধ্বতন অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৭৩ : ছদ্মনামে *অঙ্গিকার* চলচ্চিত্র নির্মাণ।

১৯৭৪ : বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ/ অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞ/ অনুষ্ঠান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৭৫ : শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রযোজক হিসেবে জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার এবং শ্রেষ্ঠ কাহিনি ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে বাচসাস পুরস্কার লাভ।

১৯৭৮ : *সারেঙ বউ* চলচ্চিত্র নির্মাণ।

১৯৭৯ : ভারতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় সাংস্কৃতিক উৎসবে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বদান এবং নাট্যকার হিসেবে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ।

১৯৮০ : যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দান। *সখি তুমি কার* ও *এখনই সময়* সিনেমা নির্মাণ। *এখনই সময়* সিনেমার জন্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ।

১৯৮১ : মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এ আই বিডি আয়োজিত টেলিভিশন ও রেডিও অনুষ্ঠান অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সে যোগদান।

১৯৮২ : নাটকে অবদানের জন্য ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার লাভ। *মন মানে না* চলচ্চিত্র নির্মাণ।

১৯৮৩ : পশ্চিম জার্মানির জুরি বোর্ডের সদস্য হয়ে বার্লিন গমন।

১৯৮৪ : সহধর্মিণী ফরিদা খাতুন পরলোক গমন করেন।

১৯৮৮ : শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে *দুই জীবন* ছবির জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ। উপন্যাস– *মানব তোমার সারাজীবন* প্রকাশিত।

১৯৮৯ : *আহ দেবদাস* উপন্যাসটি প্রকাশ পায়। জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের ২৬তম সাধারণ সভায় যোগদান।

১৯৯০ : বাংলাদেশ টেলিভিশনে পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্র এবং ভিডিও ইউনিট-এর দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৯১ : ২৩ এপ্রিল থেকে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ। এ বছরে দুটি উপন্যাস– *তাহাদের যৌবনকাল* ও *হায় পার্বতী* প্রকাশিত। প্রচারিত টিভি নাটক– *আন্দু* ও *অভিষেক* এবং অভিনয় বিষয়ক গ্রন্থ– *অভিনয়* (১ম খণ্ড) প্রকাশিত। থিয়েটার প্রদত্ত 'মুনীর চৌধুরী সম্মাননা' লাভ। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরস্থ এ আই বিডি আয়োজিত সিনিয়র ব্রডকাস্টিং ম্যানেজমেন্ট কোর্সে যোগদান।

১৯৯৩ : সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এ এম আই সি আয়োজিত রেডিও সম্প্রচার ব্যবস্থাপনা ২০০০ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ। দুটি উপন্যাস– *এই চুনীলাল* ও *গুপ্তা-পাণ্ডার বাবা* এবং ভ্রমণকাহিনি *ম্যানহাটন* প্রকাশিত। *জনম দুঃখী* চলচ্চিত্র নির্মাণ।

১৯৯৫ : *দমকা* সিনেমা নির্মাণ।

১৯৯৬ : তারকালোকে পদক লাভ। আত্মচরিত– *আমার আমি* প্রকাশিত।

১৯৯৭ : উপন্যাস *খলনায়ক* প্রকাশিত। 'ফেরদৌসী মজুমদার : জীবন ও কর্ম' শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ। অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার লাভ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৯ : তথ্যনাট্য ধারাবাহিক 'মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম' নির্মাণ। নান্দীকার পুরস্কার লাভ।

২০০০ : দ্বিতীয় বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক লাভ।

২০০১ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ ও অক্টোবর মাসে অবসর গ্রহণ। *বিহঙ্গ* চলচ্চিত্র নির্মাণ।

২০০৮ : ১২ই জুলাই তারিখে মাথায় জটিল অস্ত্রোপচার।

২০০৮ : ২১শে আগস্ট বারডেম হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকাতে পরলোকগমন। ২২শে আগস্ট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে স্মরণসভার পর বনানী কবরস্থানে স্ত্রীর কবরে সমাহিত।

[সংকলিত ও পরিমার্জিত : রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, *থিয়েটার*, 'আবদুল্লাহ আল-মামুন স্মারক সংখ্যা', ৩৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৮।]

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আলোচিত নাটক :

আবদুল্লাহ আল-মামুন : 'সুবচন নির্বাসনে', *নির্বাচিত নাটক*, নালন্দা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

: 'এখন দুঃসময়', *নির্বাচিত নাটক*, নালন্দা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

: 'এবার ধরা দাও', *নাটকসমগ্র* ১, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, একুশের বইমেলা ২০০০।

: 'সেনাপতি', *নাটকসমগ্র* ১, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, একুশের বইমেলা ২০০০।

: 'এখনও ক্রীতদাস', *নির্বাচিত নাটক*, নালন্দা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

: 'তোমরাই', *নির্বাচিত নাটক*, নালন্দা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

: 'তৃতীয় পুরুষ', *মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র*, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৩।

: 'কোকিলারা', *নির্বাচিত নাটক*, নালন্দা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

: 'কুরসী', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, চতুর্থ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, ঢাকা, মে ১৯৮৮।

: *মেরাজ ফকিরের মা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭।

: 'মাইক মাস্টার', *নির্বাচিত নাটক*, নালন্দা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

: 'মেহেরজান আরেকবার', *নির্বাচিত নাটক*, নালন্দা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

খ. সহায়ক গ্রন্থ :

অজিতকুমার ঘোষ : *নাটক ও নাট্যকার*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০০।

: *নাটকের কথা*, সাহিত্য লোক, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, জুন ২০০৩।

: *বাংলা নাটকের রূপ-রীতি ও আঙ্গিক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ১৯৯৮।

: *বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস*, সাহিত্য লোক, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮।

অতীন্দ্র মজুমদার (সম্পা.) : *চর্যাপদ*, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪০২।

অন্‌জন্‌ দাশগুপ্ত : *অভিনয় শিল্প মন ও সৃজন*, প্রকাশিকা গোপা দাশগুপ্তা, কলকাতা, ১৯৯৪।

: *অভিনয় শিল্প সংলাপ ও কণ্ঠস্বর*, ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৮১।

Dhaka University Institutional Repository

অনুপম সেন : *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র সমাজ, সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ*, অবসর প্রকাশ, ঢাকা, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৯।

অনুপম হাসান : *বাংলাদেশের কাব্যনাটক বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১০।

অরাত্রিকা রোজী : *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫।

অশোককুমার মিত্র : *নন্দনতত্ত্বের নন্দনকাননে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০।

আতাউর রহমান : *নাট্য প্রবন্ধ বিচিত্রা*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৫।

আনু মুহাম্মদ : *বাংলাদেশের কোটিপতি মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক*, চলন্তিকা বইঘর, ঢাকা, ১৯৯২।

আবদুল্লাহ আল-মামুন : *অভিনয়*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯১১।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : *মুনীর চৌধুরীর নাটক, কথা ও কবিতা*, মুক্তধারা , ঢাকা, ১৯৮১।

আলীম আল রাজী : *বাংলা লোকনাট্য পালাগান প্রকৃতি ও প্রয়োগ*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১০।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৫।

: *বাংলা নাট্যসাহিত্যে*র ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৩।

আশিস গোস্বামী (সম্পা.) : *আরণ্যক একটি নাট্যদলের নাট্যকথা*, আরণ্যক নাট্যদল, ঢাকা, ২০০১।

আসকার ইবনে শাইখ : *বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি*, সাত রং প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬।

আহমদ রফিক : *ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮।

ইসরাফিল শাহীন : *বাংলাদেশের পথনাটক*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৯।

ওবায়দুল হক সরকার : *পঞ্চাশ দশকের পত্র-পত্রিকায় ঢাকার নাটক*, শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৪।

এম. এম. আকাশ : *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭।

এম আর আখতার মুকুল : *বাংলা নাটকের গোড়ার কথা*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৪।

কবীর চৌধুরী : *প্রসঙ্গ নাটক*, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম অনন্যা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

কামরুদ্দিন আহমদ : *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৩৭৬।

কুন্তল মুখোপাধ্যায় : *থিয়েটার ও রাজনীতি*, নাট্যচিন্তা, কলকাতা, ২০০২।

খোরশেদ আলম : *নাটক বিষয়ে*, দেশ প্রকাশন, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯।

গীতাসেন গুপ্ত : *বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক*, নবনী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১০।

গোলাম মুরশিদ : *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৪।

জিয়া হায়দার : *থিয়েটারের কথা*, (প্রথম খণ্ড), পড়ুয়া সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

: *থিয়েটারের কথা*, (দ্বিতীয় খণ্ড), পড়ুয়া সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

: *থিয়েটারের কথা*, (চতুর্থ খণ্ড), বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৬।

: *থিয়েটারের কথা*, (পঞ্চম খণ্ড), বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭।

: *নাট্য নাটক*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫।

দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় : *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৫।

দর্শন চৌধুরী : *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১১।

দীপক চন্দ্র : *বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা* (১৯২৩-১৯৭০) দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৪।

দুলাল ভৌমিক : *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, জুন ১৯৯৪।

নিতাই দাস : *বাংলা সাহিত্যে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাব ১৯৪০-১৯৭১*, মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা, মার্চ ২০০৭।

নিলুফার বানু : *প্রসঙ্গ নাট্য এবং থিয়েটার*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০০৪।

নীলিমা ইব্রাহিম : *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২।

পুলিন দাস : *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক*, প্রথম খণ্ড (১৮৯৫-১৯২০), এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০৩।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় : *নট-নাট্য চলচ্চিত্রকথা*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারি ১৯৯৬।

প্রকাশ নন্দী : *নাটক পরিচালনা*, নব গ্রন্থ কুটীর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৭৫।

প্রদ্যেত সেনগুপ্ত : *বাংলা নাটক নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ*, বর্ণালী, কলিকাতা, ১৯৮২।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী : *নাটক ও রাজনীতি*, প্রিয়বত প্রকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।

প্রভাতকুমার গোস্বামী : *উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক*, সংস্কৃতি পরিষদ, কলকাতা, ১৯৮২।

বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা নাট্য আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩।

বদরুদ্দীন উমর : *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১ম খণ্ড), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০।

: *যুদ্ধপর্ব বাংলাদেশ*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮।

বশীর আল হেলাল : *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৫।

বোরহান বুলবুল : *বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গ*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গীয় নাট্যশালা ১৭৯৫-১৮৭৬*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৩৬১।

ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : *অভিজ্ঞান নাট্যকথা*, সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

: *নাট্য : স্বর ও সংলাপ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৯।

মনসুর মুসা : *বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯৫।

মমতাজউদ্‌দীন আহমদ : *আমার নাট্য ভাবনা*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, আগস্ট ২০০০।

মানসী জামান : *বাংলা নাটক (১৯৪০-৬০) : আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট*, জগৎমাতা পাবলিশার্স, কলকাতা।

মাহমুদ শামসুল হক : *বাঙালি নারী*, ১ম পাঠক সমাবেশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০০।

মুনতাসীর মামুন : *উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার*, শিল্পকলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৭৯।

: *উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার*, সুবর্ণ, ঢাকা, ১৯৮৬।

মুহম্মদ মজির উদ্দিন : *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স, রাজশাহী ১৯৭০।

মোবারক হোসেন খান (সম্পা.) : *ঢাকা মহানগরীর নাট্যচর্চা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২।

মোশাররফ হোসেন : *স্বাধীনতা উত্তর ঢাকা শহরের মঞ্চ নাটক*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, জুন ১৯৯৬।

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন : *মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯৮।

মো. জাকিরুল হক : *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭।

মো. মাহবুবুর রহমান : *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭–৭১*, বিশেষ মুদ্রণ, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫।

মোহাম্মদ হান্নান : *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।

রাহমান চৌধুরী : *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাটক*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭।

রুবেল আনছার : *বাংলাদেশের নাটক প্রবণতা ও প্রয়োগকলা*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, একুশে বইমেলা ২০১১।

রামেন্দু মজুমদার : *নির্বাচিত রচনা*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.) : *আবদুল্লাহ আল-মামুন : ফিরে দেখা*, থিয়েটার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৯।

: *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

: *নাটক তত্ত্ব ও শিল্পরূপ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৭।

: *নাট্য পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, বইমেলা ২০১৩।

: *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, মুক্তধারা, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭।

লুৎফর রহমান : *নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১।

শচীন সেনগুপ্ত : *বাংলার নাটক ও নাট্যশালা*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৪।

শান্তনু কায়সার : *বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৪।

শাহনাজ পারভিন : *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭।

শাহাদৎ হোসেন নিপু : *বাংলাদেশের নাটক; নাট্য সমালোচনা*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

শেখর রায় : *বাংলা নাটকের বিবর্তন*, সমাচার, ঢাকা, প্রকাশ কাল ডিসেম্বর ২০১২।

সরদার ফজলুল করিম (সম্পা.) : *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৮।

সইফ-উদ-দাহার : *রাষ্ট্রভাষা থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তারপর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৮।

সাইমন জাকারিয়া (সংকলন ও গ্রন্থনা) : *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, জুন ২০০৭।

সাঈদ-উর-রহমান : *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯০।

সাঈদ-উর-রহমান (সম্পা.) : *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, এপ্রিল ২০০৩।

সাধন কুমার ভট্টাচার্য : *নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩।

: *নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ*, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৭।

সানজিদা হক মিশু : *বাংলাদেশের নাটক বিদ্রোহ আখ্যান ও শিল্পবৈচিত্র্য*, রোদেলা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, একুশে বইমেলা ২০১৫।

সাবিরা মুনীর : *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) : *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)* ১-৩ খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

সুকুমার বিশ্বাস : *বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যোৎসব কতিপয় দলিল*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

: *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪৪২।

সেলিম আল দীন : *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, হাওলাদার প্রকাশনী, প্রথম হাওলাদার সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

সেলিম মোজাহার : *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা (১৯৭২-২০০০)*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৮।

সৈকত আসগর (সম্পা.) : *বাংলার লোকসাহিত্য লোকনাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯।

সৈয়দা খালেদা জাহান : *নুরুল মোমেন ও তাঁর নাটক*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০২।

: *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা* (১৯৫২-১৯৭২), বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৩।

সৈয়দ জামিল আহমেদ : *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা জুন ১৯৯৫।

সোলায়মান কবীর : *আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয় ও পরিচর্যা*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৪।

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.) : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ১ম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২।

হারুন-অর রশিদ : *বাংলাদেশ; রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০১।

হোসনে আরা জলী : *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

গ. ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

D. S. Sen (Edited) : *Aristotle's Poetics,* Friends Book corner, Dhaka, 13th edition, 2000.

Badruddin Umar : *Politics and Society in Bangladesh,* Subarna, Dhaka, January 1987.

ঘ. সহায়ক প্রবন্ধাবলি :

অনুপম হাসান : 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের নাটক', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, ৩৯তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১০।

আবদুল্লাহ আল-মামুন : 'বাংলাদেশের নাটক রচনা : ধারা ও বিবর্তন', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাটক : তত্ত্ব ও শিল্পরূপ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০১৩।

: 'মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার ও আমাদের নাটক', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, ৩৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৮।

আলী যাকের : 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আমাদের নাটক', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক*, অন্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯।

ইউসুফ ইকবাল : 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ : স্বপ্নভঙ্গজনিত বেদনার ভাষাচিত্র', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, ঢাকা, ৩৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫।

কবীর চৌধুরী : 'বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আবদুল্লাহ আল-মামুন', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, নবযুগ প্রকাশনী ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

গোলাম সারোয়ার : 'বাংলাদেশের নাটকে রাজনৈতিক পটভূমি', আখতারুন্নেসা বেগম (সম্পা.) *শিল্পকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৭।

ফেরদৌসী মজুমদার : 'থিয়েটারের প্রাণপুরুষ', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, নবযুগ প্রকাশনী ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

বাবুল বিশ্বাস : 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকে সমাজ ও নারী', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, ৪৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৫।

মঞ্জুদাশ গুপ্ত : 'কোকিলারা : স্মরণীয় একক অভিনয়', *চতুরঙ্গ*, মার্চ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯০।

মমতাজউদ্‌দীন আহমদ : 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৬।

মালেকা বেগম : 'আবদুল্লাহ আল-মামুন ও কোকিলারা', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, নবযুগ প্রকাশনী ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : 'নাটক জগতের ধূমকেতু', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, নবযুগ প্রকাশনী ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

মো. হারুনুর রশীদ : 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয়ভাবনা ও শিল্পশৈলী', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *থিয়েটার*, ৪৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, আগস্ট ২০১৫।

রামেন্দু মজুমদার : 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : প্রোজ্জ্বল স্মৃতি', *নির্বাচিত রচনা*, কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৮।

: 'বাংলাদেশের নাটক : ১৯৭২-৮৬', *নির্বাচিত রচনা*, কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৮।

: 'বাংলাদেশের মঞ্চনাটক', ইকবাল আহমেদ (সম্পা.), *শৈলী*, ঢাকা, প্রথম বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৫।

রাহমান চৌধুরী : 'বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন : সূচনা নিয়ে নাট্যবোদ্ধাদের বিভ্রান্তি', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.), *নতুন দিগন্ত*, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪।

শফি আহমেদ : 'সমকাল ও আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক', *থিয়েটারওয়ালা*, দশম বর্ষ, ৩-৪ যুগ্ম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮।

সুকুমার বিশ্বাস : 'পঁচিশ বছরের বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন', *একুশের প্রবন্ধ- ৯৬*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৬।

সৈয়দ শামসুল হক : 'বিশাল বাংলার নাট্যপ্রাণ পুরুষ', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, নবযুগ প্রকাশনী ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

সৌমিত্র শেখর : 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে সমসময়', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, নবযুগ প্রকাশনী ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

ঙ. সাক্ষাৎকার :

বিপ্লব বালা ও হাসান শাহরিয়ার : 'আলাপনে আবদুল্লাহ আল-মামুন', হাসান শাহরিয়ার (সম্পা.), *থিয়েটারওয়ালা*, দশম বর্ষ, ৩-৪ যুগ্ম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮।

রামেন্দু মজুমদার : ১৯ মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় নাট্যজন রামেন্দু মজুমদারের সঙ্গে তাঁর 'মাতৃছায়া', ২০/২, শহিদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী সড়ক, ঢাকা-১২০৫ নম্বর বাসায় গৃহীত সাক্ষাৎকার।

চ. সাহিত্য সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা :

উলুখাগড়া : সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পা.), ঢাকা, সংখ্যা-১১, এপ্রিল-২০০৯।

একুশের প্রবন্ধ- ৯৬ : বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৬।

চতুরঙ্গ : মার্চ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯০।

থিয়েটার : রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ঢাকা, ৩৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫।

: রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ঢাকা, 'আবদুল্লাহ আল-মামুন স্মারক সংখ্যা', ৩৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮।

: রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ঢাকা, ৩৯তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১০।

: রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ঢাকা, ৪৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৫।

: রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ঢাকা, ৪৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৫।

থিয়েটারওয়ালা : হাসান শাহরিয়ার (সম্পা.), ঢাকা, নবম বর্ষ, ১-২ যৌথ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০০৭।

: হাসান শাহরিয়ার (সম্পা.), ঢাকা, দশম বর্ষ, ৩-৪ যুগ্ম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮।

নতুন দিগন্ত : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪।

শিল্পকলা : আখতারুন্নেসা বেগম (সম্পা.), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৭।

শৈলী : ইকবাল আহমেদ (সম্পা.), ঢাকা, প্রথম বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৫।

ছ. সহায়ক অভিধান ও কোষগ্রন্থ :

বঙ্গীয় শব্দকোষ : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমী, নতুন দিল্লী, ১৯৮৮।

বাঙলা নাট্যকোষ : সেলিম আল দীন (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৮।

বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান : সেলিনা হোসেন ও নূরল ইসলাম (সম্পা.), বাংলা একাডেমি ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭।

বাংলা পিডিয়া : (১ম-৮ম খণ্ড), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।

সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান : বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, জানয়ারি ২০০০।

সাহিত্য কোষ : কবীর চৌধুরী রচিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৪র্থ পরিবর্ধিত সং, ১৯৯৮।